আদর্শ মহিলা

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীনয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ
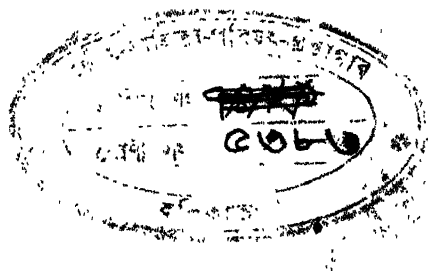
প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড

এলাহাবাদ

১৯২১

মূল্য দুই টাকা।

প্রিণ্টার
শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ বসু,
কোহিনুর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
১১১।৪ এ, মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু,
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড
এলাহাবাদ।

উৎসর্গ পত্র

মা,

তোমার এই অক্ষম সন্তানের

ভক্তি-উপহার

আদর্শ মহিলা

সমাদরে

গ্রহণ

কর।

নয়ন
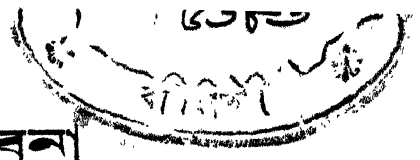
প্রস্তাবনা

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ বিধাতার অনন্ত করুণায় চিরপবিত্র। ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান, ভারতের কাব্যদর্শন, ভারতের পুরাণসংহিতা পৃথিবীকে এতাবৎ ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছে। ভারতের প্রাধান্যের বিচার করিতে হইলে একবার তাহার ভৌগোলিক অবস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। উত্তরে তুষারকিরীট হিমাচল সমগ্র পৃথিবী হইতে উর্দ্ধে মস্তকোত্তোলন করিয়া ভারতের প্রাধান্য বিঘোষিত করিতেছে। মানব-প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা ও যমুনা প্রভৃতি নদনদী হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া ভারতবর্ষকে উর্ব্বর ও শস্যশ্যামল করিতেছে। দক্ষিণে ভীমকান্ত মহাসমুদ্র কুমারিকাদেবীর মন্দির-সোপান নিরন্তর বিধৌত করিতেছে; পূর্ব্বে পশ্চিমে সাগর-শাখা ও উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা। সুতরাং ভারতবর্ষ পর্ব্বতপরিখা-বেষ্টিত প্রকৃতির সুদৃঢ় দুর্গ। ভারতভূমির অধিবাসিবৃন্দ নির্ব্বিঘ্নে চিরদিন শান্তিসুখ উপভোগ করিয়াছে, নিরাপদে ধর্ম্মালোচনা করিয়াছে এবং অসঙ্কোচে পৃথিবীতে জ্ঞানগুরুর আসন অধিকার করিয়া প্রাচীন সামাজিক জীবনের ভিত্তিপাত করিয়াছে। ধর্ম্মের উন্নতিতেই যে কোন জাতি উন্নত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষও ধর্ম্মের পথে বিচরণ করতঃ জাতীয় উন্নতির সিদ্ধিক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিল। এই জন্যই কত সাধুতপস্বী নির্জ্জন গিরিগহ্বরে এবং গভীর অরণ্যে ব্রহ্মসাধনার আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ছায়াশীতল সহস্র তপোবন হইতে যজ্ঞীয় ধূম সমুত্থিত হইয়া দেবতা ও মানবের সম্বন্ধ নিকটতর করিয়াছিল।

ভারতবাসীর লক্ষ্য চিরদিনই উচ্চ ছিল, আদর্শও উন্নত ছিল। তাই তাঁহারা মনোরাজ্যের নানা অজ্ঞাত তথ্যের আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছিলেন। কর্ত্তব্য ও সুশৃঙ্খলা তাঁহাদের সামাজিক জীবনকে সুখময় শান্তিপূর্ণ করিয়াছিল। এইরূপে মানব-সভ্যতার আদিক্ষেত্র ভারত জগতের চিরনমস্য হইয়া রহিয়াছে। ইচ্ছা-

শক্তির অনুপ্রাণনাই কর্ত্তব্যের ও উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া তাহাকে তৃপ্ত ও ধন্য করিয়াছে। বাস্তবিকই জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে পরিদৃষ্ট হয় যে, যখন কোন জাতির বাসনা পূর্ণ ও অখণ্ড হইয়াছে তখন সে জাতি দুর্ব্বল ও স্থাণুবৎ। কিন্তু অভিলাষ যেখানে উচ্চ, আদর্শ যেখানে মহৎ, তথায় উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এই কারণেই প্রাচীন ভারত ক্রমোন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যখনই ভারতের নক্ষত্রলোকস্পর্শী গৌরব-কিরীট নিশ্চেষ্টতার কুহেলিকায় অথবা বিপ্লবকারীর তাণ্ডবোত্থিত ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, তখনই যুগে যুগে কর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীরের অভ্যুদয়ে এক নব আশার কিরণে তাহা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তখন সেই গুরূপদিষ্ট ভারত তরঙ্গরঙ্গ-ভীষণ কর্ম্মসমুদ্র অতিক্রম করিয়া সাধনার কূলে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এই যে তাহার সমুদ্রযাত্রা তাহাতে নাবিক কে? কে তাহাকে কর্ম্মের রণে আহ্বান দিয়া আসিয়াছিল? কে তাহাকে উৎসাহিত করিয়াছিল?—তাহার দুর্নিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

এই পৃথিবীতে যিনি ঐকান্তিক শুভেচ্ছার প্ররোচনায় কর্ত্তব্যের পথে বিচরণ-শীল, তাঁহার পুরোবর্ত্তী আদর্শের দিক্‌চক্ররেখা ক্রমে দূরে—বহুদূরে সরিয়া গিয়া কর্ম্মক্ষেত্রের বিশালতা ও প্রকৃতির বিবিধ বৈচিত্র্য দেখাইয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করে। তাঁহার গতি অবাধ ও অপ্রতিহত। আকাঙ্ক্ষাই জাতীয় জীবনের মূলসূত্র। যে জাতির মধ্যে আকাঙ্ক্ষা নাই, তাহা জড় ও মৃত। জাতীয় জীবনের মূল এই উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ক্রমে ধর্ম্মের উন্নতিতে পরিণত হইয়া জাতীয় জীবনকে উন্নত ও মঙ্গলময় করে। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা যেখানে উচ্চ, সত্যানুপ্রেরিত প্রবৃত্তি যেখানে অনুকূল, আদর্শ যখন সম্মুখে বিরাজিত, শক্তি যথায় দুর্নিবার—সিদ্ধি সেখানে অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সিদ্ধির দ্বারে সাধনা। উদ্দেশ্য মহৎ ও লক্ষ্য উচ্চ হইলে মানুষ সাধনার ক্ষেত্রে সিদ্ধি লাভ করে। এই যে প্রেরণা, এই যে বাসনার অপরাজেয় তীব্রতা, ইহাই সামাজিক শক্তির প্রাণ। ইহাই পুরাতনের চিতাভস্ম হইতে নূতনের অঙ্কুর উৎপাদন করিয়া থাকে। এইরূপে ভারত পুরাতনের অভিজ্ঞতা হইতে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযুক্ত শান্তি ও শৃঙ্খলা সমাধানের জন্য উপাদান সৃষ্টি করিয়াছে।

এই সাধনার জন্য ভারতে বহু আদর্শচরিত্র নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাকে

ধন্য ও চিরপবিত্র করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে ভারতবাসী সর্ব্বান্তঃকরণে সেই সকল আদর্শচরিত্রের অনুসরণ করিতেন। বস্তুতঃ কর্ম্মজীবনে আদর্শের প্রভাব অপরিসীম। আদর্শ উচ্চ হইলে চেষ্টাও মহৎ হয়। আদর্শ সম্পূর্ণরূপে অনুসৃত না হইলেও তাহার চিন্তা মানুষকে ধন্য ও সার্থক করে, হৃদয়কে বলীয়ান্ করে। আদর্শ কর্ম্মের রণে প্ররোচিত করিয়া মানুষকে মহিমার গৌরবকিরীটে বিভূষিত করে। আদর্শ মানব-জীবনে বিচিত্রতাসম্পাদক। আদর্শের অভাবে মানবের জীবনতরণী নানা বিশৃঙ্খলার আবর্ত্তে পড়িয়া বিঘূর্ণিত হয়।

কিন্তু এই আদর্শচরিত্র কি ? যে চরিত্রে বুদ্ধিবৃত্তির সহিত কার্য্যক্ষমতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা সম্পূর্ণরূপে পরিলক্ষিত হয় তাহাই আদর্শ চরিত্র। পার্থিবজীবনে মানুষকে নানা বিঘ্ন-বিড়ম্বনার ঘাতপ্রতিঘাতে নিরন্তর পীড়িত হইতে হয়। এই ঘোর দ্বন্দ্বে যিনি জগদীশ্বরের সৃষ্টিরহস্য বুঝিয়া কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে পারেন তিনিই ধন্য ; তাঁহারই চরণোপান্তে উত্তরকালীন নরনারীর ভক্তিপূত অর্ঘ্য নিপতিত হয়। এইরূপ যে জীবন তাহাই আদর্শ। সুতরাং আদর্শজীবনের অনুভূতি সহজ হইলেও তাহার অনুকৃতি বড় কঠিন। দারুণ বিপদে মানুষ যখন অস্থির হইয়া পড়ে, আদর্শ তখন আপনার স্নেহ-মধুর অভয়বাণী শুনাইয়া তাহাকে সত্য-শুভ-কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। পরিরক্ষক যেমন রক্ত-পতাকা দেখাইয়া বাষ্পীয় রথের গতিকে সংযত করে, তদ্রূপ আদর্শ আপনার জীবনের নানা দুঃখ বিড়ম্বনার চিত্র প্রদর্শন করিয়া মানবকে সাবধান করিতে থাকে। পার্থিবমোহে আমাদের দৃষ্টি কলুষিত হইলে আদর্শের কল্যাণ-অঞ্জন তাহা পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। এইরূপে আদর্শ, মানবের জীবনে দেবতার মত সত্যশিব-সুন্দরের বিকাশ সাধনের জন্য অহর্নিশ প্রয়াসী হইয়া থাকে। সংসার-পথে আমাদিগকে এই কথাটি সম্যক্ বুঝিয়া চলিতে হইবে।

কালচক্রের পরিবর্ত্তনে আমরা অনেক দূর অধঃপতিত হইয়াছি। আদর্শ-চরিত্র রামচন্দ্র, প্রেমরূপী সত্যবান্, পুণ্যশ্লোক নল, দানবীর হরিশ্চন্দ্র, কর্ত্তব্যপর শ্রীবৎস, যে দেশে পুরুষজাতির আদর্শস্থল—এবং যে দেশে পবিত্রতাময়ী সীতাদেবী, সতীশিরোমণি সাবিত্রী, প্রেমকুশলা দময়ন্তী, করুণারূপিণী শৈব্যা, তত্ত্বজ্ঞানবতী চিন্তা প্রভৃতি নারীরত্ন জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই দেশের নরনারী আদর্শের অভাবে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে পারে ইহা মনে করিতেও কষ্ট হয়।

নারীজাতিই সমাজ-শক্তির প্রাণ—আবার রমণীর প্রাণই প্রেম। রমণীর এই প্রেম মাতাপিতার প্রতি ভক্তিরূপে, স্বামীর প্রতি নিষ্ঠারূপে, সন্তানের প্রতি স্নেহরূপে, বিপন্নের প্রতি করুণারূপে, শত্রুর প্রতি ক্ষমারূপে এবং সংসারের প্রতি জগদ্ধাত্রীরূপে নিত্য প্রকাশিত। যে প্রেমময়ী রমণী সংসারের কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়া কর্ত্তব্যের মধ্যে—প্রেমের মধ্যে আপনাকে বিলীন করিয়া দিতে পারেন, তিনিই আদর্শ রমণী। তাঁহার পবিত্র কাহিনী চিরপ্রবহমাণ কালের ললাটে আগ্নেয়াক্ষরে লিখিত থাকে এবং জগৎ সেই শক্তিময়ী জগদ্ধাত্রীর চরণে প্রণত হয়। সেই সতীচরণনিঃসৃত অফুরন্ত পীযূষধারা তদ্দেশীয়গণকে অনন্ত কাল শক্তি ও স্বাস্থ্য দান করে। এই সকল মহীয়সী মহিলার পূতজীবনের পুণ্যকাহিনী চিরদিন ভারতমহিলাগণকে ধর্ম্মে, কর্ত্তব্যে ও পাতিব্রত্যে অনুপ্রাণিত করুক ইহাই প্রার্থনীয়।

নিবেদন

আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা এখন সকলেই অল্পাধিক বুঝিয়াছেন। কিন্তু তদুপযুক্ত গ্রন্থের এখনও অভাব রহিয়াছে। সেই অভাবের আংশিক পূর্ণতাবিধানের জন্য "আদর্শ মহিলা" প্রকাশিত হইল। রামায়ণ ও মহাভারত রত্নখনিস্বরূপ। তাহা হইতে পঞ্চরত্ন আহরণ করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। বর্ণিত চরিত্রগুলিকে পরিস্ফুট করিবার জন্য স্থানে স্থানে স্বাধীন কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।

গ্রন্থখানির ভাষা প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। গ্রন্থবর্ণিত কয়েকটি স্থল স্ফুটতর করণার্থ ইহাতে কতকগুলি পরিকল্পিত চিত্র সন্নিবেশিত হইল। এক্ষণে ইহা সাধারণের আদরণীয় হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।

এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী বহুসম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষ মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক এই পুস্তকখানি প্রকাশিত করিলেন। তাঁহার এ ঋণ আমার অপরিশোধ্য। আজ আমি এই অবসরে উক্ত মহানুভবের নিকট আন্তরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই পুস্তকের প্রথমাংশ হাবড়া জেলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত নিশাপতি চট্টোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ মহাশয় ও অপরার্দ্ধ সাহিত্যসেবী "সাধুচরিত" লেখক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক বি. এ., মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখিয়া দিয়াছেন এবং প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিয়া দিয়াছেন। এজন্য আমি উক্ত মহাশয়গণের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

এলাহাবাদ,
আশ্বিন, ১৩১৯

শ্রীনয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

আদর্শ মহিলা দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। যদিও ইহা চারি বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল তথাপি নানা কারণে ঘটিয়া উঠে নাই।

প্রথম সংস্করণ আদর্শ মহিলা সম্বন্ধে আমাদের দেশীয় প্রসিদ্ধ মাসিক-পত্র সকলের সম্পাদকগণ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তদনুসারে পুস্তকখানি আদ্যন্ত সংশোধিত হইল। এইরূপ সংশোধনের জন্য নানা স্থানে পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন ও সংযোজন করিতে হইয়াছে। সীতাদেবীর জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে প্রথম সংস্করণে আমি অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম—অনেকের মতে অধ্যাত্ম রামায়ণ প্রামাণ্য নহে বলিয়া এ সংস্করণে তাহা পরিত্যক্ত হইল। এ সংস্করণে পুস্তকের ভাষা যথাসম্ভব সরল ও প্রাঞ্জল করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পুস্তকখানি এবারে পাইকা হরফে মুদ্রিত হইল।

এক্ষণে প্রথম সংস্করণের ন্যায় দ্বিতীয় সংস্করণও বঙ্গীয় পাঠকের অনুরাগ-দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

ইতি—

কলিকাতা
১৫ই আশ্বিন
১৯২১

গ্রন্থকার

সূচী

চিত্র-সূচী

প্রথম আখ্যান

সীতা

হনুমান্ দেখিল বৃক্ষতলে এক বিশীর্ণদেহা রমণী বিষণ্ণভাবে

আদর্শ মহিলা

প্রথম আখ্যান

সীতা

১

বর্ত্তমান যে স্থানের নাম ত্রিহুত, (তিরভুক্তি) তাহা পূর্ব্বকালে মিথিলা বা বিদেহ নামে অভিহিত হইত। তথায় সীরধ্বজ ও কুশধ্বজ নামে দুই রাজকুমার জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ সীরধ্বজ রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। রাজৈশ্বর্য্যের সহিত তাঁহার চারিত্রিক ও পারমার্থিক উন্নতি যথেষ্ট পরিমাণে উপচিত হইয়াছিল। প্রগাঢ় ধর্ম্মবিশ্বাসে ও ভগবচ্চিন্তায় তিনি রাজা হইয়াও ঋষিতুল্য হইয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ের মমতা লাভ করিয়া প্রজারা সাতিশয় পুলকিত হইয়াছিল। রাজা সীরধ্বজ প্রজাদিগের পিতৃতুল্য হইয়াছিলেন, এজন্য 'জনক,' তৎসহ 'রাজর্ষি' আখ্যা পাইয়া 'রাজর্ষি জনক' * নামেই অভিহিত হইতেন।

জনক রাজকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। তাঁহার রাজসভার কার্য্য প্রজাবর্গের আবেদন-অভি-যোগের নিষ্পত্তিকরণেই পর্য্যবসিত হইত না। যাহাতে প্রজাগণ

* বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকুর অধস্তন ২০শ পুরুষ। ইঁহার পিতার নাম হ্রস্বরোমা—বিষ্ণুপুরাণ ৫ম অধ্যায়।

প্রকৃত সুখী হয় এবং তাহারা সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি লাভ করিয়া মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়, রাজা পারিষদ্‌বর্গের সহিত তাহার আলোচনা করিয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থাও করিতেন। রাজা জনকের ধর্ম্মপিপাসা পরিপূরণের জন্য বহু শাস্ত্রজ্ঞানী ঋষি সভাসদ্‌রূপে রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। তাঁহার সভা এক দিকে বিচারালয়, অন্যদিকে ধর্ম্মমন্দিররূপে অনুমিত হইত। এই সভায় অনেক মুনিঋষি সমাগত হইয়া রাজা জনকের সহিত ধর্ম্মকথা আলোচনায় ও ব্রহ্ম-মীমাংসায় পবিত্র আনন্দ অনুভব করিতেন।

একদা রাজর্ষি জনক কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কুরুজাঙ্গলে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। যজ্ঞানলে পৃথিবীগর্ভস্থ দূষিত পদার্থাদি ভস্মীভূত হইয়া যজ্ঞাগ্নির পবিত্রতা নষ্ট করিতে পারে এই আশঙ্কায় পূর্ব্বে যজ্ঞভূমি কর্ষণ করা হইত। এই জন্য রাজা জনক স্বর্ণ-হলে তত্রত্য ভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন। সহসা লাঙ্গলের মুখে পৃথিবী-সমুদ্ভূতা পরমসুন্দরী কন্যারত্ন দেখিতে পাইলেন। সেই সময়ে লাঙ্গল-পদ্ধতিসমুত্থিতা কন্যার উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। রাজর্ষি জনক এই অসম্ভব ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবিতেছেন, এমন সময়ে দৈববাণী হইল—"হে রাজন, তুমি এই কন্যাকে তনয়া-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন কর। এই অপূর্ব্ব কান্তিমতী কন্যা তোমার মঙ্গল-বিধায়িনী হইবেন। ইঁহার দ্বারা জগতের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে। তুমি এই কন্যারত্নকে দেবতার প্রসাদ—তোমার ভাবী মঙ্গলের পূর্ব্বসূচনা বুঝিও।" রাজা জনক পরম সমাদরে সেই কন্যাকে গ্রহণ করিলেন এবং লাঙ্গল-পদ্ধতিসমুৎপন্না কন্যার নাম সীতা রাখিলেন।

রাজর্ষি জনকের স্নেহাতিশয্যে সেই কুমারী চন্দ্রলেখার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিল। বালিকার সেই স্বাস্থ্যললিত দেহশ্রীতে রমণীস্বভাবসুলভ নম্রতা অত্যন্ত প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিল। রাজা জনক, তনয়ার কুসুম-সুকুমার দেহে যেন এক অশরীরিণী দেবদ্যুতি

দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন,—তাঁহার গৃহে সযত্নরক্ষিত হরধনুতে যে বীর গুণযোজনা করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই এই কন্যারত্ন দান করিবেন।

এই হরধনুর একটা ইতিহাস আছে ঃ—একদা দক্ষ প্রজাপতি এক বিরাট্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তিনি তদীয় জামাতা মহাদেবের প্রতি তত প্রসন্ন ছিলেন না। তজ্জন্য তিনি সেই যজ্ঞে মহাদেবের নিমন্ত্রণ করেন নাই। প্রকারান্তরে মহাদেবের অবমাননাই তাঁহার সেই আরব্ধ যজ্ঞের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। দক্ষদুহিতা সতী অনিমন্ত্রিত হইয়াও পিতৃযজ্ঞে গমন করেন এবং তথায় পিতৃমুখে স্বামীর নিন্দাবাদ শ্রবণে দেহত্যাগ করেন। দেবগণ এই শিবরহিত যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন। এইজন্য শিব কোপানল হইতে এক ধনুক সৃষ্টি করিয়া দেবগণকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। দেবগণ রোষাবিষ্ট শূলপাণির রুদ্রমূর্ত্তি দর্শনে ভীত হইয়া তদীয় ক্রোধ শান্তির জন্য স্তব করিতে লাগিলেন। ইহাতে মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া সেই বিশাল শরাসন দেবগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। মিথিলাপতি রাজা জনকের পূর্ব্ব-পুরুষ দেবরাত * দেবগণের নিকট হইতে ঐ ধনুক প্রাপ্ত হন। তদবধি তাহা মিথিলার রাজপুরীতেই রক্ষিত ছিল।

সীতা অপরূপ রূপবতী ছিলেন। তাঁহার সেই রূপ-লাবণ্যের আকর্ষণে অনেক রাজকুমার জনকের বাটীতে আগমন করিতেন। কিন্তু সকলেই রাজা জনকের ভীষণ প্রতিজ্ঞার নিকট অপমানিত হইয়া প্রত্যাগত হইতেন; যেন দারুণ দুরদৃষ্ট তাঁহাদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া বিদায় দিত। একদা লঙ্কারাজ রাবণও সীতার রূপগুণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আগমন করিয়াছিল। কিন্তু ধনুকে জ্যা যোজনা করিতে গিয়া উপহসিত হয়। রাবণ তাহার এই অদৃষ্টের পরিহাস বুঝিতে পারিল না। সীতার কমনীয় প্রতিমা তাহার মানস-

* ইক্ষ্বাকুর অধস্তন ৭ম পুরুষ।

নেত্রের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ যেন মোহনমূর্ত্তি ধরিয়া তাহার নেত্র-সম্মুখে শোভা পাইতে লাগিল।

২

অযোধ্যাধিপতি দশরথ একদিন রাজসভায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। মহারাজ প্রণত হইলে বিশ্বামিত্র বলিলেন, "রাজন্, তপোবনে রাক্ষসরাক্ষসীদের উৎপাতে মুনিগণের নিরাপদে যজ্ঞ সম্পাদন করা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। মহারাজ, আমি একটি যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্কল্প করিয়াছি; কিন্তু রাক্ষসরাক্ষসীদের উৎপাত স্মরণ করিয়া তাহার সফলতায় সন্দিহান হইতেছি। আপনি ক্ষত্রিয়, রাজা— আর্ত্তের আর্ত্তি দূর করিয়া রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করুন।"

মহারাজ বলিলেন, "এ বিষয়ে মহর্ষির কি অনুমতি হয়?"

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "আপনার দুই পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বেদে অপূর্ব্ব পারদর্শী। আমি জানি, সাক্ষাৎ ধনুর্ব্বেদ যেন রাম লক্ষ্মণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব, আপনি রাক্ষসরাক্ষসীদের উৎপাত হইতে যজ্ঞ রক্ষা করিবার জন্য রাম-লক্ষ্মণকে আদেশ প্রদান করুন। যজ্ঞ সম্পাদনান্তেই তাঁহারা রাজপুরীতে প্রত্যাগত হইবেন।"

রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ যজ্ঞ রক্ষা করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত নিবিড় বনপ্রদেশ দিয়া গমন করিতেছিলেন। সহসা দেখিলেন, তাড়কানাম্নী এক রাক্ষসী বদন ব্যাদান করিয়া তাঁহাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য আকাশপথে আসিতেছে। রাম বিশ্বামিত্রের আদেশে তাহাকে নিহত করিলেন। এইরূপে অনেক-গুলি রাক্ষস বধ করিয়া রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ পূর্ণ করিলেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহারাজ জনকের প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়াছিলেন। তাঁহার রমণীরত্ন কন্যা এই বীরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রেরই উপযুক্ত, ইহা যেন

তিনি মানসনেত্রে দেখিতেছিলেন। তাই তিনি রামলক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া মিথিলায় উপনীত হইলেন। রামচন্দ্র রাজা জনকের প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া সেই হরশরাসন দেখিতে উৎসুক হইলে বিশ্বামিত্র তাহা তাঁহাকে দেখাইলেন। রামচন্দ্র সেই ভীম ধনু বামহস্তে উত্তোলন করিয়া তাহাতে গুণযোজনা করিলেন। পরে শরসন্ধানকরতঃ শর নিক্ষেপ করিবার স্থলে গুণাকর্ষণ করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সমবেত দর্শকগণ সকলেই রামচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। অভিশপ্তা লক্ষ্মী * যেন পূর্ব্বকথা বিস্মৃতা হন নাই; তাই যেন তাঁহার সেই ভ্রমরকৃষ্ণ অক্ষিতারকা ও সেই প্রশস্ত ললাট কি অপূর্ব্ব প্রেমে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বধূবেশা সীতা হাসিতে হাসিতে রামচন্দ্রের গলে বরমাল্য প্রদান করিলেন। তাঁহাদের সেই মিলনের পবিত্র মুহূর্ত্তে যেন অমরাবতীর আনন্দ বিদ্যুতের মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। যেন নন্দনবনশোভী মন্দার কুসুমের অম্লান হাসির সহিত তাঁহাদের হাসির বিনিময় হইয়া গেল। নীল সাগরে স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী মিলিত হইল।

রাজা দশরথ রাজর্ষি জনকের সাদর আপ্যায়নে ভরত ও শত্রুঘ্ন সহ মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। রাজর্ষি জনক সীতার সহিত রামচন্দ্রের, ঊর্ম্মিলার সহিত লক্ষ্মণের এবং ভ্রাতা কুশধ্বজের দুই কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির সহিত ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ দিলেন।

মহারাজ দশরথ কয়েক দিন জনক রাজার ভবনে পরম সমাদরে অতিবাহিত করিয়া পুত্র ও পুত্রবধূগণ সহ অযোধ্যাভিমুখে আসিতেছেন, এমন সময়ে পরশুরাম তাঁহাদের গতিরোধ করিয়া বলিলেন, "রাম, তুমি আমার গুরু মহাদেবের ধনুর্ভঙ্গ করিয়া দম্ভ প্রকাশ করিয়াছ, এজন্য আমি তোমার শক্তি পরীক্ষায় অভিলাষী হইয়াছি।" রামচন্দ্র ইহা শুনিয়া শর প্রয়োগ করতঃ পরশুরামের হস্তধৃত কুঠার ব্যর্থ

* অদ্ভুত রামায়ণ ষষ্ঠ সর্গ দ্রষ্টব্য।

করিলে পরশুরাম লজ্জিত হইয়া তপস্যার্থ মহেন্দ্র পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন।

৩

মহারাজ দশরথ পুত্র ও পুত্রবধূগণকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলেন। রাজপুরীতে আনন্দস্রোত উথলিয়া উঠিল। রাজপুত্রগণ নব বিবাহের পবিত্র আমোদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। যুবরাজ রামচন্দ্র সর্ব্ববিষয়ে প্রজাগণের অধিকতর অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সদয় ব্যবহার, সুমিষ্ট বচন ও অপূর্ব্ব মমতা প্রজাগণকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিল।

মহারাজ দশরথ বৃদ্ধ বয়সে উপযুক্ত পুত্র রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়া তদুপযোগী আয়োজন করিলেন। অভিষেকের দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। প্রজাগণ প্রাণারাম রামচন্দ্রকে আপনাদের রাজারূপে পাইবে মনে করিয়া পুলকিত হইয়া অভিষেক-দিবসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সমস্ত রাজপুরীতে মঙ্গলধ্বজ উড়িতে লাগিল। পতাকাকুল বায়ুভরে কম্পিত হইয়া শির তুলিয়া যেন অভিষেকের বার্ত্তা কহিতে লাগিল। সানাইএর হৃদয়োন্মাদিনী মধুর রাগিণী যেন রাজপুরীর মধ্যে আনন্দের মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত করিয়া দিতেছিল। কিন্তু বিধাতার চক্রে সানাইএর এই গান সহসা শোককরুণ স্বর ধরিয়া অযোধ্যাবাসীর প্রাণকে শোকাকুল করিয়া তুলিল।

সম্বরাসুরের সহিত যুদ্ধে মহারাজ দশরথ বাণাহত হইয়া মৃতকল্প হইয়াছিলেন। তিনি মধ্যমা মহিষী কৈকেয়ীর সেবা-শুশ্রূষায় সুস্থ হইয়া তাঁহাকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু কৈকেয়ী বলিয়াছিলেন,—"আমার আপনার মত স্বামী—রামচন্দ্রের মত পুত্র, এমন প্রভুপ্রিয় প্রজা—আমার আবার প্রার্থনা কি?"

দশরথ বরগ্রহণে নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলে কৈকেয়ী বলিয়াছিলেন—"প্রয়োজন মত লওয়া যাইবে।" রাজা তাহাতেই স্বীকৃত হন।

আজ যুবরাজ রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক-সংবাদে নাগরিক প্রজাদের আনন্দের সীমা নাই। রাজপুরী অপরূপ সুষমায় ঐশ্বর্য্যময়ী নাট্যশালার মত শোভা পাইতেছে। সর্ব্বত্র আনন্দ যেন উথলিয়া উঠিতেছে। এমন সুখের সময়ে এক কুব্জা দাসীর হৃদয়ে এত ব্যথা কেন? সমস্ত সংসারে আনন্দ ও তৃপ্তি পরিপূর্ণভাবে বহিতেছে, কিন্তু কে ঐ হতভাগিনী হৃদয়ভরা দুঃখ ও অতৃপ্তির তুষানলে ভস্মীভূত হইতেছে?—সে কৈকেয়ীর পিতৃগৃহাগতা দাসী কুব্জা মন্থরা।

কূটবুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণচিত্ত ব্যক্তিগণ জগতের কোন সৎ বিষয়কেই পবিত্র চক্ষে দেখিতে পারে না। কুব্জা দাসী মন্থরাও রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকে যেন কত অনর্থ দেখিতে লাগিল। সে ভাবিল, রাম রাজা হইলে কৈকেয়ী রাজমাতার অধীন হইয়া পড়িবে; ভরত রাজভ্রাতা হইয়া বিষণ্ণভাবে কালযাপন করিবে। এতদিন যাহাকে রাজরাণীর গৌরবমুকুটে সুশোভিত দেখিতেছি, এবার তাহাকে রাজার বিমাতৃরূপে দেখিব কিরূপে—মনে করিয়া তাহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছিল। সে দ্রুতপদে কৈকেয়ীর নিকট গিয়া বলিল, "ওগো সরলে, একবার ভাবিয়াছ কি তোমার ভবিষ্যৎ?" সরলা কৈকেয়ী, দাসীর এই কথার রহস্যোদ্ভেদ করিতে না পারিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মন্থরা বলিল, "রাম যে রাজা হইতেছেন!" শুনিবামাত্র কৈকেয়ী অত্যন্ত পুলকিত হইয়া স্বীয় কণ্ঠশোভী মুক্তাহার তাহাকে পারিতোষিক প্রদান করিলেন। মন্থরা কৈকেয়ীর প্রভূত তিরস্কার করিয়া সেই মুক্তামালা দূরে নিক্ষেপ করিল। কৈকেয়ী ক্রমশঃ গভীরতর সন্দেহে নিমজ্জিত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন—একি রহস্য!

কৈকেয়ীর প্রকৃতিটি বড় সরল ও সুন্দর ছিল। কিন্তু বুদ্ধিটি প্রকৃতির তত অনুযায়িনী ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং তিনি

সহজেই কুটিলা মন্থরার ক্রীড়া-পুত্তলিকার মত আয়ত্ত হইয়া পড়িলেন, আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়া দাসীর প্ররোচনায় রাণীত্ব বিসর্জ্জন দিলেন। মন্থরার পরামর্শে তাঁহার সরল প্রকৃতিতে গরল প্রবেশ করিল। কৈকেয়ী ভাবিলেন, তাই ত, রাম হইতে আমার ভরত কম কোন বিষয়ে ? সাত পাঁচ ভাবিয়া রাজার পূর্ব্ব স্বীকৃত দুইটি বর পাইবার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। মন্থরা পরামর্শ দিল এরূপে বৃদ্ধ রাজার মন পাইবে না। অশ্রুজল, ভূশয়ন ও আভরণহীনতাই স্বামীকে সোজা পথে আনিবার অব্যর্থ উপায়। কৈকেয়ী তাহাই বুঝিয়া অশ্রুজলে প্রফুল্ল মুখখানি সিক্ত করিয়া ও নিরাভরণা হইয়া শয়নপ্রকোষ্ঠে নিপতিত হইয়া রহিলেন। মন্থরা 'ঔষধ ধরিযাছে' দেখিয়া সহর্ষে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

মহারাজ দশরথ অভিষেকের সমস্ত আয়োজন করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করতঃ দেখিলেন, কৌশল্যা পুত্রের মঙ্গলেচ্ছায় পূজানিরতা। কৈকেয়ীর প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কৈকেয়ী বাতাভিহত কুসুমলতিকার ন্যায় ভূতলে পতিতা। আজ এই আনন্দের দিনে প্রিয়তমা পত্নীগণের মুখে আনন্দের লহরী দেখিয়া রাজা কত সুখী হইবেন মনে করিতেছিলেন, কিন্তু এ কি ? কেন এ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল, মনে করিয়া ক্ষণে ক্ষণে যেন বৃদ্ধ রাজার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইতেছিল।

অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর কৈকেয়ী বলিলেন, "মহারাজ, জানি আপনি সত্যব্রত ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ। আপনি বহুদিন হইতে আমাকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত আছেন, আমি অদ্য তাহা প্রার্থনা করিতেছি।"

মহারাজ দশরথ বলিলেন, "এজন্য এত অভিমান কেন ! তুমি যাহা চাহিবে আমি তোমাকে তাহাই দিব।" রাজা জানিতেন না, সুরভি কুসুমরাশিতে এমন প্রাণান্তকারী বিষধর সর্প অথবা বর্ষা-প্রজল মেঘমালায় এমন ভীষণ বজ্র লুক্কায়িত রহিয়াছে।

কৈকেয়ী বলিলেন, "আমি এক বরে, রামচন্দ্রের রাজপদ লাভের পরিবর্ত্তে ভরতের সিংহাসনপ্রাপ্তি ও অপর বরে, রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনগমন প্রার্থনা করি।"

রাজা দশরথ শ্রবণমাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বহু কষ্টে চৈতন্য সঞ্চার হইলে বলিতে লাগিলেন, "সর্ব্বনাশিনি, তুমি অন্য বর কামনা কর। যে রাম জগতের প্রাণারাম, যে ভরত হইতেও তোমার প্রতি অধিকতর ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, যে রাম সমস্ত সদ্‌গুণের আধারস্বরূপ, সেই লোকাভিরাম রামচন্দ্র তোমার এমন কি অনিষ্ট সাধন করিয়াছে যে, তুমি তাহার সর্ব্বনাশ কামনা করিতেছ! বোধ হয় তুমি কোন কুহক-মন্ত্রে প্রকৃতিস্থ নহ, তাই এইরূপ বিসদৃশ কামনা করিতেছ!" এইরূপ বলিয়া রাজা কৈকেয়ীকে কত বুঝাইলেন। কখনও বিনয় বচন দ্বারা, কখনও অনুরোধ-বাক্যে, কখনও বা তিরস্কার দ্বারা তাঁহার কামনা ত্যাগের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৈকেয়ী আপনার কথা ছাড়িলেন না। দশরথ ভাবিলেন, কৈকেয়ীর হৃদয় যে স্বার্থপরতার বিশাল মরুভূমি, সমবেদনার অশ্রুজলে তাহা শ্যামায়িত হইবে কেন! এই মনে করিয়া রাজা ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন।

ক্রমে রামচন্দ্র সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া পিতাকে সত্যমুক্ত করাই স্থির করিলেন। রামচন্দ্র বনে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া মাতৃদর্শনে চলিলেন। দাসী বলিল, "মহিষী পূজাগারে।" রামচন্দ্র পূজাগারে গিয়া জননীর চরণ বন্দনা করিলেন। দেবতার প্রতি বদ্ধদৃষ্টি কৌশল্যা আনন্দাতিশয় প্রকাশ করিয়া রামচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন।

রাম বলিলেন, "মা, আজ এই হর্ষ যে বিমর্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা তুমি এখনও জান না! আমি রাজ সিংহাসন লাভের পরিবর্ত্তে আর এক কঠোর পরীক্ষায় উপনীত হইয়াছি। এ পরীক্ষায় স্বার্থের

আহুতি দিয়া পরার্থকে বরেণ্য করিয়া তুলিতে হইবে। তোমার পবিত্র পদধূলি আমার জীবনের গ্লানি দূর করিয়া আমার হৃদয়কে বলীয়ান্ করুক; তোমার স্নেহ-কবচ যেন আজ আমাকে কর্ম্মের রণে জয়যুক্ত করে, আশীর্ব্বাদ কর।”

কৌশল্যা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। রামচন্দ্র জননীকে সমস্ত কথা বিবৃত করিলে কৌশল্যা উন্মত্তার ন্যায় হাহাকার করিতে করিতে সংজ্ঞাহীন হইলেন।

অনেক যত্নে রামলক্ষ্মণ তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। কৌশল্যা রামচন্দ্রকে বনে গমন করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র বলিলেন, “মা, আমি রাজ্যত্যাগ করিয়া বনে গমন না করিলে পিতা সত্যমুক্ত হইবেন না। পিতার প্রিয়াচরণ ও সত্যরক্ষা করা পুত্রের অবশ্যকর্ত্তব্য। আমি বনে গমন না করিলে পিতার সত্য ভঙ্গ হইবে। মা, আমি তোমার পবিত্র গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কি এইরূপ হেয় হইব? সামান্য বনবাস-ক্লেশ কি আমার এত অসহ্য হইবে? মা, আমার পিতা, তোমারও গুরু, সুতরাং তুমিও এ বিষয়ে একটু বিবেচনা করিয়া দেখ।”

কৌশল্যা রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া অবিরত বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি কোনক্রমেই এমন কঠিন বিষয়ে সম্মতি দান করিতে না পারিয়া উদ্‌ভ্রান্তার ন্যায় রামচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রামচন্দ্র অনেক বলিয়া কহিয়া কৌশল্যাকে প্রবোধ দান করিলেন। অবশেষে মাতৃ-অনুমতি লইয়া প্রিয়তমা সীতার নিকট উপস্থিত হইলেন।

সীতা সমস্ত শুনিয়া রামচন্দ্রের সহিত বনে গমন করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাম, সীতাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিলেন না; এজন্য সীতাদেবী রামচন্দ্রকে বলিলেন, “আর্য্যপুত্র, তুমি পণ্ডিত, তুমি শূর, তুমি বীর। তুমি আমাকে

রাজপুরীতে থাকিবার জন্য যাহা যাহা বলিতেছ, স্নেহান্ধদৃষ্টিতে যে যে দুর্ঘটনা দেখিতেছ, তাহা কখনই তোমার উপযুক্ত নহে। তোমার এই উপদেশ আমার অনুকূল কর্ত্তব্য নহে। তোমার সঙ্গে ছায়ার মত বনে গমন করাই আমার কর্ত্তব্য। দম্পতীর মধ্যে একের সুখদুঃখের সহিত অন্যের সুখদুঃখ যে অবিচ্ছেদ্যরূপে বিজড়িত। যেখানে ইহার ত্রুটি তথায় দাম্পত্যধর্ম্ম প্রশংসনীয় কিনা এ বিচার তোমারই হস্তে। স্বামীই যে স্ত্রীলোকের সর্ব্বস্ব—স্বামীর সুখদুঃখেই যে স্ত্রীর সুখদুঃখ। আবার স্ত্রী যে সন্তপ্ত স্বামীর মূর্ত্তিমতী সান্ত্বনা। তুমি কি আমাকে এতই হীন মনে কর যে, আমি তোমার সুখেরই সঙ্গিনী। দুঃখের সময়ে আমি কি তোমার দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়া তোমাকে প্রসন্ন করিতে পারি না? আমার কি হৃদয়ের এমন বল নাই, যাহাতে আমি পার্থিব সামান্য সুখকে বিসর্জ্জন দিয়া তোমার সঙ্গসুখকে স্বর্গসুখ অপেক্ষাও অধিকতর অনুভব করিতে পারি? স্বামীর সঙ্গই যে স্ত্রীলোকের রাজপদ। তুমি আমাকে এমন গৌরবজনক স্থান হইতে বিচ্যুত করিতে চাও?"

রামচন্দ্র স্নেহভরে বলিলেন, "প্রাণাধিকে, তুমি আমার নিকট দাম্পত্য-ধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা করিলে তাহা আমি জানি। আমি জানি, স্ত্রীই স্বামীর সন্তপ্ত জীবনে মলয়ানিলহিল্লোলের মত সমস্ত যন্ত্রণা মুছিয়া দেয়। কিন্তু অয়ি লাবণ্যলতিকে, বনবাসের দারুণ ক্লেশে যখন তোমার দেহখানি রৌদ্রক্লিষ্ট স্বর্ণলতার মত নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে, যখন তোমার এই অলক্তকরঞ্জিত চরণ দু'খানি কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হইয়া ব্যথিত হইবে, যখন বনচারী রাক্ষসাদির ভীতিতে তোমার প্রফুল্ল কমলতুল্য মুখখানি বিশুষ্ক হইয়া যাইবে—তখন সেই গভীর শোক-দৃশ্য যে আমার অসহনীয় হইবে। প্রিয়তমে, তোমার ঐ প্রেমপূত মুখখানি যে আমার জীবনাকাশের পূর্ণশশী, তাহা দুরদৃষ্ট-রাহু-কবলিত হইলে আমার জীবনে যে গভীর শোকদৃশ্য নিপতিত

হইবে, আমি তাহা কল্পনা করিতেও ভীত হই। আমি স্বেচ্ছায় হৃৎপিণ্ড উৎখাত করিয়া ফেলিতে পারি কিন্তু তোমার কোন কষ্ট আমি দেখিতে পারিব না। এই জন্যই বলি, তুমি জননীদেবীর নিকট তাঁহার হতাশার ভীষণ অন্ধকারে আশার ক্ষীণ দীপকলিকার মত থাকিয়া আমার আনন্দ বর্দ্ধন কর।”

সীতা শুনিয়া অভিমানভরে বলিলেন, “আর্য্যপুত্র, তুমি কি আমাকে বিলাসেরই উপকরণ ভাবিয়াছ? ভাবিয়াছ কি, আমি তোমার জীবনে সুখেরই সঙ্গিনী? দুঃখের সঙ্গিনী বলিয়া দেখিতে তুমি কি আমাকে এখনও পার নাই? রমণীজন্ম যে স্বামীর সুখ-দুঃখের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া সার্থক, তুমি কি ইহা জান না? স্বামীর সহিত থাকিলে আরণ্যজন্তুসমাকুল বনই যে সাধ্বী স্ত্রীর নন্দন-কানন, স্বভাবজ বনফলই যে তাহার রাজভোগ, সুস্বাদ নদীনীরই যে তাহার সুবাসিত পেয়, তৃণশয়নই যে তাহার সুকোমল শয্যা, বনফুলের মধু-সৌরভই যে তাহার বিলাসোপকরণ। তোমার সাহচর্য্যে আমি যে তৃপ্তি লাভ করিব, রাজপুরীর শত আনন্দ আমাকে তদ্রূপ সুখী করিতে পারিবে না। তুমি আমাকে সঙ্গিনী করিয়া লও। তুমিই সাক্ষাৎ রাজশ্রী—তুমি বনে গমন করিলে সেই বনই তোমার প্রভাবে স্বর্গসম হইয়া উঠিবে; আর এই রাজপুরী সু-ভীষণ প্রেতদেশের মত আমার অশান্তিকর হইয়া উঠিবে। তোমার মধু-মিলনই যে আমার স্বর্গসুখ, কিন্তু তোমার বিরহজনিত যন্ত্রণা যে আমার প্রাণান্তকর কালকূট! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করিও না। নাথ, আমি তোমার সহিত বনগমন করিয়া তোমার ক্লেশের কারণ হইব না। তোমার পবিত্র সঙ্গই যে আমার জীবনের চিরকাম্য। আমি তোমার সহিত বনে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি প্রখর সূর্য্যকিরণে ক্লান্ত হইয়া পড়ি, তাহাহইলে তোমার ঐ প্রেমপূত মুখখানি দেখিয়াই প্রফুল্ল হইব—তোমাকে দেখিয়া আমি শত যন্ত্রণা বিস্মৃত

হইব। নাথ, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিও না।”

রামচন্দ্র বনগমনে কৃতনিশ্চয়া সীতাদেবীকে বনচারী রাক্ষসাদির উৎপাতের কথা বলিয়া নিরস্ত করিবেন মনে করিলেন। কিন্তু ভাবিলেন না, সীতা যে ক্ষত্রিয়াণী। সে যে রাজগণের ভীতিকর হরধনুর্ভঙ্গকারীর সহধর্ম্মিণী—সে যে তাড়কানিসূদনের বীরজায়া—সে যে ক্ষত্রিয়বিধ্বংসী পরশুরামের দর্পহারীর ধর্ম্মপত্নী।

সীতা বলিলেন, “নাথ, তুমি বীরত্বপণে জয়ী হইয়া আমাকে পাইয়াছ। আজ তোমার মুখে এমন ভীরুজনোচিত কথা কেন? তুমি বীর, তুমি পুরুষ, তুমি শাস্ত্রজ্ঞ—তুমি আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না? তুমি আমাকে রাক্ষসের ভয় দেখাইতেছ? তুমি না কুমার বয়সে তাড়কাপ্রমুখ রাক্ষসদল বিনাশ করিয়া বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ পূর্ণ করিয়াছিলে? তুমি না হরধনু ভঙ্গ করিয়া আমাকে লাভ করিয়াছিলে? তুমি না মদগর্ব্বিত পরশুরামের কুঠার ব্যর্থ করিয়াছিলে? অতএব আমার রাক্ষসকে ভয় কি? হে পুরুষর্ষভ, আমাকে সে ভয় দেখাইও না—স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ স্বামীর প্রধান কর্ত্তব্য, ইহা বিস্মৃত হইও না।

তখন রামচন্দ্র সীতাকে সঙ্গিনী করিতে আর ইতস্ততঃ করিতে পারিলেন না। ভ্রাতৃপরায়ণ লক্ষ্মণও রামচন্দ্রের সহিত বনগমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সুমিত্রা লক্ষ্মণের বনগমন সংবাদে কিছুমাত্র দুঃখিতা না হইয়া রামের হস্তে লক্ষ্মণকে সঁপিয়া দিয়া বলিলেন, “বৎস লক্ষ্মণ, রামকে পিতৃতুল্য, সীতাদেবীকে আমার মত ও নিবিড় বনভূমিকে অযোধ্যা সদৃশ দেখিবে।”

রামলক্ষ্মণ বনগমনোপযোগী বেশধারণ করিলেন। যে রামচন্দ্রের মস্তকে বহুমূল্য রাজমুকুট শোভা পাইত, আজ তাহাতে জটাভার! যে পবিত্রদেহ অগুরুচন্দনের সৌরভে স্নিগ্ধ এবং বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে

সুশোভিত থাকিত, আজ তাহাতে চীরবাস! রাজকুমার আজ সত্যের নিকট সমস্ত বিলাসোপকরণ বলি দিয়া বৈরাগ্যকে বরণ করিয়া লইলেন; কেবল সীতাদেবী শ্বশ্রূদেবীর অনুরোধে রাজেন্দ্রাণীর বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন না। অতঃপর তাঁহারা পিতার ও জননীগণের চরণ বন্দনা করিয়া এবং অপরাপর গুরুজনকে অভিবাদন করতঃ রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজ্যের মঙ্গল ও শান্তির পশ্চাতে যেন সাক্ষাৎ ধনুর্ব্বেদও গমন করিতে লাগিল।

রাজকুমারদ্বয় ব্যায়াম ও যুদ্ধশ্রমে দুঃখের কঠোর মূর্ত্তি দেখিতে অনভ্যস্ত নহে, কিন্তু যে সীতাদেবী শৈশবে পিতৃস্নেহের শ্যামচ্ছায়ায় অনিলবিকম্পিতা লতাটির মত লীলাপ্রবণা ছিলেন, যে রাজবধূ যৌবনে রাজাবরোধে সযত্ন-রক্ষিতা, যিনি বীরস্বামীর শান্তি, সেই কুসুম-কোমলা সীতাদেবী আজ বনপথে! তাঁহার সেই চারু চরণ আজ ধূলিক্লিন্ন! আজ তিনি রাম-বাহু আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছেন!

ক্রমে তাঁহারা গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। গঙ্গাতটান্তলীন বিশাল অরণ্যানীতে প্রকৃতিদেবী যেন সৌন্দর্য্যের শত উপায়ন লইয়া সত্যোন্মাদ রামচন্দ্রের কর্ত্তব্যপ্রবণ প্রাণের মধ্যে প্রীতির শান্তশীতল সলিলসেকের জন্য সচেষ্ট হইলেন। রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের মধু-সঙ্গে বনবাস-ক্লেশ ভুলিয়া প্রকৃতির নগ্নসৌন্দর্য্য দর্শনে পুলকিত হইলেন। যেন আজ বনদেবী অলিগুঞ্জনমুখরিত পুষ্পদামশোভিত শ্যামল পল্লব দোলাইয়া রামচন্দ্রের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র গঙ্গার মোহন দৃশ্য দর্শনে পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

তথা হইতে তাঁহারা চিত্রকূটে উপনীত হইলেন। পাষাণদেহ চিত্রকূট যেন সূর্য্যবংশ-কমলিনী সীতাদেবীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সচেষ্ট হইল। সে তাহার শৃঙ্গশোভী বনতরুর শ্যামল সৌন্দর্য্য, সাধুপুষ্পিতা বনলতার কমনীয়তা ও শিরশ্চুম্বিতা মেঘমালার মোহনদৃশ্য লইয়া যেন তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে লাগিল।

চিত্রকূটবাহিত নির্ঝরিণী সকল মৃদু কলতানে সীতাদেবীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। রামচন্দ্রের আদর ও সোহাগ পাইয়া সীতা সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইলেন। স্বামীর সাহচর্য্য, লক্ষ্মণের ভক্তি এবং প্রকৃতির সেই অযাচিত উপহার প্রাপ্ত হইয়া সীতাদেবী অযোধ্যার সুখ ভুলিয়া গেলেন।

৪

এদিকে রামচন্দ্রাদির বনগমনে অযোধ্যাবাসিগণ অত্যন্ত কাতর পড়িল। রাজা দশরথ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই সময়ে ভরত রাজপুরীতে ছিলেন না; ভ্রাতা শত্রুঘ্নের সহিত মাতুলালয়ে ছিলেন। পিতার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া ভরত অযোধ্যায় আগমন করিলেন এবং পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাপনান্তে রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তখন রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত চিত্রকূটে অবস্থান করিতেছিলেন। ভরত রামচন্দ্রের চরণে নিপতিত হইয়া মাতার দুর্ব্বব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির বশে এইরূপ অনর্থ ঘটাইয়াছেন মনে করিয়া ভরত আপনাকে বড়ই সঙ্কুচিত বোধ করতঃ রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র ভরতের প্রস্তাবে কোন মতেই সম্মত হইতে পারিলেন না। অগত্যা ভরত রামচন্দ্রের পাদুকা গ্রহণ করিয়া তাহা অযোধ্যার বহির্ভাগে নন্দীগ্রামে রাজসিংহাসনে স্থাপিত করতঃ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

ভরত প্রত্যাগত হইলে রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন। সতীশিরোমণি সীতা হতাশাতপ্ত প্রাণপতিকে সান্ত্বনা দিবার ছলে বনকুসুমে আপনার দেহ সুশোভিত করিতেন। মৃগয়াশ্রান্ত রামচন্দ্রের স্বেদ-সলিল সীতার হস্ত-সঞ্চালিত পল্লব-ব্যজনে তিরোহিত হইত।

কলনাদিনী নদীর তীরে উভয়ে প্রকৃতির সরল শিশুর মত বিচরণ করিতেন। কখনও স্বামি-সোহাগিনী স্বীয় অলকগুচ্ছ বনফুলে সজ্জিত করিয়া বনদেবীর মত শোভা পাইতেন—মনে হইত যেন অযোধ্যার রাজশ্রী দণ্ডকারণ্যে এক অভিনব রাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। লক্ষ্মণ তথায় বাসোপযোগী একটি স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। সীতাদেবী স্বামীর সহিত সেই কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ রাত্রিকালে সেই কুটীরের প্রহরীর কার্য্যে ব্রতী থাকিতেন।

সীতা প্রকৃতির অতি আদরের শিশুর মত সরলপ্রাণা। গোদাবরী-তীর তাঁহার ক্রীড়-প্রাঙ্গণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের কুটীরের চতুঃপার্শ্বে বহু বনকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া সেই স্থান সৌরভ-পবিত্র করিয়া তুলিত। কোকিলের কুহুতান শুনিয়া সীতার নিদ্রাভঙ্গ হইত, বন্যজন্তু সকল সেই প্রকৃতির সরল শিশুর সখিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। নীহার-নিষিক্ত কুসুমস্তবক, আনম্র-শীর্ষ শস্যগুচ্ছ, কাশকুসুমপুলকিত গোদাবরী-তীর সীতাদেবীকে নানারূপে তৃপ্তি দান করিত।

এইরূপে সীতা প্রকৃতির সহিত নিজের প্রাণ মিলাইয়া দিলেন। প্রকৃতিদেবীও যেন সৌন্দর্য্যের শত উপহার দিয়া সীতাদেবীর সুখের সংসার সাজাইয়া দিলেন। সীতা কাননচারিণী কুরঙ্গী সকলকে আদর করিতেন। কত মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গম তাঁহার কুটীরসন্নিহিত বৃক্ষশাখায় বসিয়া গান করিত। সৌন্দর্য্যবিভোরা সীতা আত্মহারা হইয়া সেই মধুর কণ্ঠের সহিত নিজের কণ্ঠস্বর মিলাইয়া গান করিতেন। বনদেবীর বন-বীণার স্বর যেন কোন্ অনির্দ্দেশ্য গন্ধর্ব্বলোক হইতে আসিয়া সীতাকে পুলকিত করিয়া তুলিত। সীতা কখনও গোদাবরী-নীরস্থ কমলকাননে সুরবালাগণের জলকেলি দর্শন করিতেন। কখনও বা স্বামীসঙ্গে পর্ব্বত-গাত্রে বসিয়া কত গল্প শুনিতেন। কখনও বা নবমুকুলিতা লতায় অলিগুঞ্জন শুনিয়া পুলকিত হইতেন। কখনও

মুনিকন্যাদের সহিত গল্প করিতেন। এইরূপে তিনি একটি সুখের সংসার পাতাইয়া বসিলেন।

এই নূতন সংসারে আসিয়া সীতাদেবী অযোধ্যার রাজসুখ বিস্মৃত হইলেন। শত বিশৃঙ্খলাবিজড়িত সহস্র স্বার্থকলুষিত সসীম রাজপ্রাসাদ সেই চির শান্তিময় উদার অসীম বনভূমি হইতে কত হেয় বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। সৌগন্ধ্যপূর্ণ সত্যশুভ্র বনফুল, প্রকৃতি-শিক্ষিত পক্ষীর কাকলি, স্বতঃসংবর্দ্ধিত বনতরুর পুষ্পসমৃদ্ধি, শুচিস্মিতা তাপসকুমারীর সখিত্ব তাঁহাকে বনবাস-ক্লেশ ভুলাইয়া দিল।

কিন্তু সীতার এত সুখ অধিক দিন স্থায়ী হইল না। সহসা এই আনন্দের রঙ্গমঞ্চে দুঃখের দৃশ্য নিপতিত হইল।

রাবণের ভগিনী শূর্পণখা দণ্ডকারণ্যে বাস করিত। খরদূষণের নেতৃত্বে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস তথায় অবস্থিত ছিল। একদিন শূর্পণখা বনে ভ্রমণ করিতে করিতে রামচন্দ্রের আশ্রমসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রের ভুবনবিমোহন রূপ দর্শনে বিমোহিত হইল। রামচন্দ্র পাপীয়সীর প্রণয়ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করিলে সেই ক্রূরা শূর্পণখা সীতা দেবীকেই রামচন্দ্রের প্রণয়লাভের অন্তরায়স্বরূপ মনে করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। সীতা রাক্ষসীর এবংবিধ ভাবদর্শনে ভীতা হইলেন; তাঁহার প্রফুল্ল মুখখানি বিশুষ্ক হইয়া গেল। লক্ষ্মণ পাপীয়সীর সমুচিত শাস্তিবিধান করিলেন। হতভাগিনীর নাসাকর্ণ ছিন্ন হইল।

ভগিনীর অপমানে খর ও দূষণ ভীমবলে রামচন্দ্রের উপর পতিত হইয়া সদলে নিহত হইল। রামচন্দ্র রাক্ষসগণের ভীতিকর প্রত্যক্ষ শমন-রূপে দণ্ডকারণ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ছিন্নকর্ণনাসা পাপিনী শূর্পণখা প্রতিহিংসার অনল বুকে জ্বালিয়া রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের দুর্দ্দশার কথা জানাইল। রাবণ ভগিনীর এই অপমানে যেন আহুত-ঘৃত বহ্নির মত জ্বলিতে

লাগিল এবং সামান্য মানুষ হইয়া ত্রিলোকবিজয়ী রাবণের ভগিনীর এতাদৃশ অপমান করিয়াছে ভাবিয়া ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল। শূর্পণখা রাবণকে বলিল—"মহারাজ, আমি বনে ভ্রমণ করিতে করিতে রামের পার্শ্বদেশে একটি অনিন্দ্যসুন্দরী রমণী দেখিয়া মনে করিলাম, এই বরবর্ণিনী, মানুষ রামের নিকট শোভনীয় নহে—ত্রিলোকবিশ্রুত সুরাসুরবিজয়ী তোমারই অঙ্ক-শোভিনী হইবার উপযুক্ত। প্রফুল্ল কুসুমকে কে না দেবতার চরণে অর্পণ করিতে চায়? সেই সুন্দরীকে আনিয়া তোমাকে প্রদান করিতে পারিলে কৃতার্থ হইব মনে করিয়া আমি তথায় গিয়াছিলাম। তাহাতেই পাপিষ্ঠ রাম আমার এই দুর্দ্দশা করিয়াছে—আমার সহচর খর ও দূষণ আমার সাহায্য করিতে গিয়া তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। তুমি ত্রিলোক বিজয়ী বলিয়া গর্ব্ব কর, কিন্তু এখন দণ্ডকারণ্য তোমার অধিকারবিচ্যুত—তোমার একমাত্র ভগিনী এইরূপ অপমানিত—লাঞ্ছিত। আমি চাই প্রতিহিংসা। প্রতিহিংসার অনলে আমার বক্ষঃপঞ্জর জর্জ্জরীভূত হইতেছে। তুমি তুচ্ছ রামলক্ষ্মণকে বধ করিয়া সেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠা সীতাকে লইয়া আইস। মঞ্জুকেশা সীতা তোমার বিলাসকাননে প্রফুল্ল স্থলকমলিনীর ন্যায় শোভা বিচ্ছুরিত করিবে।"

মদগর্ব্বিত রাবণ আজ বিভ্রান্ত। এক দিকে ভগিনীর অপমান—অন্য দিকে পাপতৃষা। হতভাগ্য আজ দুই স্রোতে আত্মবিসর্জ্জন দিল। আত্মবিস্মৃত রাবণ নিজের সম্মান ভুলিয়া রূপ-বহ্নির আকর্ষণে পতঙ্গের মত ধাবিত হইল।

রাবণ মায়াবী মারীচের সহিত পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া অবিলম্বে দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইল। দুর্ব্বুদ্ধি রাবণ আত্মশক্তি বিস্মৃত হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা নিজের পাপবাসনা চরিতার্থ করিতে উদ্যত হইল। মারীচ রাবণের আদেশে এক স্বর্ণবর্ণ মৃগের রূপধারণ করিয়া রামচন্দ্রের আশ্রম-সন্নিহিত হইল।

New-Artistic Press, Calcutta.

পঞ্চবটীতে সীতা, রাম ও লক্ষ্মণ—অদূরে মায়ামৃগ ।

স্বর্ণমৃগ সীতার নেত্রপথে নিপতিত হইলে সীতা রামচন্দ্রকে বলিলেন, "নাথ, তুমি এই অপরূপ মৃগটিকে জীবিত ধরিয়া আন, আমি ইহাকে আশ্রমে রাখিয়া প্রতিপালন করিব। জীবিত আনিতে অশক্ত হইলে মৃতই আনিও। উহার ঐ অপরূপ চর্ম্ম আমরা আশ্রমে রাখিয়া দিব।"

আজ রামচন্দ্রের বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিল। তিনি অসীম ধীশক্তিসম্পন্ন হইয়াও প্রতারণায় পতিত হইলেন। পার্থিব কুহেলিকায় তাঁহার দেব-চক্ষুর গতি রুদ্ধ হইল। ধনুষ্পাণি রামচন্দ্র লক্ষ্মণের উপর সীতারক্ষার ভার দিয়া আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

রামচন্দ্র স্বর্ণমৃগের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইলে সেই মৃগ সহসা অন্তর্হিত হইল। রামচন্দ্র এই অদৃষ্টের পরিহাস বুঝিতে পারিলেন না। মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিলেন। দুর্ভাগা-রজনী যেমন বিপন্ন পথিককে বিদ্যুৎ-হাস্যে ক্ষণে ক্ষণে উপহাস করে, মায়া-মৃগও তদ্রূপ এক একবার রামচন্দ্রের নেত্রপথবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। তিনি এই অপূর্ব্ব মৃগকে জীবিত ধরিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, তাহার উপর বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অব্যর্থ সন্ধানে মায়া-মৃগ আহত হইয়া রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করতঃ, "রাক্ষসের হাতে আমার প্রাণ যায়—কোথায় সীতা—কোথায় লক্ষ্মণ, আমায় রক্ষা কর" বলিয়া প্রাণত্যাগ করিল। রামচন্দ্র মায়া-মৃগের মুখ হইতে এইরূপ অসম্ভব কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ কি হইল! মায়ামৃগের এই উক্তির পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় রহস্য আছে ভাবিয়া রামচন্দ্র ত্বরিতপদে আশ্রমে আসিতে লাগিলেন।

কুটীরবাসিনী সীতা দূরাগত সেই রামকণ্ঠস্বরে চলচিত্তা হইয়া উঠিলেন এবং ব্যস্ত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "লক্ষ্মণ, তুমি অবিলম্বে আর্য্যপুত্রের সাহায্যার্থ গমন কর।" স্থিরধী লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের শক্তি ও তত্রত্য রাক্ষসদিগের ছলনার বিষয় সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন, এজন্য

তিনি সীতার ব্যাকুলনির্ব্বন্ধেও অগ্রজের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া সীতাকে একাকিনী কুটীরে রাখিয়া যাইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

স্বামীর বিপদাশঙ্কায় চলচিত্তা সীতা লক্ষণের এই নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া ক্রোধভরে কটূক্তি করিলেন। লক্ষ্মণের অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর মূলে কোন অসৎ উদ্দেশ্যের অনুমান করিয়া সীতা সিংহগর্জ্জনে বলিয়া উঠিলেন, "রে দুষ্ট লক্ষ্মণ, বুঝিয়াছি আমি, তুমি অসদভিপ্রায়ে আমার অনুবর্ত্তী হইয়াছ। ভ্রাতৃপ্রেম তাহার ছদ্মবেশমাত্র।"

বিপৎকালে মানুষের বুদ্ধির স্থিরতা থাকে না। সীতারও তাহাই ঘটিল। লক্ষ্মণের স্বার্থত্যাগ, ভ্রাতৃপ্রেম, সংযম, উচ্চপ্রাণতা ও নারীতে মাতৃভাব আজ সীতাদেবী সন্দেহের চক্ষে দৃষ্টি করিলেন। আজ যেন কোন দানব আসিয়া সীতার সরল প্রাণে গরল প্রবেশ করাইয়া দিল—তাঁহার চিরশান্ত প্রকৃতিতে অশান্তির জ্বালা বহাইয়া দিল। সীতাদেবীর মাতৃত্ব-গর্ব্বোন্নত প্রাণ আজ অমূলক সন্দেহে অবনমিত হইয়া পড়িল। লক্ষ্মণ সীতার এই অভাবিত ভাবান্তর ও রুদ্রমূর্ত্তি দর্শনে বিস্মিত ও রোষাবিষ্ট হইয়া অশ্রুসজলনেত্রে অবিলম্বে কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সুযোগ বুঝিয়া দুষ্টবুদ্ধি রাবণ সন্ন্যাসিবেশে সীতার নিকট উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। কুটীরবাসিনী সীতা আতিথ্যত্রুটির ভয়ে আত্মপরিচয় দিয়া সন্ন্যাসীর সৎকারার্থ পাদ্য ও আসন প্রদান করিলেন। কিন্তু রাবণ এ সৎকারের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল না—একেবারেই স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। সীতা সহসা তাঁহার কোমল স্বর বজ্রকঠোর, চূর্ণকুন্তলস্পৃষ্ট গণ্ডদেশ উন্নমিত, কুসুমকোমল দেহলতাকে সতীত্বগর্ব্বে দৃঢ় করিয়া ঘৃণার স্বরে বলিলেন, "রে দুষ্ট রাক্ষস, তোর কেন এ বৃথা আশা। আমার স্বামী দেবকুলের বরণীয়—সাক্ষাৎ ধনুর্ব্বেদ—চরিত্রগর্ব্বে সু-উন্নত পর্ব্বতের মত বিরাট্—তুই

কোন্ সাহসে এরূপ পাপ কথা কহিতেছিস্। তোর এ অসম্ভব প্রয়াস দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি—তুই কি জানিস্ না, আমি সত্য-প্রতিজ্ঞ আদর্শচরিত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী। রে শৃগাল, তুই পুরুষসিংহ রামচন্দ্রের অমিত পরাক্রম কি অবগত নহিস্? হতভাগ্য ভণ্ড, তুই শৃগাল হইয়া সিংহরমণীকে অভিলাষ করিতেছিস্—চিরকৃষ্ণ তুচ্ছ সীসক হইয়া স্বর্ণকান্তিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিস্—ক্ষুদ্র গোষ্পদ হইয়া মধুস্রোতা মন্দাকিনীকে অঙ্কে স্থাপন কবিতে প্রয়াস পাইয়াছিস্। যদি প্রাণে বাসনা থাকে, তবে অবিলম্বে পাপবাসনা পবিত্যাগ করিয়া এখান হইতে দূর হ। তোর পাপকথায় এই স্বভাবসৌম্য বনভূমি, শান্তশীতল সন্ধ্যা কলুষিত হইযাছে। দেখ্ পাপিষ্ঠ, তোব পাপকথায় বৃক্ষপত্র নিষ্কম্প হইযা রহিয়াছে—সান্ধ্যসূর্য্য রক্তনেত্রে তোর সর্ব্বনাশের দিকে চাহিযা রহিযাছে। তুই এখান হইতে দূব হ। বৈজয়ন্তবাসিনী শচীদেবীর অবমাননা করিয়া যদিও তুই নিস্তার লাভ করিস্, কিন্তু আমার অপমান করিয়া মহাবীব রামচন্দ্রের রোষানল হইতে কখনই নিষ্কৃতি পাইবি না।"

দুষ্ট রাবণ বুঝিল না—সে কোন্ সর্ব্বনাশেব মোহন আশ্বাসে প্রতারিত হইতেছে—পাপবাসনা তাহাকে কোন্ কাল-সাগরেব দিকে আকর্ষণ করিতেছে! রাবণ আত্মবিস্মৃত হইয়া যেন বিদ্যুল্লতাকে গলদেশে ধারণ করিবার প্রয়াস পাইল—যেন কালভুজঙ্গীকে বক্ষে স্থাপন করিবার ইচ্ছা করিল। দেখিল না, নেত্র-মদ বিদ্যুল্লতাব অভ্যন্তবে প্রাণনাশিনী শক্তি,—বুঝিল না, কালভুজঙ্গীব সুতীব্র হলাহলে আত্ম-সহিত বংশ-নাশ!

রাবণ দেখিল সীতা সাধারণ প্রকৃতির রমণী নয়। কথায় কোন কাজ হইবে না; এই ভাবিয়া এক হস্তে সীতার দেববন্দ্য কুন্তলরাশি ও অপর হস্তদ্বারা কটিদেশ ধারণ করিয়া রথের উপর তুলিয়া আকাশে উত্থিত হইল। সীতার ক্রন্দনে যেন দিকপ্রান্ত মলিন হইয়া গেল,

পঞ্চবটীর শ্যামশোভা অপগত হইল, তরুরাজি যেন ম্লানবদনে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল—পল্লবাগ্রে নবকিশলয় ও পুষ্পকোরকগুলি যেন বিষাদের কালিমায় হতশ্রী হইয়া গেল।

সীতার আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া দণ্ডকারণ্যবাসী বৃদ্ধ জটায়ু তথায় উপনীত হইয়া পরবনিতাবিলাসী রাবণকে সম্বোধন করিয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "রে দুষ্ট পিশাচ, আমি তোর পরিচয় অবগত আছি। আজ আবার কাহার সুখের ঘর অন্ধকার করিয়াছিস্। তোর এ অন্যায় আমার অসহ্য। নির্য্যাতিত সতীর বিলাপধ্বনি আমার হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে জাগরিত করিয়াছে। পাপিষ্ঠ, আজ আমার হস্তে তোর নিস্তার নাই।"

রাবণ শুনিয়া ভ্রূক্ষেপও করিল না। বৃদ্ধ জটায়ু দুর্দ্ধর্ষ রাবণের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিল। কিন্তু কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া অর্দ্ধ-চেতনা সতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা জানকি, আমি তোমায় রক্ষা করিতে পারিলাম না। যিনি তোমার লতিকাকোমল দেহে বিদ্যুল্লতার শক্তি দিয়াছেন—যিনি তোমার বীণাগঞ্জিত স্বরে বজ্র-নির্ঘোষ দিয়াছেন—যিনি তোমার রমণীস্বভাব-সুলভ লজ্জার মধ্যে বিজয়শ্রী প্রদান করিয়াছেন, সেই বিধাতা তোমার মঙ্গল করুন। তাঁহার স্নেহাশীষ অক্ষয় কবচের মত তোমাকে রক্ষা করুক। আমার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত-প্রায়, ইহার মধ্যে তোমার ভুবনবিজয়ী স্বামী রামচন্দ্র যদি তোমার অন্বেষণার্থ এস্থানে আগমন করেন তাহা হইলে আমি তাঁহাকে সকল কথা বলিব। যাও সতি, সতীত্বই আজ হইতে তোমার রক্ষামন্ত্র হউক।"

সীতা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কিন্তু আত্মরক্ষার কোনও উপায় না দেখিয়া কর্ণিকার বন লক্ষ্য করতঃ বলিলেন, "হে কর্ণিকার, তুমি শীঘ্র রামচন্দ্রকে বল যে, রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়াছে।" গোদাবরী নদীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সখি, তুমি

আমার এই বিপদের বার্ত্তা আর্য্য রামচন্দ্রকে নিবেদন কর।” পরিশেষে দিগঙ্গনাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “অয়ি দিগঙ্গনাগণ, তোমরা জগতের প্রতিহারিরূপে সর্ব্বদা সজাগ রহিয়াছ। দেখ দুষ্ট রাবণ আমাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। তোমরা আর্য্য রামচন্দ্রকে এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত কর।” কিন্তু এত ক্রন্দনেও কোন ফল হইল না। সতীর ক্রন্দন যেন জগতের বিশাল কুক্ষিতে কোথায় বিলীন হইয়া গেল!

সীতাদেবী আর কোনও উপায় না দেখিয়া ভাবিলেন, আর কেন এ বেশ-ভূষা! এ বেশ-ভূষা ত আর্য্যপুত্রের আনন্দের জন্য ছিল। যখন তিনি সুদূরে তখন আমার এই অলঙ্কারাদি তাঁহার জন্য উৎসৃষ্ট হউক। এই ভাবিয়া পতী-সোহাগিনী সীতা ভূষণাদি একে একে উন্মোচন করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। শোকোন্মাদিনী সীতার অযত্নবিক্ষিপ্ত বস্ত্রাঞ্চল যেন রথের বহির্ভাগে বায়ুকম্পিত হইয়া জগৎকে বলিতেছিল, দুষ্ট রাবণ সতীশ্রেষ্ঠা সীতাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, এই কথা রামচন্দ্রকে বলিয়া দাও।

রাবণ সীতাকে লইয়া লঙ্কায় উপনীত হইল। ঐশ্বর্য্যগর্ব্বস্ফুরিতা লঙ্কা যেন সতীর পদভরে বিচলিত হইয়া উঠিল। সেই স্বর্ণময়ী স্বর্ণময়ী লঙ্কার ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া রাবণ সীতার প্রণয় প্রার্থনা করিল। সীতা ক্রোধবিকম্পিত স্বরে বলিলেন, “হতভাগা কাপুরুষ, তুই এ কি কথা বলিতেছিস্? ঘৃণিত কুক্কুর হইয়া যজ্ঞীয় ঘৃত-ধারা লেহন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্? পাপিষ্ঠ, তোর পাপবাসনায় চিরপবিত্র মহাকাল কলুষিত হইয়াছে। তোর আত্মসহিত বংশনাশ আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি।”

এই বলিয়া সীতা ঘৃণার সহিত রাবণের দিকে বিমুখ হইয়া বসিলেন। সংহার-লীলা দেখাইবার জন্য সেই তেজোময়ী সতীমূর্ত্তি হইতে যেন ক্রোধাগ্নিশিখা বহির্গত হইতে লাগিল। উদ্ধত রাবণ

সীতাদেবীকে পাপপথে প্ররোচিত করিবার জন্য রাক্ষসীগণকে নিযুক্ত করিয়া অশোককাননে পাঠাইয়া দিল।

৫

সৌন্দর্য্য-নিকেতন অশোককাননে সীতাদেবীর মুখকমল অশ্রু-কলুষিত। প্রতিহারী রাক্ষসী সকল প্রেত-ভূমিবিলাসিনী পিশাচীর মত বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সীতাদেবীকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বোধ হইতেছিল যেন অশোককাননে সীতাদেবী 'বিষলতাবেষ্টিত মহৌষধি'র মত শোভা পাইতেছেন। দুষ্টা রাক্ষসীদের পাপকথায় সীতাদেবীর নেত্রদ্বয় বিদ্যুদগর্ভ জলদের মত সলিল বর্ষণ করিতে লাগিল। নিষ্ঠুরা রাক্ষসীগণ সেই অনশনকৃশা সতীকে কখন প্রলোভন দ্বারা, কখনও বা ভয়প্রদর্শন করিয়া প্রভুর ইষ্টসিদ্ধির প্রয়াস পাইতেছিল। এমন সময়ে পাপবুদ্ধি মদান্ধ রাবণ তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, "অয়ি মদিরেক্ষণে, তুমি মধুদৃষ্টিদ্বারা এই প্রণয়-কাতর জীবনে অমৃত-বারি সেচন কর। এখনও কেন সুন্দরি, ধূলি-ক্লিন্ন চীর বাসে ঐ বরাঙ্গ আবৃত রাখিয়াছ? কেন ঐ ইন্দীবরগঞ্জিত নয়ন অশ্রুজলে কলুষিত করিতেছ? তোমার বিলাসের জন্য লঙ্কার রাজভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। ত্রিলোক-বিজয়ী দশানন তোমার পদপ্রান্তে রাজমুকুট স্থাপন করিতেছে।"

সীতা রাবণরক্ষিত রাজমুকুটে পদাঘাত করিয়া বলিলেন, "পাপিষ্ঠ, যদি জীবনের বাসনা থাকে তবে এখনি আমার সম্মুখ হইতে দূর হ! স্বর্ণচূড় লঙ্কার রাজশ্রী তোর মত কাপুরুষকে আশ্রয় করিয়া এখনও কেন ধুলায় বিলীন হইতেছে না? বসুন্ধরা এখনও কেন তোর পাপ-ভার বহন করিতেছেন? যদি ধর্ম্ম থাকেন, তবে তোর এই অসংযত জিহ্বা এইরূপ পাপকথার জন্য নিশ্চয়ই শৃগালকুক্কুরের উদরে প্রবেশ

করিবে। পাপিষ্ঠ, আমার অমিত-তেজা স্বামীর ক্রোধ-বহ্নিতে তোর এই পাপার্জ্জনপুষ্ট লঙ্কার ঐশ্বর্য্যরাশি নিশ্চয়ই ভস্মীভূত হইবে। হতভাগা, যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, তবে ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে এখান হইতে প্রস্থান কর্।"

স্বভাবকোমলা সীতাদেবীর নেত্রদ্বয় হইতে ক্রোধাগ্নিশিখা বাহির হইতে লাগিল, তাঁহার কণ্ঠ হইতে বজ্র কঠোর শব্দ নিঃসৃত হইতে লাগিল। সেই লাবণ্যলতিকা যেন আজ সমরোন্মত্তা চণ্ডীর বেশ ধারণ কবিলেন। পাপাত্মা রাবণ যেন প্রথম এই রুদ্রমূর্ত্তিব নিকট শঙ্কিত হইয়া অন্তঃপুবে গমন করিল।

রাবণ চলিয়া গেলে, সীতা বিদ্যুদ্গর্ভ মেঘমালার মত কম্পিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাব গণ্ডপ্লাবী প্রতপ্ত অশ্রুপ্রবাহ যেন রাবণের ঐশ্বর্যময়ী লঙ্কাকে ভাসাইয়া লইযা গিযা কালসমুদ্রে নিক্ষেপ করিবার প্রয়াস পাইল। সীতাদেবী রাক্ষস-বংশের সর্ব্বনাশেব মহামন্ত্র জপিতে জপিতে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

একদিন ভাবিতে লাগিলেন, আর্য্যপুত্র কি এতদ্দিন আমার কোনও সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই! যখন পাপিষ্ঠ আমায় অপহরণ করে তখন আমার সেই আর্ত্তনাদ কি কোনও ব্যক্তির কর্ণগোচব হয় নাই! আমার বিক্ষিপ্ত অলঙ্কার নিদর্শনগুলি কি আর্য্য রাম-চন্দ্রের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় নাই। বিপন্নশরণ বৃদ্ধ জটায়ুর প্রাণপাখী আর্য্যপুত্রের সহিত সাক্ষাৎকাবের পূর্ব্বেই কি সেই দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন কবিয়াছে! এইরূপ চিন্তাব স্রোতে অস্থির হইয়া তিনি কালযাপন করিতে লাগিলেন।

৬

রামচন্দ্র স্বর্ণমৃগ বধ করিয়া রাক্ষসের মুখ হইতে বিপরীত শব্দ শুনিয়া ত্বরিত পদে আশ্রমাভিমুখে আসিতেছেন। সহসা পথিমধ্যে

লক্ষ্মণকে দেখিয়া বলিলেন, "ভাই লক্ষ্মণ, রাক্ষসের কুহকে আমরা প্রতারিত হইয়াছি। আজ স্বর্ণমৃগের প্রহেলিকায় রঘুবংশের গৌরবপদ্মিনী সীতা রাক্ষসের হস্তগত হইয়াছে। ভাই লক্ষ্মণ, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। নিশ্চয়ই দুষ্ট রাক্ষস মায়া পাতিয়া সীতাকে অপহরণ করিয়াছে।"—এইরূপ বলিতে বলিতে উভয় ভ্রাতায় বায়ু-বেগে আসিয়া দেখিলেন, আঁধার ঘরের বর্ত্তিকা সীতা কুটীরে নাই। সীতার অভাবে সেই কুটীর যেন ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন বোধ হইতে লাগিল। রামচন্দ্র, সীতা—কোথায় সীতা, বলিতে বলিতে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ অনেক কষ্টে রামচন্দ্রের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, "আর্য্য, শোকে বিপদকে আরও ডাকিয়া আনে। আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির শোকার্ত্ত হওয়া কখনই উচিত নহে, কর্ত্তব্য স্থির করুন। বিপদে ধৈর্য্যই অবলম্বনীয়। চলুন আমরা আর্য্যার অনুসন্ধান করি।" তখন—

"প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল।
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল॥
গিরি-গুহা দেখেন মুনির তপোবন।
নানা স্থানে সীতার করেন অন্বেষণ॥
কাঁদিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি।
রামের ক্রন্দনে কাঁদে বন্য পশু পাখী॥"

এইরূপে সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহারা ছিন্নপক্ষ রুধিরাক্ত-দেহ এক মুমূর্ষুর সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। তাহার জীবন নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে সে রামচন্দ্রকে দেখিয়া অভিবাদন করতঃ ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "বৎস, আসিয়াছ তুমি, আমি তোমার পিতৃবন্ধু জটায়ু। রঘুকুল-কমলিনী সীতা লঙ্কারাজ রাবণকর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছেন। দুষ্টের হস্ত হইতে

নাকে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়া আমার এই অবস্থা হইয়াছে। আমার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিতপ্রায়। আমার চক্ষু এখন দৃষ্টিহীন হইয়া আসিয়াছে—এমন সময়ে তোমার পবিত্রমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না।" জটায়ুর মৃত্যুআলিঙ্গিত নিষ্প্রভ চক্ষু দুটি এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই চিরতরে মুদ্রিত হইল। জটায়ুর শোকে রামলক্ষ্মণের পিতৃশোক নবীভূত হইয়া উঠিল।

লক্ষ্মণের তৎপরতায় রামচন্দ্র জটায়ুর ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাধান করিয়া ক্রৌঞ্চারণ্যে * উপস্থিত হইলেন। সেই স্থান সুভীষণ কবন্ধ রাক্ষসের বাসভূমি। রামচন্দ্রের নিশিত সায়কে কবন্ধ নিহত হইল। কবন্ধ ঋষ্যমূকবাসী সুগ্রীবের সহায়তায় সীতা-উদ্ধারের পরামর্শ দিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

ক্রমে তাঁহারা পম্পাতীরে † উপনীত হইলেন। রামচন্দ্র পম্পার মোহন দৃশ্যে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। সীতার বিরহবেদনা তাঁহার হৃদয়কে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। এমন সময় এক দিন সুগ্রীব-প্রেরিত হনুমান আসিয়া রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিল। হনুমানের সেই সৌজন্যপূর্ণ অভিবাদনে লক্ষ্মণের হৃদয় যেন সহানুভূতিপ্রাপ্তির আশায় বলশালী হইয়া উঠিল। লক্ষ্মণ হনুমানের প্রতি সম্মান দেখাইয়া বলিলেন, "হে বীর, তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক তোমাদের রাজাকে বল, 'বিপন্ন আমরা কিষ্কিন্ধ্যাপতির সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।'"

সুগ্রীবের সহিত রামচন্দ্রের পরিচয় হইল। সুগ্রীব ঋষ্যমূক পর্ব্বতে প্রাপ্ত ভূষণাদি দেখাইলে, রামচন্দ্র সেই আভরণাদি বক্ষে স্থাপন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রোদনে পত্নীবিরহী সুগ্রীবের বিরহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বালীবধপ্রতিজ্ঞ রাম-

* জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক অরণ্য।

† ঋষ্যমূক পর্ব্বতস্থ চন্দ্র-দুর্গের পাষাণবদ্ধ [illegible] সরোবর-নিঃসৃতা নদী পম্পা নামে অভিহিত। ইহা উড়িষ্যার অন্তর্গত তুঙ্গভদ্রার সহিত মিলিত হইয়াছে।

চন্দ্রের সান্ত্বনাবাক্যে সুগ্রীবের পত্নীশোকাতুর প্রাণ বৈরনির্য্যাতনের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। রামচন্দ্রের শরে বালী নিহত হইল। সুগ্রীব বন্ধুর কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়া সমস্ত বানরসেনাকে সীতার অন্বেষণের জন্য চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিল। এই সময়ে বিভীষণ আসিয়া রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন।

হনুমান একদল বানর-সেনা লইয়া দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে উপনীত হইয়া অবগত হইল, এখান হইতে বার যোজন দূরে লঙ্কা দ্বীপ। হনুমান একবার ভাবিল, এই বার যোজন সমুদ্র অতিক্রম করিবার উপায় কি! অনেক ভাবিয়া হনুমান এক লম্ফে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় উপনীত হইল। রজনীযোগে সীতার অন্বেষণের সুবিধা হইবে ভাবিয়া সে রজনী আগমনের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। ক্রমে রাত্রি হইলে সুযোগ বুঝিয়া হনুমান নানা স্থানে সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু কোথাও সীতার অনুসন্ধান করিতে পারিল না। কত প্রমোদশালায় বরবর্ণিনী সমূহকে দর্শন করিল, কিন্তু কাহাকেও সেই মহিমময়ী রমণীমূর্ত্তির সদৃশ বলিয়া হনুমান কল্পনা করিতে পারিল না।

অবশেষে হনুমান নীরব নিশীথে অশোক কাননে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বৃক্ষের শাখাবলম্বনে এক বিশীর্ণদেহা রমণী বিষণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সমস্ত-দেহ হইতে তেজোরাশি বিকীর্ণ হইয়া সেই ঘোর তমোময় বনভূমির সান্দ্র তমোরাশি বিদূরিত হইতেছিল। হনুমান এই গৌরবময়ী রমণীমূর্ত্তিকে দেখিয়া প্রাণের আবেগে 'মা' বলিয়া তৃপ্তিলাভ করিল এবং বিরহকৃশা মাতৃমূর্ত্তিকে শুনাইয়া 'রামচন্দ্রের জয়' শব্দ উচ্চারণ করিল।

সীতা সহসা এই আনন্দজনকারী রামনাম শুনিয়া চকিতা হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন আমি কি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি! অথবা ইহা কি আমার চিরজপ্য রামনামের স্বতঃপ্রতিশব্দ!

এমন সময়ে আবার সেই অমৃতমধুর রামনাম শুনিলেন। আজ যেন বিধাতা দয়া করিয়া সেই নির্ব্বান্ধব বনভূমির মধ্যে শান্ত-শীতল ভোগবতীধারা প্রবাহিত করিলেন। সীতা সজলনয়নে বৃক্ষশাখার দিকে নেত্রপাত করিলেন—যেন উষালোকপুলকিতা নিশারাণী হিমাশ্রুপূর্ণ নয়নে শুক্রতারার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। দেখিলেন, সেই বৃক্ষের এক শাখায় একটি ক্ষুদ্র বানর, তাহারই মুখ হইতে মধুর রামনাম উচ্চারিত হইতেছে। বিরহ-কৃশা সীতাদেবী ভীষণ প্রেতপুরীতে যেন শরীরী জীবের সাক্ষাৎ পাইলেন।

হনুমান বৃক্ষশাখা হইতে অবরোহণ করিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনি কি রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী রঘুকুলকমলিনী জানকী? আপনি কৃপাপূর্ব্বক নিঃশঙ্কহৃদয়ে আপনার পরিচয় প্রদান করুন। আমি সীতাদেবীর অন্বেষণার্থ সমুদ্র পার হইয়া এস্থানে আগমন করিয়াছি। মা, আমি আপনার পুত্র। কৃপা করিয়া পুত্রের প্রার্থনা পূর্ণ করুন।"

সীতা শুনিয়া প্রথমতঃ কোন কথা কহিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, একি স্বপ্ন! এই ক্ষুদ্র বানর কিরূপে সেই ভীষণ সমুদ্র পার হইয়া এখানে উপস্থিত হইবে! ইহাও কি সম্ভব! ইহা ত কোন মায়াবীর ছলনা নহে! পরক্ষণেই মাতৃ-সম্বোধন-পুলকিত প্রাণে আবার একটি কল্পনা উদিত হইল—যদি ইহা মায়াবীরই ছলনা তবে ইহার মুখে 'মা' নাম কেন? ইহা ভাবিয়া সীতা সন্দেহ-কাতর প্রাণকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "বৎস, কে তুমি? তুমি কিরূপে এই দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র পার হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছ?" হনুমান সংক্ষেপে সমস্ত পরিচয় দিয়া সন্দেহ-নিরাসের জন্য তাঁহাকে রামচন্দ্রের প্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিল।

বিরহতপ্তা সীতা আর্য্য রামচন্দ্রের অঙ্গুরীয়ক প্রাপ্ত হইয়া পুলকিতা হইয়া উঠিলেন। যেন নিদাঘপীড়িতা ধরণী বর্ষাসলিল-

পাতে হাস্যময়ী হইয়া উঠিল। সেই অঙ্গুরীয়ক তাঁহার দুর্ভাগা-রজনীতে যেন ক্ষীণ চন্দ্রলেখার মত মনে হইতে লাগিল এবং যেন তাহা অতীতের সমস্ত সুখস্মৃতি জাগাইয়া দিল। সেই সুখস্মৃতির আকুল উত্তেজনায় তাঁহার সেই নীলোৎপলনিন্দিত অক্ষিযুগল বাষ্পসমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সীতা বলিলেন, "বৎস, আর্য্যপুত্র কেমন আছেন?" হনুমান বলিল, "মাতঃ, সেই পর্ব্বতের মত বিরাটগম্ভীর রামচন্দ্র তোমার বিরহে উদ্‌ভ্রান্ত-প্রায়। তিনি শোকোন্মত্ত হইয়া জাগতিক প্রিয় পদার্থমাত্রকেই আপনার প্রিয়-প্রসঙ্গ-পুলকিত বলিয়া মনে করেন। বনমল্লিকার মধুগন্ধ, মলয়ানিলের আকুলস্পর্শন, প্রাতঃসন্ধ্যার সুশীতল বায়ু-হিল্লোল, প্রাকৃতিক শোভাসম্ভার তাঁহার হৃদয়কে দিবাযামিনী নিপীড়িত করিতেছে। মা, তোমার বিরহ-যন্ত্রণা তাঁহাকে আহার গ্রহণে বিরত করিয়াছে।"

সীতা হনুমানের মুখ হইতে সমস্ত অবগত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অতীত জীবনের সমস্ত কথা মনে জাগিয়া উঠিল—হনুমান বলিল, "মা, আপনি অনুমতি করিলে আমি আপনাকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া রামচন্দ্রের নিকট উপনীত হইতে পারি।" সীতা রাক্ষসভীতি ও স্বেচ্ছায় অন্য পুরুষকে স্পর্শ করা সতীধর্ম্মের অন্তরায় অনুভব করিয়া তাহাতে সম্মতি দান করিলেন না।

তখন হনুমান বলিল, "মা, আমি এখন আর্য্য রামচন্দ্রের নিকট গমন করি। আপনার সংবাদ প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে তিনি যেন এক এক সুদীর্ঘ যুগ মনে করিতেছেন, আর আমি বিলম্ব করিব না।" সীতা বলিলেন, "আচ্ছা, যাও বৎস, তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হউক, তুমি চিরজীবী হও।"

হনুমান সীতাদেবীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া লঙ্কাপুরীর শোভা ও রাক্ষসজাতির বিক্রম দেখিতে ইচ্ছা করিয়া রাবণের

প্রিয় উপবনে প্রবেশ করিল। বানরের উৎপাতে ফলশোভী বৃক্ষসকল ভগ্নশাখ হইয়া বিগতশ্রী হইল। কাননরক্ষিগণ তৎক্ষণাৎ রাবণ সমীপে এই সংবাদ নিবেদিত করিল। একটা ক্ষুদ্রকায় বানরকর্ত্তৃক উপবনের সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে স্মরণ করিয়া রাবণ আজ্ঞা দিলেন, 'যে প্রকারে পার, বানরটাকে ধর।'

রাক্ষসগণ অনেক চেষ্টায় হনুমানকে ধরিয়া রাবণের নিকট উপস্থাপিত করিল। রাবণ ক্রোধদৃষ্টিতে বানরের দিকে চাহিয়া বলিল, "দুষ্টের লাঙ্গুলে কতকগুলা তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া ছাড়িয়া দাও।" রাক্ষসেরা তাহাই করিলে হনুমান 'জয় রাম' শব্দে লঙ্কার গৃহে গৃহে লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল। লঙ্কার স্বর্ণচূড় প্রাসাদ সকল জ্বলিয়া উঠিল। রাক্ষসেরা তাহাদের অপরিণামদর্শিতার ফল দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। সীতার আশীর্ব্বাদে হনুমানের নিকট অগ্নিতেজ তুষারশীতল অনুমিত হইল।

এদিকে অশোককাননে মূর্ত্তিমতী করুণা-রূপিণী সীতাদেবী রাক্ষসগণের ভীতিমিশ্রিত কোলাহলে ও দারুণ অগ্নিশিখা দর্শনে ভীত হইয়া পড়িলেন। মনে করিলেন এ কি হইল! অগ্নিদেবের এই প্রচণ্ড আস্ফালনে কত সুখের সংসার দগ্ধীভূত হইতেছে মনে করিয়া সীতা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সীতার দুর্ভাগ্য-রজনীর একমাত্র তারকা বিভীষণপত্নী সরমা এমন সময়ে তথায় উপনীত হইলেন। সীতা দূর লঙ্কার দিকে নেত্রপাত করিয়া বলিলেন, "সখি, কেন এত কোলাহল? কেন অগ্নির এই লেলিহান জিহ্বা বিস্তার?" সরমা সীতাকে সমস্ত কথা বিবৃত করিলেন। সীতা শুনিয়া হনুমানের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সরমা বলিলেন, "সখি, তাহার জন্য চিন্তা

করিও না। সে-ই এই অনর্থ ঘটাইয়া বিপুল বিক্রমে সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়াছে।" সীতা শুনিয়া আশ্বস্তা হইলেন।

৭

সুগ্রীবপ্রমুখ বানরসেনা সমভিব্যাহারে রামচন্দ্র দুঃখিতভাবে কালযাপন করিতেছেন, এমন সময়ে হনুমান 'জয় রাম' শব্দ করিয়া হর্ষপরিপ্লুতাধরে রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস হনুমান, সীতাদেবীর কোন সংবাদ পাইয়াছ কি?" হনুমান সীতাপ্রদত্ত অভিজ্ঞান-মণি রামচন্দ্রের হস্তে প্রদান করিল। রামচন্দ্র সেই অভিজ্ঞানমণি প্রাপ্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "বল, বল হনুমান, তুমি আমার সীতাকে কেমন অবস্থায় দেখিলে; তুমি আমার কথা বিদিত করিলে সেই সাধ্বী কি বলিলেন?"

হনুমান বলিল, "দেব, আমি লঙ্কার অনেক স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কোথাও রঘুকুল-কমলিনী সীতাদেবীর দর্শন পাই নাই। অবশেষে হতাশপ্রাণে চারিদিক অন্বেষণ করিতে করিতে সহসা অশোক-কাননের শ্যামশোভা আমার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। দেখিবামাত্র আমার হৃদয়ে স্বতঃই এই বাণী উদিত হইল, এইখানেই যেন আমার মা জলদাবৃত চন্দ্রলেখার মত অবস্থান করিতেছেন। আমার প্রাণ সহসা উৎসাহিত হইল। অশোক-কাননে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, এক উপবাসক্ষীণা দুঃখপীড়িতা রমণীমূর্ত্তি এক বৃক্ষমূলে দণ্ডায়মানা আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া যেন আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হইল। আমার সাধনা ফলবতী হইবার যেন এক আশা আমার হৃদয়ে বাড়িয়া উঠিল। সেই রমণী ভূষণবিহীনা। তাঁহার চতুর্দ্দিকে কত বিকটাকৃতি রাক্ষসী পরিবেষ্টন করিয়া

রহিয়াছে। দেখিলাম রামচন্দ্র, মা আমার এইরূপ ঘোর শত্রুবেষ্টিত হইয়াও ধৈর্য্যহীনা হন নাই। পতিপ্রেমের মধুর আশ্বাসই যেন সেই সাধ্বীকে মহিমামণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। রাক্ষসীগণের সুতীব্র শাসনে তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, তিনি কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন। তাঁহার সেই গণ্ডবাহিত অশ্রুধারায় যেন স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছে। আমি বৃক্ষান্তরালে এই পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়াই বুঝিলাম, ইনিই আমার মা। লঙ্কায় এত সুন্দরী রমণী দেখিলাম, কিন্তু কাহাকেও 'মা' বলিয়া ডাকিবার বাসনা উদিত হয় নাই। ইঁহাকে দেখিয়া আমার মাতৃভক্তি জাগিয়া উঠিল। প্রাণ ভরিয়া 'মা' বলিয়া ডাকিলাম। দেখিলাম, বিধাতা সদয় হইলেন। পরিবেষ্টিকা পানোন্মত্তা রাক্ষসীবৃন্দ সহসা কোন্ কুহকে যেন সেস্থান ত্যাগ করিল। সেই অবকাশে আমি বৃক্ষশাখা হইতে মৃদু গুঞ্জনে তোমার জয় কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম। সেই উদ্‌ভ্রান্তনয়না সহসা তোমার গুণগাথা আকর্ণন করতঃ কুঞ্চিতকুন্তলাবৃত মুখখানি উন্নমিত করিয়া বৃক্ষশাখার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। আমি অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলাম। স্বভাবসরলা মা আমার রাক্ষসের কুহকে প্রতারিত হইয়া প্রত্যেক বিষয়কে সন্দেহের চক্ষে দেখেন। তাই, প্রথমতঃ আমাকে রাক্ষসী মায়া বুঝিয়া কাতর হইতেছিলেন। আমি ইহা বুঝিয়া আপনার অভিজ্ঞানমণি তাঁহাকে দিলাম। তিনি তাহা প্রাপ্ত হইয়া যেন হারানিধি বক্ষে পাইলেন। ভাবিলেন, যেন তাঁহার দুঃখ-নিশা প্রভাতা হইয়াছে। এক অস্ফুট আনন্দ-রেখা যেন অশোক-কাননের নিবিড় অন্ধকারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গেল। তাঁহার দুর্ভাগ্য-জলদাবৃত মুখচন্দ্র যেন হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি অশ্রুগদগদ কণ্ঠে আপনার ও লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আপনাদের কথা

বিরচিত করিলে সেই ম্লানবদনা যেন অপার দুর্ভাগ্য-সমুদ্রে কূল পাইলেন।”

এই কথা বলিতে বলিতে হনুমান রামচন্দ্রের উৎকণ্ঠা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র হনুমানের অশ্রুপ্রবাহ দেখিয়া আত্মসংবরণ করতঃ বলিলেন, “বৎস হনুমান, আজ সীতার বার্ত্তা জানাইয়া তুমি আমার মৃতদেহে জীবন দান করিয়াছ। তোমার এই অমানুষিক কার্য্যের পুরস্কার দিই এমন আমার কিছুই নাই। এস বৎস, তোমাকে একবার এই বিরহতপ্ত বক্ষের আলিঙ্গন প্রদান করি।” হনুমান সেই দেবদুর্ল্লভ বরবপুর আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়া নিজকে ধন্য বোধ করিল।

৮

রামচন্দ্র হনুমানের মুখ হইতে সীতার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় বানরসেনা সমভিব্যাহারে লঙ্কায় উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করিলেন এবং তদুপযোগী আয়োজন করিতে লাগিলেন। ঈপ্সিত প্রাপ্তির জন্য মুহূর্ত্ত বিলম্ব তাঁহার নিকট তখন এক সুদীর্ঘ যুগ বলিয়া অনুমিত হইতেছিল। যাহা হউক এইরূপ ব্যগ্রহৃদয়ে তিনি সমুদ্রের তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই অপার সমুদ্র তিনি কিরূপে অতিক্রম করিবেন, ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল। রামচন্দ্র সমুদ্রের প্রসাদ লাভের জন্য তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার তপস্যার উদ্দেশ্য ছিল—হয়, সসৈন্যে সমুদ্র উল্লঙ্ঘন—নয়, প্রাণ বিসর্জ্জন। রামচন্দ্রের তপস্যায় সমুদ্র প্রসন্ন হইলেন না। তখন তিনি একান্ত অধীর হইয়া শরাসনে বাণ যোজনা করিলেন। সমুদ্র সঙ্কট গণিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে সেতুবন্ধনের উপায় বলিয়া দিয়া গেলেন।

বানরসেনার আনন্দের সীমা নাই। তাহারা বৃক্ষপ্রস্তর উৎপাটিত করিয়া ভীষণ সমুদ্রের বক্ষে নিপাতিত করিতে লাগিল। বানরসেনার তৎপরতায়, অধিকন্তু নীলের কার্য্যনৈপুণ্যে অবিলম্বে সেই সেতুবন্ধন সম্পন্ন হইলে রামচন্দ্র সহর্ষে বানরসেনা সমভিব্যাহারে লঙ্কায় উপনীত হইলেন। বীরপদভরে ত্রিকূটসংস্থিতা লঙ্কা যেন কাঁপিয়া উঠিল।

রাবণ দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধন ও বানরসেনাসহ রামচন্দ্রের লঙ্কাপ্রবেশ শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল এবং অবিলম্বেই যুদ্ধ আয়োজনের আদেশ প্রদান করিল। সতীর দীর্ঘনিশ্বাসসঞ্জাত অগ্নি যেন শিখা বিস্তার করিয়া লঙ্কাপুরীকে গ্রাস করিবার জন্য সচেষ্ট হইল।

ন্যায়পথাশ্রয়ী রামচন্দ্র রাক্ষসী ছলনাকে ধর্ম্মের দ্বারা সংহত করিয়া রাক্ষস-কুলের ভীতি উৎপাদন করিতে লাগিলেন। ভীষণ বিপৎপতিত রাবণের মতি স্থির ছিল না, তাই সে ছলবুদ্ধির আশ্রয় লইল। বিভীষণ ও তদীয় সাধ্বী পত্নী সরমার দ্বারা রাক্ষসবিস্তারিত ছলনার রহস্যোদ্ভেদ হইতে লাগিল। বিধাতা যেন সদয় হইয়া গুপ্ত সংবাদ দান ও রাক্ষসী-ছলনা সমাধানের জন্য উক্ত ধর্ম্মপ্রাণ দম্পতীকে বিপন্ন রামচন্দ্রের পক্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একপক্ষে নির্জিত দৈবপ্রভাব অপর পক্ষে রাক্ষসী ক্ষমতা। দুই প্রতিপক্ষের বলপরীক্ষায় সমরভূমি সুভীষণ হইয়া উঠিল। এই সংগ্রামে অন্য বাসনা নাই। একপক্ষের হৃদয়-শোণিত দর্শনই অন্যপক্ষের একমাত্র বাসনা। আজি দুই প্রবল শক্তি সাক্ষাৎ মহাকালরূপে সমরভূমিতে দণ্ডায়মান। সীতাবিরহে রামচন্দ্র নিষ্প্রভ—অপর দিকে বিপুল বলদর্পী লঙ্কারাজ রাবণও অগণ্য আত্মীয়বিনাশে শোকজর্জ্জরিত। এই ভীষণ যুদ্ধে, পৃথিবী বারম্বার কম্পিতা হইতে লাগিলেন। শরাসনজ্যা-নির্ঘোষে

রণভূমি করাল ভাব ধারণ করিল। গগনমার্গগামী বাণ সকলের উজ্জ্বল দীপ্তিতে সেই রণাঙ্গন কাল হাসি হাসিয়া যেন ভীতি উৎপাদন করিতেছিল। সহসা রামচন্দ্র দুষ্ট রাবণের বধার্থ স্বীয় বিশ্বনাশী ধনুকে ব্রহ্মাস্ত্র সংযোগ করিলেন।

রাবণ দেখিল মৃত্যু সন্নিকট। অস্ত্রমুখে মৃত্যুদেবতা যেন মহিষবাহনে উপস্থিত হইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বিশ্বপ্রকৃতি যেন তাহার চরণতল হইতে সরিয়া গেল। অগণ্য স্বপক্ষ-বিপক্ষীয় সৈন্য-সমাকুল রণাঙ্গন যেন তাহার পক্ষে সুভীষণ প্রেত-দেশের মত বোধ হইতে লাগিল। অস্ত্রের ঝনৎকার, বিক্ষিপ্ত বাণ সকলের ঔজ্জ্বল্য যেন যমদূতের ভৈরব হুঙ্কার ও বিকট হাসির মত বোধ হইতে লাগিল। রামচন্দ্র ব্রহ্মাস্ত্র প্রহারে দুরাত্মার প্রাণ বধ করিলেন।

যুদ্ধাবসানে রামচন্দ্র নিহত রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য বিভীষণকে আদেশ করিলেন। রাশি রাশি চন্দন-কাষ্ঠ আহৃত হইল। বিভীষণ ত্রিভুবনবিজয়ী রাবণের বিশাল দেহ ঘৃতমধুনিষিক্ত ও বহুমূল্য কৌষেয় বস্ত্রে সমাচ্ছাদিত করিয়া চিতায় আরোপিত করিলেন এবং অবিলম্বে মৃত লঙ্কাধিপের আত্মার মঙ্গল কামনা করিয়া রামচন্দ্রের অনুমতি লইয়া চিতায় অগ্নি প্রয়োগ করিলেন। চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মন্দাকিনী-স্রোতসন্নিভ ঘৃত-ধারায় চিতাগ্নি ক্রমশঃ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ধূপ, ধুনা ও অগুরুর সুরভিগন্ধ সংমিশ্রিত হইয়া রাবণের আত্মা যেন ধূমরাশির উপর দিয়া চির আনন্দময় স্বর্গলোকে গমন করিল। *

অবিলম্বে রামচন্দ্র শৃঙ্খলাহীন শোকার্ত্ত লঙ্কাপ্রজার শৃঙ্খলা ও

* Spiritualiast গণের মতে পার্থিব মায়াবদ্ধ প্রাণিগণের মৃত্যুর পরেও তাহাদের আত্মা সেই মৃতদেহের নিকটেই অবস্থান করে। সৎকার দ্বারা সেই দেহ বিলুপ্ত হইলে সেই আত্মা স্থানান্তরে যায়।

শান্তিবিধানের জন্য বিভীষণকে লঙ্কার রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। শত অনাথার কাতর ক্রন্দন, পুত্রহারা জননীর আকুল বিলাপ, পত্নীবিরহীর প্রাণকে আকুল করিয়া দিল। রামচন্দ্রের স্মৃতিপথে সীতার মোহনমূর্ত্তি নবীন ভাবে দেখা দিল। রামচন্দ্রের আদেশে হনুমান অশোক কাননে গিয়া জানকীকে এই সংবাদ প্রদান করিল।

৯

সীতা এতদিন যাহার মৃত্যু কামনা কবিতেছিলেন আজ তাহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। তাহার চক্ষুর্দ্বয় আনন্দনীরে শিশিবসম্পৃক্ত কমলদলের মত শোভমান হইয়া উঠিল। অনশনকৃশ শোকপলিত দেহলতা আজ যেন কোন্ অনুপম স্বর্ণরাগে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। সীতা বলিলেন, "বৎস হনুমান্, আমি কি ভাষায় আজ হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ করিব বুঝিতে পাবিতেছি না। আমার এমন পার্থিব ধনরত্ন কিছু নাই, যাহা দিয়া আমি আমার মনের সন্তোষ প্রকাশ কবি।"

সহসা হনুমান্ পবিবেষ্টিকা চেড়ীদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল দেখিয়া করুণারূপিণী সীতাদেবী বলিয়া উঠিলেন, "বৎস হনুমান্, ইহাদের দোষ কি? ইহারা প্রভুর আদেশেই আমাব প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে, সুতরাং তুমি ইহাদের প্রতি অত্যাচার করিতে বিরত হও।"

হনুমান্ সীতাদেবীর এইরূপ মহত্ত্ব দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল। ভাবিল, ইহা সামান্যা রমণীর উক্তি নহে। পার্থিব দুর্ব্বিপাক এই স্বর্গীয় মন্দার কুসুমের পবিত্রতা ও মাধুর্য্যের বৃদ্ধিই করিয়াছে—এইরূপ বিবিধ চিন্তায় সে সীতাদেবীকে ভূতলবাসিনী কোনও দেবীর মত বোধ করিতে লাগিল। হনুমান্ সীতাদেবীর মাতৃত্ব ও দেবীত্বের

ছায়ায় আজ সরলপ্রাণ শিশুর মত গলিয়া গিয়াছে। জননী অঞ্জনার স্নেহসিক্ত মধুদৃষ্টি তাহার মনে পড়িল। আজ সে মাতৃ-স্নেহের শ্যামচ্ছায়ায় অপোগণ্ড সরলপ্রাণ শিশুর মত বিমোহিত হইয়া রহিল।

বহুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর হনুমান্ বিদায় প্রার্থনা করিল। সীতাদেবী বলিলেন, "বৎস হনুমান, আমি এই সুদীর্ঘ সময় যে পতিদেবতার পবিত্রমূর্ত্তি ধ্যান করিতেছি—যাঁহার বিরহ আমাকে অনন্ত যন্ত্রণা দিতেছে—যে মহাবীরের অক্ষোভনীয় শক্তিতে রাক্ষসকুলের সমুচিত শাস্তিবিধান হইয়াছে, আমার সেই জীবনাকাশের একমাত্র পূর্ণশশী আর্য্যপুত্রকে দেখিবার জন্য আমি ব্যাকুলা হইয়া পড়িয়াছি।"

অবিলম্বে হনুমান্ রামচন্দ্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সীতা-দেবীর কথা নিবেদিত করিলে রামচন্দ্রের হৃদয়ে সহসা কেমন এক ভাবান্তর উপস্থিত হইল। কত চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে আকুল করিয়া তুলিল। তিনি বেদনাকাতর প্রাণে বিভীষণকে বলিলেন, "মিত্রবর, আপনি অবিলম্বে আমার প্রাণপ্রতিম সীতাদেবীকে রাজরাণীবেশে এখানে আনয়ন করুন।"

বিভীষণ সীতাদেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, "রঘুকুলকমলিনী সতি, রামচন্দ্র আজ্ঞা করিয়াছেন, আপনি অযোধ্যার রাজরাণীবেশে রামচন্দ্রের সহিত মিলিত হউন।" সীতা-দেবী বলিলেন, "না, আমি এই বেশেই আর্য্যপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই। ব্যাকুল কামনায় তীর্থক্ষেত্র দর্শনে যাইতে বেশভূষার আবশ্যকতা কি?" তখন বিভীষণ বলিলেন, "জননি, ভর্ত্তৃ-আদেশ উল্লঙ্ঘন করা কখনই সাধ্বী স্ত্রীর উচিত নহে। তিনি যেরূপ অনুজ্ঞা করিয়াছেন তদনুসারে কার্য্য করাই আপনার কর্ত্তব্য।" সীতাদেবী বিভীষণের এই কথা শ্রবণ করিয়া কেশসংস্কারে অনুমতি দিলেন।

বিভীষণপত্নী সরমা সৌভাগ্যের অগ্রদূতিকারূপে তথায় উপস্থিত হইয়া নানারূপে সীতাদেবীর প্রসাধন সম্পন্ন করিলেন। [illegible]

অশোকবনে সীতা ও সরমা ।
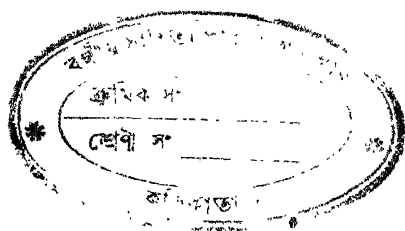
রাজভাণ্ডারের বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার সীতাদেবীর বিরহক্ষীণ দেহলতাকে আজ অপূর্ব্ব সাজে সাজাইয়া দিল। সরমা নানারূপে সীতাদেবীর সজ্জা সম্পাদন করিয়া পরিশেষে সীমন্ত-প্রদেশে সিন্দূরবিন্দু প্রদান করিলেন; যেন গোধূলি-ললাটে সন্ধ্যাসূর্য্য জ্বলিতে লাগিল। সরমা আজ বিরহিণীকে প্রেমোন্মাদিনী দেখিবার জন্য কত যত্নে সাজাইয়া দিলেন। এক একটি অলঙ্কার এক একবার পরাইয়া দিয়া দেখেন তাহা কেমন মানাইতেছে; আবার অন্যরূপে পরাইয়া দেন। বহুযত্নে কেশসংস্কার ও প্রসাধন সম্পাদিত হইলে সে অপূর্ব্ব মহিমময়ী সতীশোভনা সীতাদেবী প্রিয়সন্দর্শনে চলিলেন। পর্ব্বতব্যাহতা স্রোতস্বিনী শতবাধা ঠেলিয়া সাগর-সঙ্গমে চলিল।

সুদীর্ঘ দশমাস অদর্শনের পর সীতাদেবীর প্রীতিপ্রফুল্ল মুখকমল সন্দর্শন করতঃ রামচন্দ্র আত্মহারা হইয়া বলিলেন, "আজ আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। যে আশা বুকে রাখিয়া আমি এই ভীষণ আহবে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম আজ আমার সেই আশা পূর্ণ হইয়াছে। আজ আমার সেই রণায়াস, লক্ষ্মণের তাদৃশ ত্যাগস্বীকার ও শক্তিশেল-পীড়া, জীবনাধিক হনুমানের সুভীষণ নক্রকুম্ভীরসঙ্কুল সমুদ্রউল্লঙ্ঘন, প্রেমপ্রতিম সুগ্রীব ও ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ এবং অপরাপর বানরসেনার প্রাণপাতী চেষ্টা আজ সফল হইয়াছে। সিদ্ধি যেমন সাধনার যন্ত্রণা মুছিয়া দেয় তদ্রূপ আজ আমার চিরানন্দদায়িনী সীতাদেবী সমস্ত ক্লেশ দূর করিয়াছেন।"

সীতাদেবী রামচন্দ্রের মুখনিঃসৃত অমৃতায়মান বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া শত যন্ত্রণা বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার মুখকমল অপূর্ব্ব সৌভাগ্য-কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আনন্দাশ্রু-সলিলে তাঁহার কুরঙ্গগঞ্জিত চক্ষু দুইটি নীহারনিষিক্ত কমলদলের মত অপূর্ব্ব শোভমান হইয়া উঠিল।

এই পরিদৃশ্যমান জগতে অন্ধকার ভবিষ্যতের অজ্ঞাত মূর্ত্তির সহিত মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষার রহস্য ক্রীড়ার অভিনয় চলিতেছে।

কোথাও আশা বা আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যৎকে চিনিতে পারিয়াছে, কোথাও ভবিষ্যৎ, আশা ও আকাঙ্ক্ষার কল্পিত সুখের চিত্রের প্রতি উপহাসের হাসি হাসিতেছে। বেদনাতুরা সাধ্বীর সতীত্বের প্রভাবে চিরবাঞ্ছিত দয়িত-সমাগম-সম্ভাবনা যাহা আমরা আশা করিয়াছিলাম, দারুণ ভবিষ্যৎ সে স্থলে ঘনকৃষ্ণ মসীরেখায় কি ভয়ানক কথা লিখিয়া রাখিয়াছিল!

রামচন্দ্র সীতার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সমস্ত যন্ত্রণা বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের বীণা বাজিয়া উঠিল। তিনি এতদিন বিরহের ছিন্নতার বীণায় প্রেমের যে সাধনা করিতে-ছিলেন আজ যেন সে সাধনা সম্পূর্ণ হইল। সেই বীণা নিঃসৃত মধুরতানে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, তাঁহার সেই সুরসাধনায় সহসা আবার বিসর্জ্জনের বিষাদ সুর উঠিল। রামচন্দ্রের মনোমধ্যে লোকনিন্দার আশঙ্কা উদিত হইল।

যে পতিসোহাগিনী জীবনপণে চিরবাঞ্ছিত দয়িতের মুখ-কমল ধ্যান করিয়া আসিয়াছেন, যিনি রাক্ষসপুরীতে জলদাবৃত চন্দ্রলেখার মত আপনার মহিমা আপনি বিচ্ছুরিত করিয়াছেন, যিনি হতাশাপীড়িত প্রাণকে সতীত্বের অপূর্ব্ব গৌরবকিরীটে সুশোভিত করিয়া, উত্তরকালে মাতৃত্বের আদর্শরূপে চিরোজ্জ্বল থাকিবেন, সেই সীতাদেবীকে পুনর্গ্রহণের সময়ে সহসা রামচন্দ্রের হৃদয় লোকনিন্দার ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, জানি আমি সীতা সতীত্বের অত্যুজ্জ্বল মূর্ত্তি, মহিমার অনাঘ্রাত কুসুমমালা, প্রেমের অফুরন্ত পীযূষধারা,—কিন্তু রাজা আমি, আমার প্রাণ যে প্রজার প্রিয়করণেই পর্য্যবসিত, আমার যে স্বাতন্ত্র্য কিছুই নাই; সীতাদেবীকে গ্রহণ করিলে আমি ধর্ম্মচ্যুত হইব না, বরং আমার প্রাণ-দেবতা সতীসঙ্গী হইয়া অধিকতর তৃপ্ত হইবে। কিন্তু প্রকৃতি পুঞ্জ যে ইহাতে কত অনর্থ দেখিবে!

রামচন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া সীতাদেবীকে বলিলেন, "আমি পবিত্র ইক্ষ্বাকু বংশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এইরূপ মহাহবে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। যে ব্যক্তি অবমানিত হইয়া অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ না করে, সে কাপুরুষ। সেই হতভাগ্য হইতে বংশে কলঙ্ক স্পর্শে। আমি এই আশঙ্কায় দুষ্ট রাবণকে সবংশে নির্ব্বংশ করিয়া তোমায় উদ্ধার করতঃ ভুবনবিশ্রুত রঘুবংশের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছি। জানকি, তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, কিন্তু রাজা আমি, রাজনীতি উপেক্ষা করিয়া তোমাকে গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। মানুষ এই পৃথিবীতে নিজের কর্ম্মফল ভোগ করে। তুমিও তোমার কর্ম্মফল ভোগ কর। তুমি বিলাসী রাবণের বিকৃতচক্ষে দৃষ্টা, অধিকন্তু সেই পাপাত্মার দেহ-সংস্পৃষ্টা সুতরাং আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। আমার এই রণশ্রম, জিগীষা ও বৈরিতা কেবলমাত্র আমার পবিত্র বংশের গৌরব বৃদ্ধির জন্যই জানিও। দেবি, এই বিশাল পৃথিবী নানা প্রাণীকে স্বীয় অঙ্কে ধারণ করিয়া অন্নপানীয় প্রদান করিতেছেন—তুমিও স্বেচ্ছামত স্থানান্তরে গমন করিয়া স্বাধীন ভাবে বিচরণ কর। অথবা—"

রামচন্দ্রের আর বাক্য নিঃসরণ হইল না। বক্ষঃভেদী হাহাকার চাপা দিয়া অগ্নিগর্ভ পর্ব্বতশৃঙ্গের মত ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। পুরোবর্ত্তী বানরচমূ রামচন্দ্রের মুখ হইতে অসম্ভব কথা শ্রবণ করিয়া মর্ম্মাহত হইল। পতিব্রতার গৌরব-পতাকা সীতাদেবী স্বামীর মুখ হইতে এতাদৃশ মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়া একান্ত সঙ্কুচিতা হইয়া উঠিলেন। সমস্ত পৃথিবীতে যেন তাঁহার লুকাইবার স্থান নাই। যেন পার্থিব তাবৎ ক্ষুদ্র-বৃহৎ, চেতন-অচেতন পদার্থ হইতে সীতা আপনাকে লুকাইবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। অভিমানে তাঁহার দুই চক্ষু হইতে জলধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

তেজস্বিনী সীতাদেবী তাঁহার গণ্ডপ্লাবী অশ্রুজল মার্জ্জনা করিয়া অভিমানস্ফীত অধরে দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, তুমি সাধারণ লোকের মত এ কি কথা বলিতেছ? বোধ হয় তুমি রণশ্রমে প্রকৃতিস্থ নহ। নচেৎ ইক্ষ্বাকু বংশের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য নিরপরাধা ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইবে কেন? যে অনন্যশরণা একমনে পতিদেবতার পুণ্য চরণ ধ্যান করিয়া কালাতিপাত করিয়াছে, বিনা অপরাধে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বংশের গৌরববৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? যুদ্ধক্ষেত্রে বিভ্রান্ত-মস্তিষ্ক হতভাগ্যগণের জীবনদীপ নির্ব্বাপিত করতঃ বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া নিরপরাধা রমণীর উপর নির্ব্বাসন দণ্ড প্রয়োগেই বুঝি মনুষ্যত্ব বা অপমানের প্রতিশোধ? আর্য্যপুত্র, তুমি আমাকে বলিলে, 'তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়'—কিন্তু যে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় তাহার প্রতি কি এইরূপ বিচারই তাহার উপযুক্ত সমাদর? রাজনীতির কথা যাহা বলিলে তাহা কখনই তোমার মত আদর্শ রাজার উপযুক্ত কথা নহে। প্রকৃতিবর্গকে সৎপথে পরিচালিত করিয়া তাহাদের প্রিয়ানুষ্ঠানই যদি রাজনীতির সংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে তুমি স্বামিময়জীবিতা ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে সেই নীতির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। আমি রাবণের বিকৃত চক্ষে দৃষ্টা এবং পাপাত্মার ঘৃণ্যদেহ-সংস্পৃষ্টা, কিন্তু ইহাতে আমার অপরাধ কোথায়? রাহুকবলমুক্ত সবিতৃদেবের উদ্দেশ্যে বন্দনার অর্ঘ্যপুষ্পে কি শত হস্ত উত্তোলিত হয় না? অথবা ভুজঙ্গঅঙ্গক্লিষ্ট বনফুল কি দেবতার চরণে আরোপিত হইবার উপযুক্ত থাকে না? আর্য্যপুত্র, আমি সামান্যা রমণী। আত্মপক্ষ সমর্থন করি আমার এমন কোনও শক্তি নাই। তুমি আমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছ, তাহাতে আমি এই জানি যে, আমার মনোভৃঙ্গ চিরদিনই তোমার চরণসরোজের মধুপানের জন্য লালায়িত—হৃদয় তোমার চিরানুরক্ত। দুরাত্মার

বাহুবলে বাধা দিতে স্বভাবকোমলা অবলার ক্ষমতা কোথায়? কিন্তু হৃদয় যে আমার চিরবিজিত, তাহার উপর যে আমার নিত্য কর্ত্তৃত্ব আছে! সে হৃদয় স্পর্শ করিতে পাপাত্মার সাধ্য কি? আর্য্যপুত্র, সুচিরাতীত সেই বিবাহ বাসর স্মরণ কর। যে দিন তুমি ধনুর্ভঙ্গ করিয়া সমবেত জনগণের ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টির মধ্যে এক অপূর্ব্ব জগতের নবীন দেবতার মত প্রতীত হইয়াছিলে—যে দিন শুভ দৃষ্টির পবিত্র মুহূর্ত্তে আত্মবিস্মৃত প্রেম দিয়া উভয়ের প্রাণ আপনার সত্তা হারাইয়াছিল—সেই পবিত্র বাসরের কথা স্মরণ কর! সে হৃদয়ের প্রতি কেন বৃথা সন্দেহ? তুমি নিশ্চয় জানিও সে হৃদয়ে অপবিত্রতার কালিমা স্পর্শ করে নাই। সে হৃদয় যে দেবতার পুণ্যপীঠ—তাহা অসুরের ক্রীড়াকানন হইতে পারে না।"

এই বলিয়া সীতাদেবী রামচন্দ্রের মুখের দিকে দৃষ্টি যোজনা করিলেন। দেখিলেন, এততেও তাঁহার হৃদয় হইতে সন্দেহের নিরাস হয় নাই। তখন তিনি কাতর হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "বৎস লক্ষ্মণ, যাহার জন্য এত ক্লেশ সহ্য করিয়াছ, সেই চিরদুঃখিনীর জন্য আর একটু ক্লেশ স্বীকার কর। আমার এই স্বামি উপেক্ষিত ঘৃণ্য প্রাণে প্রয়োজন নাই। লক্ষ্মণ, চিতা সাজাইয়া দাও—তোমাদের পবিত্র মুখগুলি দেখিতে দেখিতে চিতায় প্রবেশ করিয়া এই ঘৃণিত প্রাণ বিসর্জ্জন করি।"

সরোষ দৃষ্টিতে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে অবলোকন করিলেন। দেখিলেন, তিনি অধোবদনে নিঃস্পন্দভাবে বসিয়া রহিয়াছেন। সীতাদেবীর তাদৃশ কথায় রামচন্দ্রের কোনরূপ অসম্মতি না দেখিয়া চিতা প্রস্তুতের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

অবিলম্বে চিতা প্রস্তুত হইল। প্রিয়সন্দর্শনব্যাকুলা জানকী স্বামীর আদেশে বিরহকৃশা দেহলতাকে নানা বিভূষণে সুশোভিত করতঃ ভর্ত্তৃসকাশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি সেই বেশে

আনতদৃষ্টি রামচন্দ্রকে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সমীপ-বর্ত্তিনী হইয়া যুগ্মকরে বলিলেন—

"মনসি বচসি কায়ে জাগরে স্বপ্নসঙ্গে
যদি মম পতিভাবো রাঘবাদন্যপুংসি।
তদিহ দহ মমাঙ্গং পাবনং পাবকেদং
সুকৃতদুরিতভাজাং ত্বং হি কর্ম্মৈকসাক্ষী ॥"

এতক্ষণ রামচন্দ্র নীরবে কালাতিপাত করিতেছিলেন। দেখিলেন তাঁহারই পুরোভাগে স্বর্ণলতা অন্তর্হিত হইয়া গেল। অশ্রু-সজলনেত্রে রামচন্দ্র নানারূপ বিলাপ করিতে করিতে রোষাবেশে স্বীয় ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া বলিলেন, "ভগবন্ বৈশ্বানর, তুমি আমার জানকীকে প্রত্যর্পণ কর। তুমি জানিও, সীতা বিনা রামের অস্তিত্ব নাই। আমি না বুঝিয়া প্রিয়ার প্রতি কটুভাষা প্রয়োগ করিয়াছি কিন্তু প্রিয়া আমার সতীকুলের আদর্শ স্থানীয়া, আমার সেই জীবনাধিকা সীতাকে তুমি গ্রহণ করিয়াছ। যদি তাহাকে প্রত্যর্পণ করা তোমার মনোমত না হয় তাহা হইলে আমি তোমার বিনাশের জন্য এই বাণ যোজনা করিলাম। শক্তি থাকে তুমি তাহার প্রতিসংহার কর।"

রামচন্দ্রের এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে রক্তপট্টাম্বরধারী বিভাবসু সীতাদেবীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া চিতাগর্ভ হইতে সমুত্থিত হইলেন এবং ত্বরিত পদে রামচন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া নিবেদন করিলেন, "রামচন্দ্র, আপনার সীতাকে গ্রহণ করুন। চিরপূজ্য মাতৃ চরণ স্পর্শে আমার জ্বালাময় প্রাণ আজ সুশীতল হইয়াছে। রামচন্দ্র, সীতাদেবী পবিত্রতার জাহ্নবীধারা, ইনি চিরপবিত্রা; ইঁহার সম্বন্ধে মনে সন্দেহ পোষণ করিবেন না।" অন্যান্য দেবগণও একে একে আগমন করিয়া রামচন্দ্রের নিকট সীতাদেবীর সতীত্বের কথা বিবৃত করিলেন।

মনসি বচসি কায়ে জাগরে স্বপ্নসঙ্গে
যদি মম পতিভাবো রাঘবাদন্যপুংসি।
তদিহ দহ মমাঙ্গং পাবনং পাবকেদং
সুকৃতদুরিতভাজাং ত্বং হি কর্ম্মৈকসাক্ষী॥

Artistic Press, Calcutta.

রামচন্দ্র সমবেত হুতাশনপ্রমুখ দেবতাগণকে বলিলেন, "দেবগণ, জানি আমি সীতাদেবী আদর্শচরিত্রা ; গঙ্গা সলিলে অপবিত্রতা থাকিতে পারে, সৌরকিরণে মলিনতা থাকাও সম্ভব কিন্তু সীতাদেবী পবিত্রতার আদর্শ প্রতিমা, অপবিত্রতা তাহাকে স্পর্শমাত্র করিতে পারে না। আমি সীতাদেবীর এই ভুবনবিশ্রুত সতীত্ব-কাহিনী উজ্জ্বলতর করিবার জন্যই এইরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলাম।"

অবিলম্বে লঙ্কার রাজলক্ষ্মী প্রিয়বন্ধু বিভীষণের উপর সমর্পণ করিয়া সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও সীতা সমভিব্যাহারে রামচন্দ্র পুষ্পকে আরোহণ করিয়া অযোধ্যা নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

১০

অযোধ্যার রাজশ্রী রামচন্দ্রের সিংহাসনারোহণে সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—প্রজারা সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইল।

অযোধ্যার রাজৈশ্বর্য্য সীতাদেবীকে শতরূপে মোহিত করিয়া তুলিলেও তিনি ছায়াশীতল তপোবনের মাধুর্য্য, মুনিকন্যাগণের সেই পবিত্র-মধুর সঙ্গসুখ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাই একদিন সীতাদেবী তপোবন দর্শনের জন্য রামচন্দ্রের নিকট তাঁহার অভিলাষ জানাইলেন।

সীতা তখন পঞ্চমাস গর্ভবতী। রামচন্দ্র সীতাদেবীর কথায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "সত্বরেই তাহার আয়োজন করিতেছি।" সীতাদেবী প্রফুল্ল মনে বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, তোমার স্নেহমমতা অতুলনীয়। আমার এরূপ অবস্থায় তুমি আমার এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিবে ইহা আমি মনেও করি নাই!" কিন্তু এই বাসনাই সীতার কালস্বরূপ হইল। দারুণ ভবিষ্যৎ বাসনার হৈম দ্বার দেখাইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল।

অনেক কথাবার্ত্তার পর সীতাদেবী নিদ্রিতা হইয়া পড়িলে রামচন্দ্র অন্তঃপুরচারী বিশ্বস্ত ভৃত্য দুর্ম্মুখের নিকট হইতে অবগত হইলেন, অযোধ্যার প্রজারা রাবণগৃহবাসের জন্য সীতার কলঙ্ক-কীর্ত্তন করিতেছে।

আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের হৃদয়ে সহসা ভাবান্তর উপস্থিত হইল। যে সীতা তাঁহার জীবনাধিকা—যিনি সতীত্বপ্রভাবে দেবগণের বন্দনীয়া—যিনি অযোধ্যার রাজশ্রী—যিনি তাঁহার জীবনের সুখ-শান্তি, প্রজারঞ্জনের অনুরোধে তাঁহাকেও তিনি পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মনে করিলেন, সীতাদেবী তপোবনদর্শনের যে অভিলাষ করিয়াছেন সেই ছলে তাঁহাকে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিয়া সীতাসম্বন্ধে অযোধ্যার প্রজাগণের অভিমত জানাইয়া সীতাদেবীর সম্বন্ধে তিনি কি করিবেন তাহাও জানাইলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু প্রজাপ্রিয় রাজা রামচন্দ্র লক্ষ্মণের কোন কথাই শুনিলেন না। প্রজার প্রিয়ানুষ্ঠানে তিনি আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বলি দিয়া বাল্মীকির আশ্রমপদে সীতাদেবীকে বিসর্জ্জন করিবার জন্য লক্ষ্মণের উপর আদেশ প্রদান করিলেন। ভ্রাতৃ-পরায়ণ লক্ষ্মণ উপায়ান্তরহীন হইয়া রামচন্দ্রের এই আদেশ প্রতিপালনে সম্মত হইলেন।

অবিলম্বে সীতাদেবীর তপোবন গমনোদ্যোগ হইল। সীতাদেবী মুনিকন্যাদের জন্য বাছিয়া বাছিয়া আভরণ ও বস্ত্রাদি গ্রহণ করতঃ পুলকিত প্রাণে সুমন্ত্র পরিচালিত রথে আরোহণ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত তপোবন সন্দর্শনে চলিলেন। অপূর্ব্ব পুলকে তাঁহার বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত, কিন্তু দুরদৃষ্ট তখন নিষ্ঠুর হাস্যে তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতেছিল।

ক্রমে রথ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইল। গঙ্গাদর্শনে লক্ষ্মণের শোকাশ্রুপ্রবাহ উথলিয়া উঠিল। সীতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, "বৎস লক্ষ্মণ, সহসা তোমার এইরূপ চিত্তবিকারের কারণ কি ?" লক্ষ্মণ কোনরূপে কথাটা চাপা দিয়া অবিলম্বে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইবার আয়োজন করিলেন।

সহসা সীতার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত হইয়া উঠিল। চারিদিক শূন্য বোধ হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল যেন তিনি রামচন্দ্রের নিকট হইতে চিরদিনের জন্য বিচ্যুত হইলেন—তাঁহার সুখসূর্য্য যেন চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল। অনর্থ ভাবিতে ভাবিতে তিনি গঙ্গাপার হইলেন।

নৌকা হইতে অবরোহণ করিয়া সীতাদেবী তপোবন দর্শনে গমন করিবার জন্য ত্বরান্বিত হইলে লক্ষ্মণ বলিলেন, "দেবি, একটু অপেক্ষা করুন, আমার কিছু বক্তব্য আছে ! সীতাদেবী লক্ষ্মণের কাতরতা দেখিয়া উদ্বেগের সহিত বলিলেন, "বৎস, কি বলিবে ত্বরায় বল।"

লক্ষ্মণ সেই মর্ম্মভেদী কথা বলিতে পারিতেছেন না। এদিকে সীতাদেবীও ক্রমে ঘোর সন্দেহে অভিভূতা হইয়া পড়িতেছেন ; মুহূর্ত্ত তখন তাঁহার এক এক যুগ বলিয়া অনুমিত হইতেছিল। সীতা বলিলেন, "বৎস, বুঝিয়াছি আমি—আমারই কপাল পুড়িয়াছে, নচেৎ তুমি কথা কহিতেছ না কেন ?" সীতার এইরূপ চাঞ্চল্য ও নির্ব্বন্ধ দেখিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন, "দেবি, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না—হায়রে বিধাতঃ, এইরূপ অসাধ্যসাধনের জন্যই কি তুমি আমাকে এখনও জীবিত রাখিয়াছিলে ?" অনেক কষ্টে অধোবদনে ভগ্নস্বরে বলিলেন, "দেবি, আপনি বহুকাল রাবণ-গৃহবাসিনী ছিলেন, এজন্য অযোধ্যার প্রজারা আপনার চরিত্রে দোষারোপ করে—আর্য্য রামচন্দ্র ইহা অবগত হইয়া আপনাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং আপনাকে তপোবন দর্শনের ছলে লইয়া গিয়া বাল্মীকির তপোবনে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে আমাকে আদেশ দিয়াছেন ; দেবি, এই সেই বাল্মীকির তপোবন।"

শুনিবামাত্র সীতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ বহু যত্নে সীতাদেবীর মূর্চ্ছাপগমের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে সীতা চৈতন্য লাভ করিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "লক্ষ্মণ, দুঃখ করিও না। এ বিষয়ে তোমার কিছু অপরাধ নাই—সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। বৎস, ভগবান্ দুঃখভোগ করিবার জন্যই আমায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন, নচেৎ জগৎবিশ্রুত রঘুবংশের কুলবধূ হইয়া আমাকে বনবাসিনী হইতে হইবে কেন? মানুষ এই পৃথিবীতে কর্ম্মফল ভোগ করে। বোধ হয় আমি পূর্ব্বজন্মে কোন প্রেমময়ী সাধ্বীকে পতির অঙ্কচ্যুত করিয়াছিলাম—এই পৃথিবীতে আমায় সেই পাপের শাস্তিভোগ করিতে হইল। মানুষের জীবনে ভালমন্দ যাহা ঘটে, ভগবানই তাহার বিধাতা। আমার অদৃষ্টেও যাহা ঘটিল তাহা বিধাতারই বিচিত্র বিধানে। সুতরাং আমার জন্য দুঃখ পরিত্যাগ কর। লক্ষ্মণ, আমি বনবাসে অনভ্যস্তা নই। স্বামিসঙ্গে বনবাসে অযোধ্যার রাজসুখ, পিতৃগৃহের ঐশ্বর্য্য, সবই ভুলিয়াছিলাম। বৎস, আমার অন্য দুঃখ কিছুই নাই, কেবল বনবাসী মুনিগণ আমাকে বনবাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহার কি উত্তর দিব তাহাই ভাবিয়া পাইতেছি না। আর্য্যপুত্র আমাকে নিরপরাধা জানিয়াও শুদ্ধ প্রজারঞ্জনের জন্য আমাকে দুস্তর বিপদ-সমুদ্রে নিপাতিত করিলেন; ভগবানের নিকট প্রার্থনা, তাঁহার এই আদর্শ-প্রজাপ্রিয়তা পূর্ণ হউক। আমার মনোবেদনার সান্ত্বনা নাই। ইক্ষ্বাকুবংশের সন্তান আমার গর্ভে রহিয়াছে—সুতরাং আত্মহত্যা করিয়া তাহাদের বধ সাধনে অভিলাষিণী নই।"

সীতার এই বিষাদময়ী মূর্ত্তি ও গণ্ডপ্লাবী অশ্রুজল দেখিয়া লক্ষ্মণ হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সীতা স্নেহাঞ্চলে লক্ষ্মণের অশ্রুজল মার্জ্জনা করিয়া দিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মণ, শান্ত হও। তুমি রাজাদেশ পালন করিয়া অপরাধী নও; আমি আর্য্যপুত্রের হৃদয়

অবগত আছি। আমি যে অপরাধিনী ইহা মনে করিয়া তিনি আমায় পরিত্যাগ করেন নাই। আদর্শ প্রজাপ্রিয় রাজা প্রজারঞ্জনের অনুরোধে আমার প্রতি এতাদৃশ আচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমি জানি, তাঁহার প্রাণ আমার প্রতি নিতান্তই স্নেহপরায়ণ এবং আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার ন্যায় তিনিও শোক-সাগরে নিপতিত হইয়াছেন। লক্ষ্মণ, আর্য্যপুত্র যে আদর্শ রাজা, আদর্শ পতি, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ দেবতা; তাঁহাতে পাপ স্পর্শিতে পারে না। বৎস, সত্বর তাঁহার নিকট যাও। সর্ব্বদা তাঁহাকে যত্ন করিবে এবং সতত তাঁহার নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দান করিবে—দেখিও কখনও একাকী থাকিয়া তিনি যেন কাতর না হন। তোমাকে আর একটি কথা বলিয়া দিই—তুমি আর্য্যপুত্রের চরণে নিবেদন করিও, তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া আমি দুঃখিতা নই। যে রাজধর্ম্মের জন্য তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার সেই রাজধর্ম্ম বিজয়শ্রীসম্পন্ন হউক। তাঁহার মঙ্গল কামনাই আমার অদ্য হইতে আরব্ধ সাধনার মূল উদ্দেশ্য রহিল। লক্ষ্মণ, দুঃখ পরিত্যাগ কর। আমার প্রতি তোমার মাতৃবৎ ব্যবহার আমার চিরকাল মনে থাকিবে। বৎস, আর্য্যপুত্রকে বলিও, তিনি যেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কুচিত না হন। গুণশীল লক্ষ্মণ, যদি জন্মান্তরে আমার পুনরায় নারীজন্ম হয় তাহা হইলে আর্য্যপুত্রকে স্বামী এবং তোমার মত গুণের দেবর কামনা করিব। বৎস, যাও আর বিলম্ব করিও না। আর্য্যপুত্র তোমার প্রত্যাগমনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। শ্বশ্রূগণের চরণে আমার প্রণাম জানাইও। তোমার নিকট আমার আর একটি বক্তব্য এই যে, দেখিও আমার স্নেহময়ী ভগিনীগুলি যেন কোন দুঃখ না পায়। তাহাদের প্রাণ আমার বিরহে নিতান্তই কাতর; আমার দিব্য, তুমি তাহাদের প্রিয়করণে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবে। আর আর্য্যপুত্রের চরণে আমার প্রণিপাত জানাইয়া

বলিবেন যেন তিনি আমার জন্য বিলাপ করিয়া নিজ কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত না হন; আর বলিও, তিনি ভার্য্যাভাবে আমাকে পরিত্যাগ করিলেও সামান্যা প্রজা বলিয়াও যেন মনে করেন।”

লক্ষ্মণ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। যতক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় সীতা ততক্ষণ লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরিশেষে তরণী গঙ্গার অপর পারে উত্তীর্ণ হইলে সীতা লক্ষ্মণকে আর দেখিতে না পাইয়া হাহাকার ও শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গঙ্গাসলিলস্নিগ্ধ সমীরণ সীতাদেবীর স্বেদধারা ও অশ্রুজল মুছিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছিল, কিন্তু দারুণ মনোবেদনা সেই সলিল-স্রোতকে উত্তরোত্তর বাড়াইয়াই তুলিতেছিল। গঙ্গার কূলে দাঁড়াইয়া উদ্‌ভ্রান্ত নয়না ভাবিলেন—

“পতির্হি দেবতা নার্য্যাঃ পতির্বন্ধু পতির্গুরুঃ।
প্রাণৈরপি প্রিয়ঃ তস্মাদ্ ভর্ত্তুঃ কার্য্যঃ বিশেষতঃ॥”

পতিই নারীকুলের দেবতা, বন্ধু ও গুরু। এই হেতু স্বামিকার্য্য প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। আমি জীবনপণে স্বামি-কার্য্য সমাধান করিব। স্বামীর প্রিয়চেষ্টাই আমার জীবন-যজ্ঞের মূল্য উদ্দেশ্য।

সীতা মনকে যত প্রবোধ দেন তাহা ততই শোকাশ্রুপ্রবাহে উথলিয়া উঠে। সেই দেবোপম স্বামীর অঙ্কচ্যুত হইয়া সতীর সুখ কোথায়! সেই স্বামি-স্নেহ তাঁহাকে আকুল করিল। সীতার ক্রন্দনে সেই বনভূমি কাঁপিয়া উঠিল।

ক্রন্দনের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া মহামুনি বাল্মীকি সেই স্থানে উপনীত হইয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, “মা জানকি, দুঃখ পরিত্যাগ কর। আমি জানি, তুমি কে? সতি, বিলাপ পরিত্যাগ কর। স্বামীর নিকটে তুমি অবিশ্বাসিনী নহ। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, রামচন্দ্র তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া বিষণ্ণভাবে কাল যাপন করিতেছেন। দেবি, অযোধ্যার রাজশ্রী তোমার অভাবে বিমলিন

হইয়া রহিয়াছে। মা, আমাকে তুমি সন্তান তুল্য জানিও। সন্তানের নিকট মার কোন অভাব থা কবে না। তোমাকে আসন্নপ্রসবা দেখিতেছি। এখানে তোমার কোনও অযত্ন হইবে না।"

বাল্মীকি শোককাতরা সীতাদেবীর দোহদ-পলিত মুখশ্রী দেখিয়া বড়ই কাতর হইয়া পড়িতেন এবং স্বীয় হোমকুণ্ডের নিকটে বসিতে আদেশ দিয়া সীতাকে কত শাস্ত্র-কথা শুনাইতেন। দুই তেজস্বী পুরুষ সীতার গর্ভে রহিয়াছে বলিয়া সীতাদেবীর হতাশাতপ্ত প্রাণে কত আনন্দপ্রদান করিতেন।

১১

যথাসময়ে সীতাদেবী দুই যমজপুত্র প্রসব করিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি কুমারদ্বয়ের জাতকর্ম্ম সমাধান করিয়া তাহাদের কুশ ও লব নাম নির্দ্দেশ করিলেন।

সীতাদেবী সেই কুসুমসুকুমার পুত্র দুইটির মুখাবলোকন করিয়া সর্ব্ব দুঃখ বিস্মৃত হইলেন। বাল্মীকির সেই শান্ত-স্নিগ্ধ তপোবন এই লীলাচঞ্চল শিশুযুগলের কলহাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিল। রাজবধূ সীতা তপস্বিনী বেশে কুমারযুগলের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি সুমহৎ রামচরিত অবলম্বন করিয়া রামায়ণ নামক মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কুশীলব বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মহর্ষি তাহা-দিগকে সেই রামায়ণ গান করিতে শিখাইলেন। কুমারযুগল বীণার সুরে সুর মিলাইয়া রামায়ণ গান করিতে লাগিল। সীতা পুত্রদ্বয়ের বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বরে বাল্মীকির ললিত রচনা শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইতেন এবং আপনাদের ইতিহাস, ইক্ষ্বাকুবংশের গৌরবকেতন কুমারযুগলের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া অশ্রুপাত করিতেন।

এদিকে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। মহর্ষি সেই যজ্ঞে সশিষ্য তথায় উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া

সীতাদেবীকে বলিলেন, "মা, রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমি ইচ্ছা করিতেছি, তোমার তনয়দ্বয়কে তথায় লইয়া যাইব।"

সীতাদেবী রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের সংবাদে একটি বিষয় কল্পনা করিয়া বিশেষ চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন, এ চিন্তা এই তাঁহার নূতন। পিতৃগৃহে, স্বামিচরণোপান্তে নানা শাস্ত্রকথা শুনিয়া অবগত ছিলেন, "সস্ত্রীকোধর্ম্মমাচরেৎ"—ধর্ম্মকার্য্য সস্ত্রীক আচরণ করিতে হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞে রামচন্দ্রের পার্শ্বে সহধর্ম্মিণীর কার্য্য কে করিবে? হয়ত তিনি পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন—এই সন্দেহে তিনি রামচন্দ্রের স্নেহহীনতা কল্পনা করিয়া কালাতিপাত করিতেছেন, এমন সময়ে কুশ ও লব হাসিতে হাসিতে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, "মা, মহর্ষি বলিয়াছেন আজ আমাদিগকে রামায়ণের নায়ক রাজা রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ দেখিতে লইয়া যাইবেন। মা, আমরা রামায়ণে রাজা রামচন্দ্রের কত সদ্‌গুণের পরিচয় পাইয়াছি। মা, এমন আদর্শ রাজা কখনও কোনও দেশে হইয়াছে তাহা ত শুনি নাই। কথায় কথায় মহর্ষি পত্রবাহ দূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অশ্বমেধ যজ্ঞ সস্ত্রীক আচরণ করিতে হয়। রাজা রামচন্দ্র প্রজাপ্রীতিসম্পাদনার্থ তদীয় সাধ্বী পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন—এখন কি যজ্ঞ সমাধানের জন্য পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন?' দূত বলিল, 'বশিষ্ঠ প্রভৃতি তাঁহাকে দারপরিগ্রহের জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত না হইয়া তদীয় সাধ্বী পত্নীর এক স্বর্ণময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন।' মা, আমরা রামচন্দ্রের বিবরণ পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি, তাহার পর আবার এই সংবাদে অত্যন্ত পুলকিত হইয়াছি। মা, অনুমতি কর, আমরা মহর্ষির সহিত তথায় গমন করিয়া সেই নরদেবতাকে দর্শন করিয়া ধন্য হই।"

সীতা সহর্ষে সম্মতি দান করিলেন। দারুণ বিষাদে তাঁহার হৃদয় পুড়িতেছিল। কুমারদ্বয়ের মুখে যজ্ঞ সম্পাদনার্থ হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতি নির্ম্মিত হওয়ার সংবাদে তাঁহার সৌভাগ্যগর্ব্ব উথলিয়া উঠিল—অপাঙ্গে অশ্রু দেখা দিল।

বাল্মীকি কুশ ও লব সমভিব্যাহারে যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শিষ্যদ্বয়কে আদেশ করিলেন, "তোমরা নানাস্থানে বীণাযন্ত্রসহযোগে রামায়ণ গান করিবে। যদি রাজা কৌতূহলাক্রান্ত তোমাদিগকে আহ্বান করেন তবে সবিনয়ে সেখানে যাইবে। পুরস্কারে প্রলুব্ধ হইও না। যদি রাজা পুরস্কার প্রদান করেন তাহা হইলে বলিও, মহারাজ, আমরা ঋষিকুমার, আমাদের অর্থে কোন প্রয়োজন নাই—পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিও, আমরা বাল্মীকির শিষ্য।"

কুমারযুগল এইরূপে গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া সমবেত নরপতিগণের পটমণ্ডপের পুরোভাগে বীণা সংযোগে মনের অনুরাগে গান করিতে লাগিল। সমবেত রাজন্যগণ কুমারগণের দেহে রাজা রামচন্দ্রের দেহসাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

ক্রমে এই সংবাদ রাজা রামচন্দ্রের শ্রুতিগোচর হইলে রাজা এক সভাসদ্ ব্রাহ্মণদ্বারা তাহাদিগকে আহ্বান করাইলেন। রাজা আহ্বান করিয়াছেন শুনিয়া কুমারদ্বয় সবিনয়ে সভায় প্রবেশ করিয়া মনের অনুরাগে বীণার সুরে সুর মিলাইয়া সীতারামের প্রণয়মূলক অংশ গান করিতে লাগিল। শ্রবণ করিয়া রাজা রামচন্দ্রের শোকাশ্রু প্রবাহ উথলিয়া উঠিল। এদিকে অবরোধের মধ্যে রাজমাতা কৌশল্যাদেবী কুমারদ্বয়ের রূপলাবণ্য দেখিয়া চীৎকার করিয়া উচ্ছ্বসিত প্রাণে বলিলেন, "লক্ষ্মণ, এ দুটি বালক যে আমার রামের বংশধর! ঐ দেখ আমার রাম ও সীতার সমস্ত অঙ্গলক্ষণ উহাদের শরীরে বিদ্যমান। অবিলম্বে তুমি উহাদিগকে এখানে লইয়া আইস।" লক্ষ্মণ রাজমাতার আদেশে অবিলম্বে কুমারযুগলকে

অন্তঃপুরে লইয়া আসিলে কৌশল্যা সজলনেত্রে কুমারদ্বয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কুমারগণ সবিনয়ে বলিল, "আমরা বাল্মীকির শিষ্য।" সমবেত পুরস্ত্রীগণ সকলেই বলিয়া উঠিল,—"নিশ্চয়ই এই দুটি বালক সীতাদেবীর গর্ভজাত সন্তান।"

বাল্মীকি আসিয়া পরিচয় দান করিলেন। অবিলম্বে সীতা পুনর্গ্রহণের প্রস্তাব উঠিল। রামচন্দ্র বলিলেন, "দেব, আপনি ত সমস্তই জানেন, সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি সুখী নই। শুদ্ধ প্রজাগণের অসন্তুষ্টির জন্যই আমি সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছি। যদি প্রজাগণের কোন আপত্তি না থাকে তাহা হইলে সীতার পুনর্গ্রহণে আমার কোন অসম্মতি নাই।"

শীঘ্রই তদুপযুক্ত আয়োজন হইল। গৈরিকবসনা সীতাদেবী ধীরপদে সভা প্রবেশ করিয়া শুনিলেন, সেই জনবহুল সভার মধ্যে পুনরায় বিশুদ্ধ-চরিত্রতার প্রমাণ দেখাইতে হইবে। শুনিবামাত্র তাঁহার হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িল। তখন তিনি যুগ্মকরে বলিলেন, "মা বিশ্বম্ভরে, যদি আমি ঐকান্তিক চিত্তে পতিদেবতার চরণ ধ্যান করিয়া থাকি, যদি সহস্র দুঃখদুর্গতির মধ্যেও পতিদেবতাকে ধ্রুবতারা রূপে লক্ষ্য করিয়া জীবনতরণী পরিচালনা করিয়া থাকি, তবে তুমি তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে তোমার এই দুঃখিনী তনয়াকে স্থান দান কর।"

সহসা রাজসভা দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া গেল। সকলেই দেখিল— হরিৎশস্য সম্ভারহস্তা লোকমাতা ধরণীদেবী স্নেহহস্ত প্রসারণপূর্ব্বক সীতাদেবীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া পঙ্কজাসনে উপবেশন করিলেন।

সমবেত জনমণ্ডলী উচ্চকণ্ঠে সীতারামের জয় গাহিয়া উঠিল— ধন্য আদর্শ রাজা, ধন্য আদর্শ সতী।
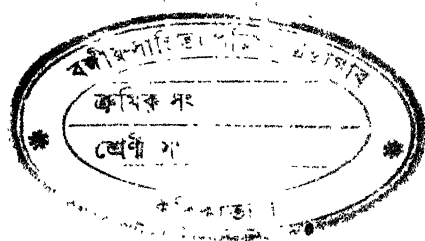
দ্বিতীয় আখ্যান

সাবিত্রী

দ্বিতীয় আখ্যান

সাবিত্রী

১

উত্তর ভারতের পঞ্চনদ প্রদেশস্থ চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান পূর্ব্বকালে মদ্ররাজ্য নামে কথিত হইত। উক্ত রাজ্যে অশ্বপতি নামে এক পরম ভক্তিমান রাজা ছিলেন। তাঁহার সুশাসনে প্রজা সকল পরম সুখে কালাতিপাত করিত। রাজা অশ্বপতি জিতেন্দ্রিয়তা প্রজানুরক্তি, বদান্যতা প্রভৃতি গুণে একজন আদর্শ রাজার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

এখন বহুদিন গত হইয়াছে। চিরপ্রবহমাণ কালস্রোত মদ্রদেশের সেই গৌরব-কাহিনী চিরদিনের জন্য মুছিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু মদ্ররাজ অশ্বপতির তনয়া সাবিত্রীদেবীর পুণ্যকাহিনী হিন্দু নরনারীর ভক্তিপূত প্রাণকে সতীত্বের এক অপূর্ব্ব বিজয়গর্ব্বে চিরগৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা এই অধ্যায়ে সেই সতীশিরোমণি সাবিত্রীদেবীর জীবনী আলোচনা করিব।

মদ্ররাজের অপূর্ব্ব প্রজানুরক্তিতে রাজ্যের কোথাও বিদ্রোহ নাই, প্রজাকুল নিরাতঙ্ক, বসুমতী শস্যসম্ভারপরিপূর্ণা; সর্ব্বত্রই সুখ ও শান্তির খেলা। যেন মদ্ররাজ্য কোলাহল-হীন এক অপূর্ব্ব প্রেমরাজ্য। কিন্তু সর্ব্ব বিষয়ে মদ্ররাজ্য সমৃদ্ধ হইলেও রাজার অনপত্যতার জন্য রাজপুরী বেণুরববিহীন একতান বাদ্যের মত যেন গাম্ভীর্য্যহীন বলিয়া অনুমিত হইত। এজন্য রাজা ও রাণী সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকিতেন। যদিও তাঁহারা প্রজাগণকে পাইয়া সন্তানহীনতার

অভাব বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তথাপি সময়ে সময়ে এক গভীর দুঃখ তাঁহাদের প্রাণকে ঘোর বিষাদের কালিমায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত।

এইরূপে রাজা অশ্বপতি মনের মধ্যে এক গভীর দুঃখ চাপা দিয়া প্রজাপালন করিতেছিলেন। তিনি এবং তদীয় সাধ্বী পত্নী মালবী দেবীও মধ্যে মধ্যে কোন হাস্যপুলকিত শিশুর পবিত্র-সুন্দর স্বাস্থ্য-ললিত মুখকান্তি সন্দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া পড়িতেন এবং রজনী-যোগে উভয়ে একত্র উপবেশন করিয়া অনপত্যতার জন্য বিষম দুঃখ অনুভব করিতেন।

প্রজাকুল, সমবেত রাজন্যবর্গ, সভাসদ্ মুনিঋষিগণ সকলেই দেখিতেন, রাজার হৃদয়মধ্যে কি এক ঘোর অতৃপ্তি বিরাজ করিতেছে; রাজা অশ্বপতি স্নেহচ্ছায়ায় মদ্ররাজ্যকে সুশীতল করিয়া আছেন বটে কিন্তু তিনি সর্ব্বদা এক সুভীষণ মনের আগুনে দগ্ধ হইতেছেন।

একদিন প্রাতে রাজা অশ্বপতি নগর ভ্রমণ করিতেছেন। হঠাৎ একটি কুসুম-সুকুমার শিশুকে দেখিয়া তাঁহার চিত্ত বিকল হইয়া উঠিল। সরলপ্রাণ শিশুর লীলাহাস্য, অপূর্ব্ব সরলতা, সর্ব্বোপরি চিরসুন্দর অভেদজ্ঞানের মাধুর্য্য তাঁহাকে মোহিত করিয়া ফেলিল।

রাজপুরীতে প্রত্যাগত হইয়া রাণীর সহিত সে-বিষয়ে নানা কথা হইল। রাজা বলিলেন, "রাজ্ঞি, আমাদের অভাব কিছু নাই; প্রজাকুল বৈরিভাবশূন্য, ধরণী শস্যশালিনী, রাজ্য শত্রুর লোলুপদৃষ্টির বহির্ভূত; সর্ব্বত্রই সুখ আর শান্তি। কিন্তু আমার রাজপুরী যেন নিরানন্দময়ী। যেস্থান সরলপ্রাণ অস্ফুটবাক্ শিশুর কলহাস্যে মুখরিত নয়, তাহা যে ভীতিবহুল প্রেতদেশের মত। মহিষি, জীবনের প্রধান সুখ তনয়তনয়া, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া যে কি গভীর দুঃখে কালাতিপাত করিতেছি তাহা বলিতে পারিতেছি না। হৃদয় সর্ব্বদাই এক অশান্তি-দহনে দগ্ধীভূত হইতেছে। রাজভোগে তৃপ্তি নাই—রাজকার্য্যে সুখ নাই—শাস্ত্রপাঠে চিত্তসংযম নাই—

চারিদিকে অতৃপ্তি! ঘোর অতৃপ্তি যেন আমার হৃদয়কে ছাইয়া ফেলিয়াছে!" সুশীলা পত্নী স্বামীর হৃদয়ে সুগভীর দুঃখভার অনুভব করিয়া গভীরতম বিষাদসাগরে নিপতিত হইলেন।

সেদিন রাজা অশ্বপতি ঘোর অতৃপ্তি হৃদয়ে লইয়া সভারোহণ করিলেন। সমবেত সভাসদ্‌গণ রাজার সেই চিন্তাকলুষিত মুখশ্রী অবলোকন করতঃ তিনি কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য সোৎসুকচিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

রাজা উপনীত হইয়াই বলিলেন, "সভাসদ্‌বর্গ, আমি ক্রমে বৃদ্ধ হইয়া পড়িতেছি; সময় থাকিতে একটা ব্যবস্থা না করিতে পারিলে এই শান্তিময় রাজ্য শত্রুকবলিত হইয়া হতশ্রী হইয়া পড়িবে। আমি নিঃসন্তান, সুতরাং রাজ্যের অধিকারী কাহাকে করিব, ভাবিয়া আকুল হইয়াছি। হে ত্রিকালদর্শী মুনিগণ, এ বিষয়ে আপনারা কি অনুমতি করেন?"

রাজার সেই বিষাদপূর্ণ বাক্যাবলি শ্রবণে রাজসভা নিরানন্দ-প্রভাবে যেন মলিন হইয়া গেল। সকলেই রাজার দুঃখে অপরিসীম দুঃখ বোধ করিলেন। মুনিগণ বলিলেন, "রাজন্, আপনার গৌরবময় সিংহাসনে উপবেশন করিতে যে-সে নরপতির সাধ্য নাই। যদি কেহ এই সিংহাসনের উপর লোলুপ দৃষ্টি নিপাতিত করে, তবে নিশ্চয়ই জানিবেন, তাহাকে অনলাকৃষ্ট পতঙ্গের মত ভস্মীভূত হইতে হইবে। মহারাজ, হতাশ হইবেন না। আপনার আত্মজই এই মহান্ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া আপনার প্রীতি উৎপাদন ও শঙ্কা নিরাস করিবেন। আপনি সন্তান কামনা করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করুন। বিধাতার কৃপায় আপনি সন্তানলাভ করিবেন।"

মুনিগণের কথা শুনিয়া রাজার হতাশামলিন প্রাণের মধ্যে আশার কনককিরণ নিপতিত হইল। তিনি হর্ষপুলকিত কণ্ঠে বলিলেন, "মুনিগণ, আমি অপত্যকামনায় কোন্ দেবের উপাসনা

করিব ? রাজ্যের মঙ্গল ও বংশের গৌরব বৃদ্ধির জন্য আমি কৃচ্ছ্র সাধনেও বিরত হইব না।”

মুনিগণ, একবাক্যে সাবিত্রীদেবীর উপাসনা করিতে বলিলেন।

রাজা মুনিগণের বাক্যে পরম আস্থাবান ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের সেই আদেশবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া সভাসদ্‌গণকে বলিলেন, “তপস্যা বড় গুরুতর ব্যাপার ; দারুণ ভবিষ্যতের সহিত যুদ্ধ। সুতরাং সংসারের কোলাহলে তাহা নিরাপদে সম্পন্ন হইতেই পারে না। এজন্য ইচ্ছা করিতেছি, তপস্যার জন্য আমি বনগমন করিব। আশা করি, আপনারা এ বিষয়ে সম্মতি দান করিবেন।” সভাসদ্‌বর্গ বলিলেন, “আপনার আদেশ আমরা শিরোধার্য্য করিয়া মানিব। আপনি স্বচ্ছন্দমনে তপস্যার্থ গমন করুন। আমরা হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দিয়া আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।”

রাজা তপস্যার জন্য বনে গমন করিবেন শুনিয়া মদ্রদেশের প্রজাগণ রাজার সান্নিধ্যের অভাব অনুভব করতঃ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাদের প্রাণ রাজার নিরপত্যতার জন্য অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ছিল। সন্তানকামনাই রাজার তপস্যার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং তজ্জন্যই বনগমন ইহা শুনিয়া প্রজাগণ আশ্বস্ত হইল এবং তাহারা সান্ত্বনার অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া রাজাকে বিদায় দিল।

২

বনে গমন করিয়া রাজা অশ্বপতি গভীর তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। অশ্বপতির তপঃসাধনা দেখিয়া দেবগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

ব্রহ্মা অশ্বপতির তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এমন সময়ে সাবিত্রীদেবী তথায় উপনীত হইয়া বলিলেন, “ব্রহ্মন্, রাজা অশ্বপতি

সন্তানকামনায় ঘোর তপস্যা করিতেছে। আমার প্রসাদলাভই তাহার তপস্যা। ব্রহ্মন্, আমি তাহার উপর পরিতুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু দেখিলাম, তাহার তপস্যার ফল প্রদান করা আমার ক্ষমতার বহির্ভূত। দেব, আপনি চরাচরের ভাগ্যবিধাতা। অশ্বপতির তপস্যার ফল প্রদান করিতে হইলে আমাকে ভাগ্যবিধাতার সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু আমার সে ক্ষমতা নাই।"

ব্রহ্মা সাবিত্রীদেবীর এই কথা শুনিয়া স্মিত অধরে বলিলেন, "দেবি, আমি তোমার মনের ভাব বুঝিয়াছি। তুমি অশ্বপতির কামনা পূর্ণ করিতে পার।"

শুনিয়া সাবিত্রীদেবী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ব্রহ্মন্, একবার মর্ত্ত্য-লোকে তপঃকৃশ রাজর্ষির ললাটফলক দর্শন করুন দেখি? দেখিতেছেন কি, আপনিই তাহার অদৃষ্টে নিরপত্যতা লিখিয়াছেন কিনা? তবে কেন এ উপহাস দেব?"

ব্রহ্মা সাবিত্রীদেবীর কথা শুনিয়া বলিলেন, "দেবি, এই সামান্য বিষয় বুঝিতে পারিতেছ না? এই পরিদৃশ্যমান জগতে সকলেই কর্ম্মসূত্রে আলম্বিত। কর্ম্মদ্বারাই বন্ধন মুক্ত হয়—মানুষের গতির পরিবর্ত্তন হয়। কর্ম্মেই জগতের প্রতিষ্ঠা; আমি শুদ্ধ নিমিত্ত মাত্র। অশ্বপতির সাধনা তাহার কর্ম্মফলের খণ্ডন করিয়াছে। অতঃপর তাহার এই সাধনা তাহার অনপত্যতা বিলোপ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সে তোমার প্রসাদে সন্তান লাভ করিতে পারিবে। অশ্বপতি তোমার উপাসনা করিয়াছে—তুমি তাহার উপাসনায় প্রীত হইয়াছ সুতরাং তুমি তাহাকে রূপগুণশালিনী এক কন্যা দান করিতে পার।"

সাবিত্রীদেবী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি দেব? অশ্বপতি সন্তান কামনায় আমার তপস্যা করিতেছে, আমি তাহাকে কন্যা প্রাপ্তির বর দিব কিরূপে? কন্যা ত তাহার কাম্য নহে।" ব্রহ্মা

বলিলেন, "দেবি, পুত্র ও কন্যা উভয়েই সন্তান সংজ্ঞার অন্তর্গত। উভয় হইতেই বংশ বিস্তৃত হয়। এইজন্য উভয়েই সন্তানপদবাচ্য, সুতরাং অশ্বপতিকে কন্যাদান করিলে তোমার অন্যায় কিছুই হইবে না। তুমি তাহাকে কন্যাপ্রাপ্তির বরই দান কর।"

রাজা অশ্বপতিকে কন্যাপ্রাপ্তির বর দান করিতে সাবিত্রীদেবীর কিছুতেই মন সরিতেছিল না। ব্রহ্মা ইহা বুঝিয়া বলিলেন, "দেবি, নীচ ও সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ব্যক্তিগণই পুত্র কন্যায় পৃথক্ বোধ করে। মমতারূপিণী তনয়া বৃদ্ধ পিতার প্রধান অবলম্বন। ভক্তিতে, স্নেহে, মমতায়, সেবাশুশ্রূষায় কন্যা দেবীরূপে জনকজননীর ব্যথা হরণ করে। এমন কন্যাকে তুমি পুত্র হইতে পৃথক বোধ কর? দেবি, সঙ্কুচিত হইও না। অশ্বপতির কন্যালাভের গূঢ় রহস্য আছে। শক্তিস্বরূপিণী নারী সতীত্বের প্রভাবে কি অসাধ্য সাধন করিতে পারে, ইহা প্রদর্শনও ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।" এই বলিয়া ব্রহ্মা সাবিত্রীদেবীকে অশ্বপতির ভাবী কন্যার বিচিত্র কাহিনী বিবৃত করিলেন।

সাবিত্রীদেবী ব্রহ্মার মুখে তাবৎ কথা শুনিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল মনে অশ্বপতিকে সন্তানপ্রাপ্তির বর প্রদান করিলেন।

মহারাজ অশ্বপতি নিজ রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। প্রজাকুল রাজসন্দর্শন করিয়া পুলকিত হইল—এবং রাজার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে শুনিয়া তাহারা ততোধিক আনন্দিত হইল। রাজপুরী কবে রাজকুমারের কলহাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিবে, বেদনাকাতর রাজারাণীর প্রাণ সন্তানদর্শনে কখন পুলকিত হইয়া উঠিবে তাহা দেখিবার জন্য সকলেই অপেক্ষা করিতে লাগিল।

যথাকালে রাণী এক কন্যা সন্তান প্রসব করিলেন।

রাজ্যে আনন্দস্রোত শতধারে বহিতে লাগিল। রাজা অশ্বপতি রাণীর কন্যাপ্রসবে দৈব বরে তাদৃশ আস্থা রাখিতে পারেন নাই দেখিয়া, সাবিত্রীদেবী কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইয়া একদিন নিদ্রিত রাজাকে

স্বপ্নযোগে বলিলেন, 'রাজন্, দৈব-বাক্যে আস্থা হারাইও না। তোমার এই ভুবনমোহিনী কন্যার দ্বারা নারীচরিত্রের এক উজ্জ্বল দিক প্রকাশিত হইবে। এই কন্যার প্রভাবে তুমি ভবিষ্যতে শতপুত্রের পিতা হইবে।'

সহসা অশ্বপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি শয়নপ্রকোষ্ঠে কি এক দিব্য সৌরভ অনুভব করিয়া ইহা চিরারাধ্যা সাবিত্রীদেবীরই আবির্ভাব ও তাঁহারই শুভ আজ্ঞা অনুভব করতঃ পরম পুলকিত হইলেন এবং অবিলম্বে রাণীকে সমস্ত কথা জানাইলেন।

৩

রাজকুমারী শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রকলার মত দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। সাবিত্রীদেবীর বরে এই কন্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া রাজা অশ্বপতি কন্যার সাবিত্রী নাম রাখিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রীর রূপজ্যোতিঃ বাড়িতে লাগিল। রাজা ও রাণী তনয়ার আঙ্গিক শোভার সহিত অন্তরের সৌন্দর্য্য, বিনয়, দেবতার প্রতি ভক্তি, সর্ব্ব জীবে মাতৃভাব, মাতাপিতার প্রতি অপূর্ব্ব অনুরাগ দেখিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইলেন এবং দৈববরপ্রাপ্ত সেই কন্যারত্নটিকে অতি সন্তর্পণে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সাবিত্রী যৌবনসীমায় উপনীত হইলেন। তাঁহার অলোক-সামান্য রূপরাশি যৌবনের স্নিগ্ধ-স্পর্শে মধুরতর হইয়া উঠিল। স্বভাব-সরল মুখখানিতে লজ্জার একটা আবেশ দেখা যাইতেছে, চক্ষুতারকা লীলাচঞ্চল, দৃষ্টির মধ্যে কেমন সপ্রতিভ ভাব দেখিয়া অশ্বপতি বুঝিলেন, সাবিত্রীর রূপ-সাগরে জোয়ার আসিয়াছে—অবিলম্বেই ইহাকে পাত্রসাৎ করিতে হইবে।

যৌবনের আলিঙ্গনে রাজকুমারী সাবিত্রীর সেই ভুবনমোহিনী দেহকান্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কমলদলসন্নিভ অক্ষিযুগল চঞ্চল

হইল। ভ্রমরকৃষ্ণ কুটিল কুন্তলগুলি যেন সেই পবিত্রতামাখা মুখশশীকে পরিবেষ্টন করিয়া শোভা পাইতে লাগিল।

সাবিত্রীর অন্তরের সৌন্দর্য্য কত মধুর! শৈশবের ধূলাখেলা, উদ্যানভ্রমণ, পুষ্পচয়ন, কলহাস্য, স্বচ্ছন্দগতি, ব্রতউপবাস প্রভৃতিতে সংযত হইয়াছে। এক নবীন আশা তাঁহাকে সম্মুখে এক বিশাল কর্ম্মভূমি দেখাইয়া দিতেছে।

সাবিত্রী দেখিতেছেন, সম্মুখে বিশাল কর্ম্মভূমি। এখানে অনেক প্রলোভনের ভিতর দিয়া কর্ত্তব্য সাধন করতঃ বর্ত্তমানের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের জন্য বীজরোপণ করিতে হইবে। প্রকৃতি তাঁহার পরার্থ-পূত প্রাণকে এখন কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতেছে; কিশোরী সাবিত্রী এখন প্রকৃতির বিশ্বস্তা শিক্ষার্থিনী।

রাজা অশ্বপতি কন্যার এইরূপ পবিত্রতামাখা মুখশ্রী দেখিয়া পুলকিত হইতেন। ব্রতনিয়মে উপবাসক্ষীণ দেহলতা দেখিয়া অশ্বপতি ভাবিতেন, সাবিত্রীর এই মূর্ত্তিটি কত মধুর। দেবপূজা-নিরতা তনয়ার সেই পবিত্র কৌষেয় বাস, সুচারু ললাটের চন্দনবিন্দু, দেবতার প্রতি নিবদ্ধ দৃষ্টি এবং রুক্ষ কেশদাম দেখিয়া সুদূর অতীতের পূজানিরতা দক্ষতনয়ায় ছবি রাজার নেত্রসম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

একদিন অপরাহ্নে রাজা অশ্বপতি দেখিলেন, রাজপ্রাসাদের অন্তর্গত কেলিকাননে কত ফুল ফুটিয়াছে, পাষাণ-সোপানবদ্ধ দীর্ঘিকার কাল জলে কমল ফুটিয়াছে, কোকিলগণ কুসুমিত বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিয়া মনের অনুরাগে কুহু কুহু রব করিতেছে। মধুপাননিরত ভ্রমর-কুল শ্রুতিমধুর গুঞ্জন করিতেছে। পুষ্পিতমাধবীলতাকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত আম্রবৃক্ষ সকল রক্তবর্ণ নব পল্লবস্তবকে ঈষৎ অবনত হইয়াছে। বৃতি-পার্শ্বে পল্লবিত অশোকতরু আমূল প্রবালসন্নিভ রক্তবর্ণ পুষ্পশোভিত হইয়াছে। কুরুবকবৃক্ষের অচিরোদগত মঞ্জরীদাম দেখা যাইতেছে।
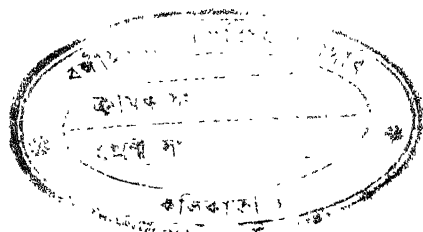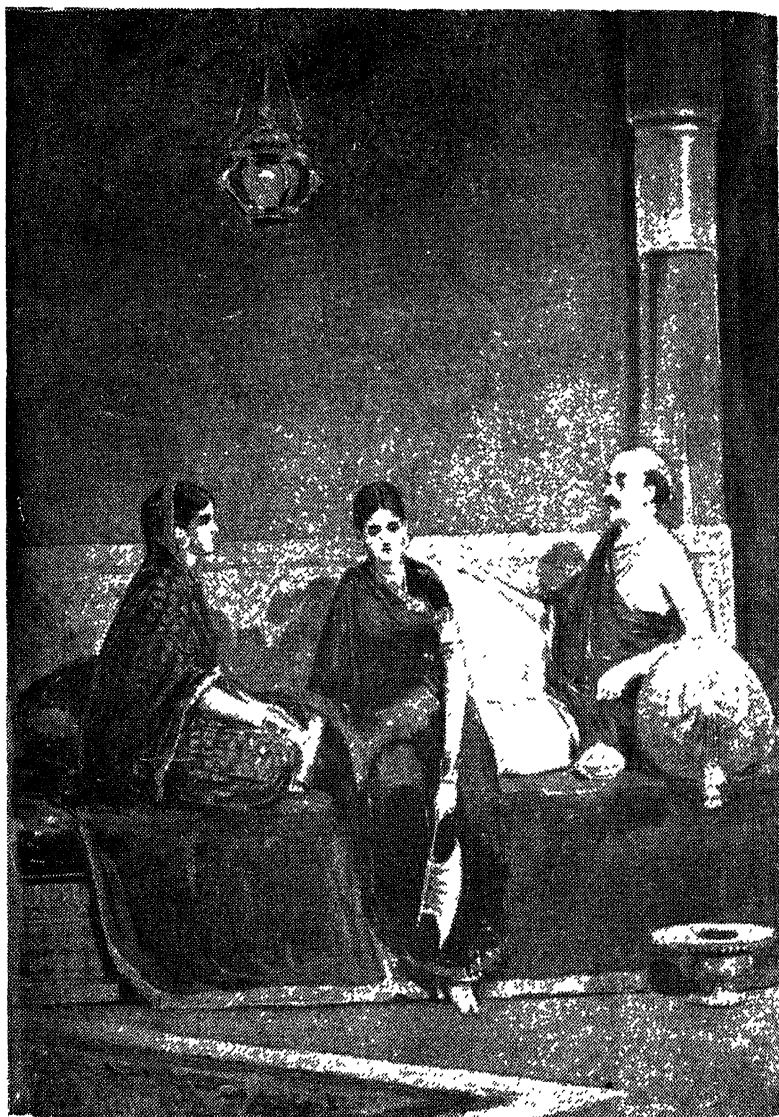
রাজা বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, তুমি তোমার পতি নির্ব্বাচনের চেষ্টা কর।"—৬০ পৃঃ

New Artistic Press, Calcutta

সুদূর নগরপ্রান্তে নবকর্ণিকার পীতাভা দেখিয়া রাজা অশ্বপতি বসন্ত-মোহে বিমোহিত হইয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। অসংখ্য দীপমালাসমুজ্জ্বল রাজপুরী মণি-মালিনী যুবতীর মত শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিল। বায়ুহিল্লোলে দূর দেবালয় হইতে সান্ধ্য আরতির শব্দ আসিতে লাগিল।

রাজা অশ্বপতি সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া বিশ্রাম-প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। মহিষী মালবী দেবী স্বামিসেবার জন্য তথায় আগমন করিয়া রাজার পার্শ্বে উপবেশন করিলে রাজা বলিলেন, "রাণি, তোমার সঙ্গে আজ আমার একটা পরামর্শ আছে"—রাণী পরামর্শের কথা শুনিয়া উৎসুক-দৃষ্টিতে রাজার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রাজা বলিলেন, "রাণি, সাবিত্রী ষোড়শ বর্ষে উপনীতা হইয়াছে। যৌবন-আলিঙ্গিতা কুমারীর দেহলতায় যেন এক নব বসন্তের মাধুরী দেখা যাইতেছে, তাহার স্বভাব-সৌম্য মুখখানি অতঃপর কেমন ব্রীড়াবনত হইয়াছে, সরল দৃষ্টিতে কেমন সপ্রতিভ ভাব। রাণি, অবিলম্বে তাহাকে পাত্রসাৎ করিতে হইবে। এই পরামর্শের জন্য এই সময়ে তোমাকে ডাকিয়াছি।"

রাণী বলিলেন, "মহারাজ, সাবিত্রীর বিবাহের কথা আমি আপনাকে বলিব বলিব মনে করিতেছিলাম। মা আমার মানবীরূপে দেবী। আপনি অবিলম্বে রূপগুণশালী রাজপুত্রের অনুসন্ধান করুন।"

তনয়ার বিবাহ সম্বন্ধে রাজারাণীর এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে কৌষেয়বসনা ব্রতপরায়ণা সাবিত্রী আসিয়া মাতাপিতার চরণ বন্দনা করিলেন। রাজা অশ্বপতি পরম সমাদরে তনয়াকে পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। রাজা বলিলেন, "মা আমার, ব্রত-সংযমে তোমার সুকুমার দেহখানি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, রুক্ষস্নানে তোমার চুলগুলি স্বাভাবিক শোভা পরিত্যাগ করিয়াছে। মা কেন এ কৃচ্ছ্র সাধনা?"

সাবিত্রী পিতার কথা শুনিয়া বলিলেন, "বাবা, ব্রতোপবাসে আমার কোন কষ্ট হয় না ; আমি বেশ থাকি।"

রাণী মন্দিরাগতা তনয়ার হোমান্তিতিলকপূত ললাটের ঘর্ম্ম মুছাইয়া দিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, "মা, সমস্ত দিন উপবাস করিয়া আছ, চল কিছু খাইবে চল।" এই বলিয়া রাণী তনয়াকে লইয়া স্বীয় প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন।

রাজা অশ্বপতি তনয়ার কথা ভাবিতে লাগিলেন। এই রূপগুণ-শালিনী তনয়ার উপযুক্ত পাত্র কোথায় পাওয়া যাইবে রাজার ইহাই চিন্তার বিষয় হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে সভারোহণ করিয়া রাজা সভাসদ্‌গণকে বলিলেন, "সাবিত্রীকে শীঘ্রই পাত্রসাৎ করিতে হইবে। আপনারা সাবিত্রীর উপযুক্ত পাত্র অনুসন্ধান করুন।" সভাগণের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহারা সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, অনুমতি হইলে ভাট নিয়োগের ব্যবস্থা করি।"

বহুসংখ্যক ভাট সাবিত্রীর বিবাহের প্রস্তাব লইয়া নানা দেশে নানা রাজ্যে গমন করিল। আলোকসামান্য রূপবতী সাবিত্রীর বিবাহের কথা শুনিয়া অনেক রাজপুত্র মদ্রদেশে আসিলেন। কিন্তু রাজপুত্রগণ সাবিত্রীর মুখে কি এক দিব্য জ্যোতিঃ দেখিয়া সসম্ভ্রমে নতমস্তকে প্রস্থান করিলেন। রাজা অশ্বপতি এই ব্যাপারে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

রাজা একদিন রাণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "রাণি, বহু চেষ্টায় সাবিত্রীর উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেল না ; এখন কর্ত্তব্য কি বল দেখি ?"

রাণী বলিলেন, "মহারাজ, ইহা ত বড় ভাবনার কথা। এদিকে সাবিত্রী আমার দিন দিন যেরূপ হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে শীঘ্রই তাহার বিবাহ না দিলে নয়।"

অবশেষে রাজা বলিলেন, "দেখ রাজ্ঞি, আমি এক পরামর্শ করিয়াছি, এ বিষয়ে তোমার মত কি বল। আমি বহু চেষ্টায় সাবিত্রীর উপযুক্ত পাত্র ঠিক করিতে পারিলাম না। এখন আমি ইচ্ছা করিয়াছি, সাবিত্রীকে পতি নির্ব্বাচনের জন্য আদেশ করি। সে আপনিই আপনার পতি নির্ব্বাচন করিবে।"

রাণী। মহারাজ, এ অতি অসম্ভব কথা। আপনি এত চেষ্টা করিয়া সাবিত্রীর উপযুক্ত পাত্র স্থির করিতে পারিলেন না, আর সে স্বভাবকোমলা সরলা বালিকা। সে কিরূপে এতাদৃশ কার্য্য সাধন করিবে?

রাজা। রাণি, সেজন্য চিন্তিত হইও না। আমি সাবিত্রীকে তীর্থ ভ্রমণের ছলে আমার বিশ্বস্ত মন্ত্রী প্রভৃতির সঙ্গে পাঠাইব। আমার বিশ্বাস, সাবিত্রী আপনার পতি নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হইবে।

রাণী। মহারাজ, আমি অল্পবুদ্ধি নারী। এ বিষয়ে অধিক কি বলিব; আপনার যাহা ইচ্ছা সেই মতই করুন।

রাজা। রাণি, তুমি সেজন্য চিন্তিত হইও না। অরুণের সন্দর্শনেই কমলিনী প্রফুল্ল হয়। জাহ্নবীধারা মহাসাগরেই আপনার সত্তাকে বিলীন করে। সাবিত্রী যেরূপ বুদ্ধিমতী ও অভিজ্ঞা তাহাতে তাহার উপর ভর্তৃনির্ব্বাচনের ভার দেওয়া অশুভকর হইবে না। রাণি, একটা কথা জানিয়া রাখিও, দৈববরে প্রাপ্ত আমার সাবিত্রী কখনই অপাত্রে আত্মসমর্পণ করিবে না। ভবিষ্যৎ তাহার জন্য উজ্জ্বলবেশে অপেক্ষা করিয়া আছে। অকল্যাণ সাবিত্রীতে স্পর্শিবে না। মা যে আমার নারীরূপে দেবী।

রাজা ও রাণীর এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে সাবিত্রী তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। রাজা পরম সমাদরে পার্শ্বে বসাইয়া

বলিলেন, "মা, আজ তোমাকে কি জন্য ডাকিয়াছি শোন। প্রকৃতির নিয়মানুসারে যৌবনকালে পুরুষ ও স্ত্রী পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যৌবনকাল নরনারীর ভবিষ্যৎ জীবনের সাধনার প্রকৃষ্ট সময়। পুরুষ ও স্ত্রী পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এই বিপৎসঙ্কুল পৃথিবীতে সাধনার উপযুক্ত বলপ্রাপ্ত হয়। মা, তুমি এখন বয়ঃস্থা হইয়াছ। অবিলম্বে তোমার তাদৃশ পবিত্র উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য। আমি তোমাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু কোনও রাজকুমার তোমার এই অনুপম রূপজ্যোতিঃ সহ্য করিতে পারে নাই। পাণিগ্রহণাভিলাষী রাজকুমারগণ তোমার মুখের দিকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি দিয়া চাহিয়াছে কিন্তু তোমার অনুপম মাতৃত্বভাব তাহাদিগকে স্নেহ দিয়াছে; সুতরাং তাহারা ভীত মনে তোমার স্বর্গীয় মাতৃত্বকে প্রণিপাত করতঃ বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। মা, তোমার মুখখানি বিশ্বজননীর স্নেহ-কোমল মাধুর্য্যে ঢলঢল। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; সরলপ্রাণ বালকের মত তোমাকে মা বলিয়া ধন্য বোধ করিতেছি।"

সাবিত্রী বলিলেন, "বাবা, এখন আমাকে কি আদেশ করিতেছেন বুঝিতে পারিতেছি না।"

রাজা বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, তুমি নিজেই তোমার পতি-নির্ব্বাচনের চেষ্টা কর। মা, এ বিষয়ে লজ্জিত হইও না; কর্ত্তব্য বিষয়ে লজ্জা প্রশংসনীয় নহে। পর্ব্বতবাহিনী স্রোতস্বিনী আপনিই সাগরের সহিত মিলিত হয়। এই বিশ্বরাজ্যে পবিত্র প্রেমের মত নিত্য বস্তু আর কিছুই নাই। সুতরাং তোমার এই স্বয়ং পতিনির্ব্বাচনে সঙ্কুচিত হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না।"

রাজার কথা শুনিয়া সাবিত্রী অতিশয় লজ্জিতা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ললাটদেশে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম সঞ্চার হইল। রাণী তনয়ার লজ্জার চিহ্ন দেখিয়া স্নেহভরে পার্শ্বে আনিয়া তাহার কপালের

ঘর্ম্মবিন্দু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "ছি, লজ্জা কি মা, আমরা এত চেষ্টা করিয়াও যখন তোমার উপযুক্ত পাত্র ঠিক করিতে পারিলাম না, তখন আমাদের গাঢ়বিশ্বাস, যে সৌভাগ্যবান পুরুষকে বিধাতা তোমার স্বামী নির্ব্বাচন করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই তোমার পবিত্রমধুর আহ্বানের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। মা, ভ্রমর অন্য কাহারও আহ্বানে আইসে না। বিকসিত কুসুম সৌরভের সুধাস্বরে তাহাকে আহ্বান করিলে সে তৎক্ষণাৎ তথায় উপনীত হয়। মা আমার, তোমার সেই পুরুষরত্ন স্বামী তোমারই মধুর আহ্বানের অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। আশা করি, তুমি এখন আমাদের কথা বুঝিয়াছ। মা, ইহা কিছু নূতন ব্যাপার নহে। এইরূপ স্বামি-নির্ব্বাচন চিরাগত প্রথা। সতীকুলশিরোমণি সতী হিমালয়গৃহে-সাধনার আহ্বানে কৈলাসনাথ মহাদেবকে আহ্বান করিয়াছিলেন।"

সাবিত্রী মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

রাজা স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন, "মা, ইহাতে তোমার ভীত হইবার কোন কারণ নাই। আমার প্রজাগণ সুশাসিত, সামন্ত রাজগণ সখ্যবদ্ধ। তোমার সঙ্গে আমার মন্ত্রী, তোমার আদরের সঙ্গিনী ও পরিচারিকাগণ এবং আরও শতাধিক সৈন্য গমন করিবে। মা, চিন্তিত হইও না। আমি অবিলম্বে তোমাদের গমনোপযোগী যানবাহনাদির ব্যবস্থা করিতেছি।" এই বলিয়া রাজা প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করিলেন।

তখন সাবিত্রী জননীকে বলিলেন, "মা, আমি তোমাদের কথা সমস্ত বুঝিয়াছি। কিন্তু সংসার কি এতই ভীষণ যে, এখানে স্ত্রী, পুরুষের সহিত এবং পুরুষ, স্ত্রীর সহিত মিলিত না হইয়া থাকিতেই পারে না। আমি যতদিন বাঁচিব, ততদিন তোমাদের পুণ্যচরণ সেবা করিয়াই ধন্য হইব। মা, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা কিরূপে থাকিবে? আমিই বা কিরূপে থাকিব?"

রাণী তনয়ার এই সরল শিশুসুলভ কথা শুনিয়া বলিলেন, “আত্মবিস্মৃতা বালিকা, যৌবনে স্ত্রীপুরুষে মিলন বিধাতার বিধান। এই পবিত্র মিলনের জন্য পৃথিবীতে জীবস্রোত সমভাবে চলিয়াছে। পূর্ব্বকালীন মনীষিগণ নরনারীর কর্ত্তব্যের মধ্যে বিবাহ (অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষের সম্মিলন) অন্যতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মা, তুমি বিধাতার সেই পবিত্র আদেশ লঙ্ঘন করিয়া আমাদিগকে সুগভীর দুঃখে নিমগ্ন করিতে চাও ?”

জননীর কথা শুনিয়া সাবিত্রী আর কোনও কথা কহিতে পারিলেন না। মাতাপিতার আগ্রহ অধিকন্তু দুঃখ দেখিয়া সাবিত্রী সঙ্কল্প স্থির করিলেন।

রাণী তনয়ার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, ‘মা, অনেক রাত্রি হইয়াছে—বিশ্রাম করিবে চল।”

৪

পরদিন প্রাতঃকালে রাজা অশ্বপতি তনয়াকে বহুমূল্য পরিচ্ছদে সুশোভিত করিয়া সখীগণ, ধাত্রী ও বৃদ্ধমন্ত্রীর সহিত বিদায় দিলেন। সাবিত্রী মাতাপিতার চরণ বন্দনা করিয়া রথারোহণে গমন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রীর মনে নানা চিন্তা উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রকৃতির স্বতঃসৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন এবং ধাত্রী ও সখীগণকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ধাত্রী ও সখীগণ সাধ্যমত তাঁহার সেই কৌতূহল পূর্ণ করিতে লাগিল।

সাবিত্রীর রথ নানা দেশে নানা রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে এক তপোবনে প্রবিষ্ট হইল। বৃদ্ধমন্ত্রী তাহা দেখিয়া বলিলেন, “রাজকুমারি, ইহা তপোবন। এস্থানে অগ্নিকল্প মুনিগণ অবস্থান করেন, সুতরাং রথারোহণে গমন করা উচিত ও সম্ভবপর নহে।

অতএব যদি তপোবন ভ্রমণে অভিলাষ জন্মিয়া থাকে, তবে রথ হইতে অবরোহণ করুন।”

তপোবনদর্শনব্যাকুলা সাবিত্রী তৎক্ষণাৎ ধাত্রী ও সখীগণ সমভিব্যাহারে রথ হইতে অবতরণ করিলেন। প্রাতঃকালে তপোবনের কি অনির্ব্বচনীয় শোভা! সুস্নিগ্ধ সমীরণ বনপাদপের নবকিশলয়দাম কম্পিত করিয়া শালনির্য্যাসের সুগন্ধ ও পুষ্পরেণু গ্রহণপূর্ব্বক প্রবাহিত হইতেছিল। ময়ূরগণ বৃক্ষশাখায় বসিয়া মনোহর কেকারব করিতেছে, মৃগমিথুন বনপথের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া যেন তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিল। সাবিত্রী দেখিলেন, কোনস্থলে সরোবর-সলিলে নয়নমনোহর পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া সরোবরের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে। প্রভাতসমীরণ তাহাদের সৌরভ অপহরণ করিয়া চারিদিক আমোদিত করিতেছে। হংস, কারণ্ডব প্রভৃতি জলচরপক্ষী সকল সন্তরণ করিতেছে। ফলকুসুমসমিধ্ সংগ্রহার্থ মুনিবালকগণ সমবয়স্কগণের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে পুষ্পিত বনতরুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। অদূরে মুনিকন্যাগণ যজ্ঞীয় বেদী নির্ম্মাণ করিতেছেন। সাবিত্রী তপোবনের শোভা দেখিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। আজ প্রভাতারুণ সাবিত্রীর দেহলতাকে নবীন রাগে সাজাইয়া দিল। পুষ্পিত বনলতা সহর্ষে তপোবনদর্শনার্থিনী রাজকুমারীর অঙ্গে যেন পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল। মধুমত্ত দুই একটা ভ্রমর সাবিত্রীর মুখমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বৃদ্ধ মন্ত্রী সাবিত্রীর আনন্দাতিশয় দর্শন করিয়া বলিলেন, “রাজকুমারি, এ তপোবন। এখানে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। আপনি ধাত্রী ও সখীগণের সহিত স্বচ্ছন্দচিত্তে তপোবনের শোভা সন্দর্শন করুন। অনুমতি হইলে আমি নিকটস্থ তপস্বিগণের সমীপে এই আশ্রমের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তাবৎ সংবাদ অবগত হই।” রাজকুমারী

সহর্ষে বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি গমন করুন; আমি ধাত্রী ও সখীগণের সঙ্গে ঐ লতাকুঞ্জের দিকে গমন করি।"

মন্ত্রী অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলে সাবিত্রী লতাকুঞ্জের দিকে অগ্রসর হইলেন।

লতাকুঞ্জের অনতিদূরে এক নির্ম্মলতোয়া স্রোতস্বিনী বনভূমিকে শ্যামসুন্দর করিয়া ধীরবেগে চলিতেছে। তাহার সুমিষ্ট কলধ্বনি মুনিগণের বেদগানে গম্ভীরতর হইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি মুনি-কুমার পুষ্পচয়নান্তে স্রোতস্বিনী-সলিলে অবগাহনার্থ সেই দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ব্রতসংযমের মধ্যেও মুনিকুমারগণ যৌবনের মদিরস্পর্শে রহস্যপ্রিয়। স্নানার্থী ঋষিকুমারগণ নানারূপ কথোপকথন করিতে করিতে গমন করিতেছিল। সহসা একটা প্রজাপতি উড়িয়া আসিয়া এক ঋষিকুমারের দেহে উপবেশন করিল, দেখিয়া অপর এক ঋষিকুমার বলিয়া উঠিল, "ভাই সত্যবান, ঐ দেখ তোমার দেহে প্রজাপতি বসিয়াছে, তুমি অচিরেই পত্নী লাভ করিবে।" সত্যবান বলিলেন, "চল, এখন ও রহস্য রাখ। স্নান করিয়া শীঘ্র আশ্রমে প্রত্যাগত হই।" সমবয়স্ক ঋষিকুমারগণ সত্যবানকে রহস্য-বিদ্রূপে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সত্যবান সতীর্থ মুনিকুমারগণের নিকট আজ যেন কত অপরাধী।

স্নানান্তে সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করিয়া মুনিকুমারগণ আশ্রম-অভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। সকলেরই মুখে ঐ এক কথা। জগতের যত কথা—শাস্ত্রের যত মীমাংসা, সকলই আজ সত্যবানকে লইয়া আরব্ধ হইল। সত্যবান একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "তোমরা রহস্য লইয়া থাক। দেখ, কত বেলা বাড়িয়াছে; হয়ত মহর্ষি যজ্ঞ সমাধান্তে আমাদের আহ্বান করিবেন। আমি চলিলাম— তোমরা আইস।"

এই বলিয়া সত্যবান সত্বরপদে সহচরগণকে ছাড়াইয়া পড়িলেন।

এযে বড় কঠিন আহ্বান। যে আহ্বানে জগৎ চলিতেছে, বিধাতার এত বড় বিশ্বসৃষ্টি সে আহ্বানে নিয়ন্ত্রিত, সত্যবান আজ সেই আহ্বানে বাল্যসুহৃদদের নিকট হইতে সরিয়া পড়িলেন। বাস্তবিক কি আজ সত্যবান একা? একা নহে, জীবনের পথে যিনি শক্তি— কর্ম্মের রণে যিনি সফলতা—হতাশার মধ্যে যিনি সান্ত্বনা—সেই দেবী আজ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বনভূমির শ্যামল পথে দাঁড়াইয়া।

দুইটি সরল বনপথ দুই দিক হইতে আসিয়া মিলিয়াছে। অদূরে লতাকুঞ্জ। সাবিত্রী সেই স্থানে উপনীতা হইলে এক সখী বলিয়া উঠিল, "দেখ রাজকুমারি, এই স্থানটি কেমন সুন্দর। যেন বাসন্তশ্রী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বনভূমিকে শান্ত ও স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া দুইটি সরল বনপথ কেমন মিলিত হইয়াছে। সখি, মনে হইতেছে যেন ইহা প্রেম ও পবিত্রতার পুণ্যময় মিলনভূমি।" এই কথা শুনিয়া সাবিত্রীদেবী হর্ষাতিশয় প্রকাশ করিলেন—এমন সময়ে সহচরচ্যুত সত্যবান সেই পবিত্র পথদ্বয়ের সন্ধিস্থলে উপনীত হইলেন। চারি চক্ষু মিলিত হইল। উভয়ের পুলকচঞ্চল চক্ষুর পলক তিরোহিত হইল। উভয়ে ভাবিলেন, কি সুন্দর! উভয়ের হৃদয় আকুল স্পন্দনে অভিভূত হইয়া পড়িল। রাজকুমারীর লীলাচঞ্চল দৃষ্টি আনত হইল। নবীন ঋষিকুমারের রূপসাগরে সাবিত্রী ডুবিয়া গেলেন। সহসা শরীরে রোমাঞ্চ ও ললাটে স্বেদসঞ্চার দেখিয়া বর্ষীয়সী ধাত্রী সাবিত্রীর মনোভাব বুঝিয়া লইল। আর সত্যবান্—একা সত্যবান্—সেই স্থলে দাঁড়াইয়া কত কথা ভাবিতে লাগিলেন। মহর্ষির নিকট তাঁহাকে সত্বরেই যাইতে হইবে, ভুলিয়া গেলেন; ভাবিতে লাগিলেন, একি হইল, হৃদয়প্রকোষ্ঠে এ কোন্ দেবীর মৃদু নূপুরশিঞ্জন, বাসনার দ্বারে কাহার ঐ পুলকস্পর্শন!

সত্যবান্ আত্মহারা হইয়া ভাবিতেছেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে তদীয় সখা আসিয়া স্মিত অধরে বলিল, "সখে সত্যবান্, তোমার ভাবান্তর বুঝিতে পারিয়াছি। সত্বর মহর্ষির নিকট উপস্থিত হইতে হইবে বলিয়া আমাদের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছ—হঠাৎ এই পথের মধ্যে এইরূপ আত্মবিস্মৃত কেন?" সত্যবান্ প্রকৃতিস্থ হইয়া সখার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া বলিলেন, "না ভাই, ও কিছুই নয়। চল সত্বর মহর্ষির নিকট উপস্থিত হই।"

ধাত্রীও সাবিত্রীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, "রাজকুমারি আমরা কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়াছি; মন্ত্রী মহাশয় আমাদিগকে অনুসন্ধান করিবেন।" সাবিত্রী বলিলেন, "পথশ্রমে আমি বড়ই কাতরা হইয়া পড়িয়াছি। আমার একটু বিশ্রামের আবশ্যকতা হইয়াছে।

সখীগণপরিবৃতা রাজকুমারী অরণ্যপথে আসিতে আসিতে কত কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই কলহাস্য, স্বচ্ছন্দ সম্ভাষণ কেমন সংযত হইয়া পড়িল। সখীগণের কথার ঠিক উত্তর দেওয়া এখন তাঁহার সাধ্যাতীত।

আসিতে আসিতে এক সখী বলিল, "রাজকুমারি, অদূরে ঐ ঘনকৃষ্ণ মেঘমালা সদৃশ পর্ব্বতের গাত্রলগ্ন পাষাণগুলি কত রুক্ষ। দেখ, তাহাতে যেন কোমলতার লেশ মাত্র নাই।" সাবিত্রী বলিয়া উঠিলেন,—"আহা কি সুন্দর—কি মধুর!"

সখী সাবিত্রীর মুখ হইতে এইরূপ অসম্ভব উত্তর শুনিয়া বলিল, "কি সখি, এ কি অসম্ভব উত্তর? রুক্ষ পাষাণ দেহে তুমি সৌন্দর্য্য বা মাধুর্য্যের কি আভাষ পাইলে?" সাবিত্রী বলিলেন, "কি বলিতেছিলে, আমি বেশ শুনিতে পাই নাই।" সখী সাবিত্রীর চিন্তার কারণ বুঝিতে পারিয়া সরল মুখখানি হাসির আভায় উজ্জ্বল করতঃ বলিল, "ঐ যে মন্ত্রী মহাশয় আসিতেছেন।" ধাত্রীর সঙ্কেতে রহস্যালাপ বন্ধ হইল।

মন্ত্রী আসিয়া স্নেহভরে বলিলেন, "রাজকুমারি, এ আশ্রমটি বড় সুন্দর। আমি আশ্রমে মুনিগণের বসতি স্থান দর্শন করিয়া আসিলাম। আহা, এ স্থানটি কি শান্তরসাস্পদ! সাবিত্রী বলিলেন, "মন্ত্রিবর, আমার ইচ্ছা, একবার মুনি ও মুনিপত্নীগণের চরণ দর্শন করিয়া যাই।"

"মন্ত্রী বলিলেন, "রাজকুমারি, চল ঐ তপোবনে আজ আতিথ্য গ্রহণ করিব।" সখীগণপরিবৃতা সাবিত্রী তপোবন ও মুনিগণকে দেখিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইয়াছিলেন। তাই ত্বরিতপদে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ধাত্রী ও মন্ত্রী একটু পশ্চাতে পড়িয়া গেলেন।

ধাত্রী বলিল, "মন্ত্রী মহাশয়; আমাদের যাত্রা সুসিদ্ধ হইয়াছে। আমরা যে গুরুভার লইয়া রাজপুরী হইতে আসিয়াছিলাম তাহা পূর্ণ হইয়াছে, সাবিত্রীর বর জুটিয়াছে"—এই বলিয়া ধাত্রী বনপথের সেই ঘটনা বিবৃত করিল।

মন্ত্রী বলিলেন, "যদি রাজকুমারী কোন ঋষিকুমারের প্রতি অনুরাগবতী হন তবে আমাকে তাঁহার পরিচয় লইয়া যাইতে হইবে।" ধাত্রী অগ্রগামী ঋষিকুমারদ্বয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ যে উন্নতবপু সুকুমার ঋষিপুত্রটিকে দক্ষিণ পার্শ্বে দেখিতেছেন, ঐ ভাগ্যবান্ সাবিত্রীর হৃদয়রাজ্যের দেবতা।" মন্ত্রী বলিলেন, আমাদিগকেও ঐ দিকে যাইতে হইবে।"

অবিলম্বে তাঁহারা তপোবনে উপস্থিত হইয়া যোগাসীন অন্ধ মুনি ও মুনিপত্নীর চরণ বন্দনা করিলেন। মন্ত্রী মুনিকে বলিলেন, মদ্ররাজ অশ্বপতির দুহিতা সাবিত্রীর প্রণাম গ্রহণ করুন।"

রাজকন্যা সাবিত্রী তাঁহাদের আশ্রমে আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত পুলকিত হইয়া রাজকুমারীর উপর আশীর্ব্বচন বর্ষণ করিলেন।

অন্ধমুনি যথাবিধি স্বাগত প্রশ্নাদির পর কুটীরমধ্যস্থ সত্যবানকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "সত্যবান্, আমাদের আশ্রমে আজ রাজদুহিতা, রাজমন্ত্রী, রাজকন্যার ধাত্রী ও সখীগণ অতিথি। বৎস, ইঁহাদের আতিথ্যের যেন কোন ত্রুটি না হয়।"

সত্যবান্ বনপথ-দৃষ্টা রাজকুমারীকে অবলোকন করিয়া সোৎসাহে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

মদ্ররাজতনয়া তপোবনে আসিয়াছেন শুনিয়া সেই আশ্রমবাসী মুনিগণ অত্যন্ত পুলকিত হইয়া রাজকুমারীকে দেখিবার জন্য একে একে রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের আশ্রমে আসিতে লাগিলেন।

ক্রমে মুনিকন্যাগণের সহিত সাবিত্রীর বেশ প্রণয় হইয়া গেল। সাবিত্রী মুনিকন্যাগণের পবিত্রতাময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। স্বভাবসরলা ঋষিবালিকারা সাবিত্রীর নিকট আগমন করতঃ তাঁহাকে লইয়া বনভূমির নানা প্রদেশ দেখাইতে লাগিল। সাবিত্রী সেই উন্মুক্ত উদার হরিৎ প্রান্তর, দিগন্তবিস্তৃত অরণ্যানী বিরাটগম্ভীর পর্ব্বতমালা ও বিবিধ বিহঙ্গকূজিত পবিত্র বনভূমি দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিলেন। মনে করিলেন, ইহা কি স্বপ্নের রচনা, কিংবা কোনও অপ্রত্যক্ষীভূত অমরাবতী, অথবা ইহা পবিত্রতার নিভৃত নিকেতন। আহা, এই সরলপ্রাণ বালিকারা যেমন পবিত্রতার সজীব ছবি—আর এই আশ্রমবাসিনী মুনিপত্নীগণ যেন উন্মুক্ত স্বাধীনতার জীবন্ত মূর্ত্তি। ভাবিতে ভাবিতে সাবিত্রী যেন এক অপূর্ব্ব পুলকাবেশে বিভোর হইয়া পড়িলেন।

সাবিত্রী ঋষিবালিকাগণের সহিত আশ্রমে আসিয়া মন্ত্রীকে তাঁহার তপোবন-দর্শন ব্যাপার বলিতেছেন, এমন সময়ে সত্যবান্ তথায় আসিয়া সবিনয়ে বলিলেন, "আমরা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, রাজপরিবারের অভ্যর্থনা করি এমন কোন দ্রব্য আমাদের নাই, অন্নপানীয়ও রাজোচিত নহে। তথাপি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের যত্নসংগৃহীত

দেবোদ্দিষ্ট বন্য ফলমূল গ্রহণ করুন।" মন্ত্রী প্রভৃতি ঋষিকুমারের সরলতা ও দীনতায় মুগ্ধ হইয়া সেই প্রসাদ গ্রহণ করতঃ ধন্য হইলেন।

নানা কথাবার্ত্তায় মধ্যাহ্ন অতিবাহিত হইল। ক্রমে পশ্চিম আকাশের ললাটে রক্ততিলক পরিয়া গোধূলি সমুপস্থিত হইলে ঋষিকুমারগণ সান্ধ্য আরতির সমবধান করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। হোমানল প্রজ্বলিত হইল। ঋষিকুমারগণ সমস্বরে সন্ধ্যাবন্দনা পাঠ করিতে লাগিলেন। তপোবনের সেই সান্ধ্যশোভা, কাননিবাসী পক্ষিকুলের কলগীতি, ঋষিকুমারগণের প্রাণস্পর্শী সান্ধ্যস্তোত্র শুনিয়া সাবিত্রীর প্রাণ যেন কোন্ এক মায়াময় রাজ্যে উপনীত হইল। সাবিত্রী মুদিতনেত্রে সত্যবানের সুমধুর বেদগান শুনিয়া আত্মহারা হইলেন। ভাবিলেন, এ স্বর কখনই মনুষ্য-কণ্ঠ-সমুদ্ভূত নহে। ইহা তাঁহার হৃদয়-রাজ্যের দেবতার মধুর প্রেমগান। পুলকবিহ্বল নেত্রে সাবিত্রী সত্যবানের বরবপু নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মদিরেক্ষণার নির্ণিমেষ দৃষ্টি সত্যবানের মুদ্রিত অক্ষিপ্রান্তে বিলসিত হইতে লাগিল। মন্ত্রী ইহা দেখিয়া পুলকিত হইলেন। ধাত্রীও দেখিল. রাজকুমারীর অনুরাগ-দৃষ্টি সত্যবানের উপর। সাবিত্রীর সঙ্গিনীগণও তাঁহার এই ভাব প্রত্যক্ষ করিলেন। দেবতার প্রতি বদ্ধদৃষ্টি যোগিনী ইহা বুঝিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যাবন্দনান্তে সত্যবান্ রাজ-অতিথিগণকে আরতির প্রদীপ দেখাইলেন। যখন সেই আরতির প্রদীপ সাবিত্রীর নিকট উপস্থিত হইল, তখন সত্যবানের হস্ত যেন কাঁপিয়া উঠিল। সত্যবানের প্রেমপূজার অর্ঘ্যপুষ্প ও আরতির আলোক সাবিত্রীকে তৃপ্ত ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

সাবিত্রী মুনিগণের মুখ হইতে নানা উপদেশ ও শাস্ত্রকথা শুনিতে শুনিতে নিদ্রিতা হইয়া পড়িলেন। ধাত্রী তাঁহার শয্যারচনা করিয়া দিল। মন্ত্রীপ্রভৃতিও উপযুক্ত স্থানে শয়ন করিলেন।

প্রভাতে উঠিয়া সাবিত্রী মুনি ও মুনিপত্নীগণকে প্রণাম করিলেন। মুনিতনয়াগণ সাবিত্রীর সেই এক দিনের সখীত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রাণ কিছুতেই সাবিত্রীকে ছাড়িতে চাহিতেছিল না। অশ্রুসজলনেত্রে সাবিত্রী তপোবন হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অবিলম্বে রথে অশ্ব সংযত হইল। সাবিত্রী রথে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে মনে হইল, ঋষিকুমারকে প্রণাম করা হয় নাই। তখনই তিনি প্রত্যুদ্গামী সত্যবানের নিকট উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "দেব, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। মুনিবালিকাগণের বিরহ-দুঃখে অভিভূত হইয়া আমি একটু আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম। আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।" সত্যবান্ কোন কথা কহিতে পারিলেন না, মনে মনে বলিলেন, "তোমার বাসনা পূর্ণ হউক।"

মন্ত্রী রাজতনয়ার এই অনুরাগসঞ্জাত ত্রুটি দেখিয়া সকলই বুঝিতে পারিয়া সহর্ষে রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, এবার কোন্ তীর্থে গমন করিবে?" সাবিত্রী বলিলেন, "বহুদিন মাতাপিতার চরণ দর্শন করি নাই, বিশেষতঃ আশ্রম পর্য্যটনে আমার বড় ক্লান্তি বোধ হইয়াছে, অতএব আর কোন তীর্থে যাইবার প্রয়োজন নাই। চলুন রাজপুরীতে ফিরিয়া যাই।"

মন্ত্রীর আদেশে সারথি মদ্ররাজ্যাভিমুখে অশ্ব পরিচালিত করিল।

৫

রাজা অশ্বপতি রাজসভাসীন। বিচারপ্রার্থিগণ করজোড়ে দূরে দণ্ডায়মান। মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় রাজা অশ্বপতি বিচারকার্য্যে প্রবৃত্ত আছেন। এমন সময়ে এক প্রতিহারী আসিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ, প্রধান অমাত্য মহাশয় রাজকুমারীর সহিত মদ্ররাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন।" রাজা শুনিয়া অতিশয় পুলকিত হইয়া

উঠিলেন এবং প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই প্রধান অমাত্যের আগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অবিলম্বে প্রধান অমাত্য আসিয়া রাজাকে অভিবাদন করিলেন। রাজা সমুচিত সমাদরে অমাত্যকে নিকটে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রিবর, সব কুশল ত? মা সাবিত্রী দেশভ্রমণে ত ক্লান্তি বোধ করে নাই?" মন্ত্রী কুশলবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিলেন।

ক্ষণকাল পরে রাজা বলিলেন, "মন্ত্রিন্, যে গুরুভার লইয়া আপনাদের দেশভ্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার কি কিছু হইয়াছে?" মন্ত্রী সহর্ষে উত্তর করিলেন, হাঁ মহারাজ, রাজকুমারী পতি নির্ব্বাচন করিয়াছেন। যদিও আমি তাঁহার মুখ হইতে এসম্বন্ধে কোন কথা শুনি নাই তথাপি দেখিয়াছি, একটি নবীন যুবাপুরুষকে দেখিয়া রাজকুমারী তাঁহার প্রতি অনুরাগ-লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন।"

রাজা মন্ত্রীর মুখ হইতে সাবিত্রী উপযুক্ত পতিনির্ব্বাচন করিয়াছে শুনিয়া অতীব প্রীত হইলেন এবং মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রিবর, সাবিত্রী যাঁহার প্রতি অনুরাগবতী, নিশ্চয়ই আপনি তাঁহার পরিচয় জানিয়াছেন।" অমাত্য বলিলেন, "মহারাজ, রাজকুমারী শাল্ব রাজ্যের রাজা দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানের প্রতি অনুরাগবতী হইয়াছেন। মহারাজ, সত্যবান্ সুরূপসুন্দর যুবা পুরুষ। তাঁহার সেই কোমল দেহে ঋষিবেশ ও ব্রহ্মচর্য্যজনিত লাবণ্য কত সুন্দর।"

রাজা শুনিয়া রাজকুমার সত্যবানের ঋষিবেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ, রাজা দ্যুমৎসেন এখন বৃদ্ধ। প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ হইল তাঁহার রাজ্য শত্রুকর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। দ্যুমৎসেন হৃতরাজ্য ও দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া বিপাশাতীরস্থ বশিষ্ঠ আশ্রমে তপস্যা করিতেছেন। রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের একমাত্র পুত্র সত্যবান্ ধনুর্ব্বেদে বিশেষ পারদর্শী; তাঁহার উন্নত দেহ, বিশাল বক্ষ, মাংসল স্কন্ধ, আজানুলম্বিত বাহু, প্রশস্ত ললাট ও কমনীয় কলেবরে

ক্ষাত্রধর্ম্মের সহিত অপূর্ব্ব ব্রহ্মতেজ সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। মহারাজ, সর্ব্ব বিষয়ে সত্যবান্ সাবিত্রীর যোগ্য। কিন্তু দারুণ দৈন্য এ বিষয়ে একটু বাদ সাধিয়াছে; তবে ইহাও সত্য যে, অমৃতসাগরের তীরে কেহ পিপাসিত থাকিতে পারে না—কল্পপাদপের নিকট কেহ অর্থাভাব জনিত কষ্টে কালাতিপাত করে না। মহারাজ, আপনি সাবিত্রীকে সত্যবানের করে সম্প্রদান করুন।"

মদ্ররাজ মন্ত্রীর মুখ হইতে সত্যবানের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইলেন। ভাবিলেন, সাবিত্রীর সহিত শুভ পরিণয়ে নিশ্চয়ই সত্যবানের অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। আলোকোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকার বিদূরিত হয়। শুষ্ক দগ্ধ ধরণী বর্ষার বারিধারায় নব নব তৃণে শ্যামায়িত হইয়া উঠে। সৌভাগ্যলক্ষ্মীর আগমনে সত্যবানের গৃহ আলোকিত হইবে, তাঁহার দৈন্য দূর হইবে।

রাজা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, সভাসদ্‌গণ সাবিত্রীর ভর্তৃনির্ব্বাচন প্রসঙ্গ লইয়া পরস্পর জল্পনা কল্পনা করিতেছেন, এরূপ সময়ে দেবর্ষি নারদ রাজসভায় আগমন করিলেন। রাজা আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পরম সমাদরে তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইলেন। কুশল প্রশ্ন ও স্বাগত জিজ্ঞাসার পর রাজা অশ্বপতি দেবর্ষি নারদকে সাবিত্রীর পতিনির্ব্বাচনের কথা বলিলেন। নারদ শুনিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইয়া সত্যবানের কুলশীলের যথেষ্ট প্রশংসা করতঃ বলিলেন, "রাজন, সত্যবান্ সর্ব্ব বিষয়ে সাবিত্রীর উপযুক্ত স্বামী সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে আমি বড় অকুশল দেখিতেছি।" রাজা চমকিত হইয়া বলিলেন, "দেবর্ষে, আপনি ইহাতে কি অকুশল দেখিতেছেন?" দেবর্ষি বলিলেন, "মহারাজ, সত্যবান্ অতি অল্পায়ুঃ—অদ্য হইতে ঠিক এক বৎসর পরে সত্যবান্ কালগ্রাসে পতিত হইবে।"

রাজা অতি ব্যাকুল হইলেন। মন্ত্রী ও সমুপস্থিত সভাসদ্‌বৃন্দের মুখমণ্ডল যেন বিষাদের কালিমায় আবৃত হইল। রাজা বলিলেন,

"দেবর্ষে, এখন উপায় ?" দেবর্ষি বলিলেন, "মহারাজ, উপায় আর কি ? সাবিত্রীকে অন্য পাত্রে সম্প্রদান করুন।" এই বিষয়ে নানা অনুকূল প্রতিকূল জল্পনা তখন সভাসদ্‌গণের আলোচ্য হইল। রাজা অত্যন্ত দুঃখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে রাজসভা হইতে অন্তঃপুরের প্রবেশ-দ্বারে নূপুরশিঞ্জন শ্রুত হইল। রাজা চাহিয়া দেখিলেন, সাবিত্রী আসিতেছেন।

সাবিত্রী সভাপ্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে অগ্নিকল্প তেজস্বী মুনিবরকে প্রণাম করিয়া পিতৃচরণ স্পর্শ করিলেন এবং মন্ত্রী ও সভ্যগণকে অভিবাদন করিলেন। রাজা পরম সমাদরে তনয়াকে পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, "মা, পথশ্রমে ত ক্লান্তি বোধ কর নাই ?" সাবিত্রী বলিলেন, "না বাবা, আমি বেশ সুখে ছিলাম। মন্ত্রিমহাশয়ের আদরে, ধাত্রীমার যত্নে এবং ভৃত্যবর্গের আজ্ঞানুবর্ত্তিতায় আমার কোন কষ্টই হয় নাই। প্রত্যহ নূতন নূতন স্থানের প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া চরিতার্থ হইয়াছি, কিন্তু বাবা, মধ্যে মধ্যে আপনাদের জন্য আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিত।" রাজা রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "মা, আমিও এই মঙ্গলময়ীর অমঙ্গল কল্পনায় প্রতিমুহূর্ত্ত অস্থির হৃদয়ে অতিবাহিত করিয়াছি।"

সাবিত্রী রাজার চক্ষে জলধারা ও তাঁহার মুখখানি বিষাদমলিন দেখিয়া ব্যগ্রহৃদয়ে বলিলেন, "বাবা, আজ আপনার এই বৈকল্যের কারণ কি ? আপনি আমাকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসেন, আমাকে দেখিলে আপনার সমস্ত দুঃখ দূর হয়, তবে আপনি কি জন্য আমাকে পার্শ্বে দেখিয়াও অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতেছেন ?" রাজা অশ্বপতি একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "মা আমার—আমার প্রাণপুত্তলি, দেবর্ষির মুখ হইতে তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের ভীষণ কথা অবগত হইয়া আমার প্রাণ বিকল হইয়া উঠিয়াছে—আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি।"

সাবিত্রী রাজার এইরূপ কাতরতা দেখিয়া গভীর সন্দেহে আকুল হইতে লাগিলেন; ব্যগ্রহৃদয়ে বলিলেন, "বাবা, আপনি দেবর্ষির মুখ হইতে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কি ঘোর দুঃখজনক কথা অবগত হইয়াছেন বলুন? যদি এখন প্রতিকারের কোন উপায় থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে পারি।" রাজা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন।

সাবিত্রী স্বীয় ভবিষ্যৎ জীবনের অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য যত্নবতী হইবেন শুনিয়া দেবর্ষির প্রাণে একটু বিষাদের সঞ্চার হইল। তিনি যে কঠোর পরীক্ষার জন্য আজ বেদমাতা সাবিত্রীদেবীর অংশসম্ভূতা মদ্ররাজদুহিতার ভবিষ্যৎ জীবনের ঘোর চিত্র দেখাইয়াছেন, আশঙ্কা—পাছে পিতৃনির্ব্বন্ধে বা স্বার্থচিন্তায় রাজনন্দিনী সেই পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণা হন। দেবর্ষি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

রাজা বলিলেন, "মা, সর্ব্বপ্রকারে গুরুজনের প্রিয়াচরণই পুত্র কন্যার উচিত। তুমি আমার সুশীলা তনয়া। আশা করি, আমার কথাটি একটু ভাল করিয়া বুঝিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিবে। তুমি বশিষ্ঠাশ্রমে শাল্বরাজ দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান্‌কে অবলোকন করিয়াছ; সত্যবান্ রূপ-গুণে কুলশীলে তোমার যোগ্য হইলেও একটি দোষে সব অনর্থ হইয়াছে। মিলনের সমীপদেশেই অকুশল তাহার কালচিত্র তুলিয়া রহিয়াছে।"

সাবিত্রী বিনীত স্বরে বলিলেন, "পিতঃ, আপনি ইহাতে কি অকুশল দেখিতেছেন?"

রাজা বলিলেন, "মা, দেবর্ষি বলিতেছেন, সত্যবান্ আদর্শপুরুষ হইলেও অতি অল্পায়ুঃ—আজ হইতে ঠিক এক বৎসর মাত্র সত্যবানের পরমায়ুঃ।"

শুনিয়া সাবিত্রীর দেহ কম্পিত হইল, তাঁহার মুখখানি শুষ্ক হইয়া গেল। তাঁহারই এই ভবিষ্যৎ চিত্র অনুভব করিয়া রাজা আকুল হইয়াছেন ভাবিয়া সাবিত্রী কাতরা হইলেন।

বিষম পরীক্ষা! রাজতনয়ার অন্তকার উক্তি যে, উত্তরকালে রমণীসমাজের উজ্জ্বল আলেখ্যরূপে বিদ্যমান থাকিবে। বেদমাতা সাবিত্রীর বরপুত্রী এই মদ্ররাজদুহিতা কিরূপে সতীধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, কিরূপে তিনি এই ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইবেন, দেবর্ষি ইহাই ভাবিতে লাগিলেন।

সাবিত্রীদেবী উত্তরকালীন রমণীকুলের এক গৌরবজনক আদর্শ রাখিবার জন্যই যে এই বালিকার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কিরূপে এই রাজ দুহিতার দ্বারা সেই কঠিন কার্য্য সাধন করাইবেন,—এই রাজতনয়াই নারীত্ব ও মাতৃত্বের উজ্জ্বল আদর্শরূপে বিদ্যমান থাকিবে —আজ এই বালিকার উক্তিই তাঁহার আশালতার মূলে কুঠার বা সুধাধারার মত কার্য্য করিবে ভাবিয়া দেবর্ষি উদ্বিগ্নহৃদয়ে কালাতি-পাত করিতে লাগিলেন।

অশ্বপতি আকুল হৃদয়ে বলিলেন, "আমি জানিয়া শুনিয়া এরূপ অল্পায়ুঃ ব্যক্তির হস্তে আমার জীবনাধিকা কন্যাকে সম্প্রদান করিতে পারি না।"

বিষম সমস্যা! একদিকে পিতার আদেশ লঙ্ঘন, অন্যদিকে নারীত্ব বর্জ্জন! এই উভয় চিন্তায় সাবিত্রী অস্থির হইয়া পড়িলেন। নারীর নারীত্ববর্জ্জনের মত অসাধ্য সাধন আর নাই, এই ভাবটি সাবিত্রীর প্রাণে উদগ্র হইয়া উঠিল।

সাবিত্রী ব্যগ্র হৃদয়ে বলিলেন, "বাবা, আমি কখনও আপনার মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করি নাই, কখনও আপনার সম্মুখে আমার স্বাধীন মন্তব্য প্রকাশ করি নাই। কিন্তু এক গভীর কর্ত্তব্যজ্ঞানের বশীভূত হইয়া আজ আপনার নিকট আমার নিবেদন এই যে, আপনি যাহা বলিতেছেন আমি তাহা স্বীকার করিতে পারিতেছি না। বাবা, আপনিই আমায় বলিয়াছেন, 'রমণীর ভ্রমণ-পথ তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারের উপর। একনিষ্ঠ রমণী জাহ্নবীধারার ন্যায় পবিত্র,

প্রত্যেক নারী বিশ্বমাতার স্নেহসুধায় আত্মহারা জননী, সংসারে নারীই ভগবানের প্রকৃষ্ট অবদান।' বাবা, আমি আপনার মত আদর্শ দেবতার তনয়া হইয়া, সতীকুলকমলিনী মালবীদেবীর গর্ভজাত হইয়া নারীর উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইব? আপনি স্নেহদৃষ্টিতে অন্ধ হইয়া আমার সেই অধঃপতন দেখিতে পারিবেন?

'সকৃদংশো নিপততি সকৃৎকন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ॥
দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোঽহ পিবা।
সকৃদ্বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম॥
মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে।
ক্রিয়তে কর্ম্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ॥'

ওগো পিতা, অংশত্যাগ, কন্যাদান আর,
দিলাম এ কথা বলা, হয় একবার।
দীর্ঘজীবী অল্পজীবী কুরূপ সুন্দর,
সগুণ নির্গুণ কিংবা কিরূপ অন্তর—
সে বিচার করিবার নহে এ সময়,
সেই মোর পতি যারে বরেছে হৃদয়।
উপেক্ষিতে নারি আমি সেই দেবতায়,
সতীত্বধর্ম্মের সে যে ঘোর অন্তরায়।
মনেতে নিশ্চয় করি বাক্যেতে কথন,
কার্য্যে অনুষ্ঠান শেষে; প্রমাণ এ মন।"

সাবিত্রীর এই উক্তি শ্রবণ করিয়া দেবর্ষির হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, আশৈশব বিলাসকলার মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াও কুসুমকোমলা সাবিত্রীর হৃদয় কর্ত্তব্যকঠোর; সাবিত্রী ভবিষ্যৎ জীবনের অশুভকে বরণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। দেবর্ষি সাবিত্রীর সেই

নারীসুলভ কোমলতার মধ্যে এতাদৃশী দৃঢ়তা দেখিয়া প্রীত হইলেন। বুঝিলেন, কোমলা বালিকা একনিষ্ঠার বলে অমঙ্গল-অন্ধকারের মধ্যে মঙ্গলের কিরণ প্রতিফলিত করিয়া নারীত্বের ইতিহাসে এক নবযুগের অবতারণা করিবে।

মদ্ররাজ অদূর ভবিষ্যতে সাবিত্রীর অন্ধকারময় বৈধব্যজীবন কল্পনা করিয়া চারিদিক শূন্যময় দেখিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এই আনন্দময়ী বালিকাকে জানিয়া শুনিয়া কিরূপে এমন দুঃখের ভীষণ আহবে নিক্ষেপ করিব! পরিশেষে তিনি কাতরে বলিলেন, "মা সাবিত্রি, আমার স্নেহের সাবিত্রি, ঈদৃশ বিষম সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। আমি তোমার সরল হাস্যপুলকিত মুখখানি বিষাদকাতর দেখিতে পারিব না। আমাকে সে শোকদৃশ্য দেখাইও না। আরও দেখ, তুমি এখনও সম্প্রদত্তা নহ। কারণ, তনয়া শৈশবে মাতাপিতার অধীন, সুতরাং তুমি এখন অন্যকে হৃদয় দান করিতে পার না। সে অধিকার তোমার নাই।"

সাবিত্রী। বাবা, আমি অল্পবুদ্ধি বালিকা, এবিষয়ে কোনও যুক্তিজাল প্রদর্শন করি আমার এরূপ ক্ষমতা নাই। তবে একটি নিবেদন এই যে, আমার এই ভর্তৃ-নির্ব্বাচন, ইহা ত আপনাদের আদেশ অনুসারেই হইয়াছে। এক্ষণে আমি যাঁহাকে হৃদয়ের দেবতা ভাবিয়াছি, তিনিই আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তিনি অল্পায়ুঃ বা দীর্ঘায়ুঃ হউন সে বিবেচনা করা এখন সতীধর্ম্মের অন্তরায়। পিতঃ, ক্ষমা করুন, আমাকে এরূপ আদেশ করিবেন না। আমার হৃদয়ের দেবতার পরমায়ুঃ আর এক বৎসর বলিতেছেন, কিন্তু তাহা না হইয়া যদি একদিনও হইত, তাহা হইলেও তাঁহার প্রতি আমার অনুরাগ ত্যাগ করা অকর্ত্তব্য। বাবা, আমার জীবনদেবতাকে যদি এই জীবনে প্রীতি দিয়া সুখী করিতে পারি তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই মৃত্যুর পর পারে

গমন করিয়া আমার হৃদয়ের ভক্তি ও অনন্যনির্ভরতা পাইয়া তৃপ্ত হইবেন। প্রেমের নিষ্ঠাই রমণীর শ্রেষ্ঠ ব্রত। একনিষ্ঠ রমণী পবিত্রতার অনাঘ্রাত কুসুমমালা। সামান্য পার্থিবজীবনের মোহে পড়িয়া আমি বাঞ্ছিত দয়িতের প্রতি নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া হতশ্রী বিলাসকুসুমে পরিণত হইব? পিতঃ, ত্রিদিবে যে কুসুমের শোভা তাহাকে ধরণীর ধূলিস্পর্শে বিমলিন হইতে আদেশ করিবেন না। আরও দেখুন, মৃত্যুই জীবনের অবসান নহে; আপনারই মুখে শুনিয়াছি, মৃত্যুর পরে অমৃতলোকে নরনারীর অনন্ত মিলন। সে রাজ্যে পাপ নাই, তাপ নাই, বাসনার উদগ্র জ্বালা নাই। কেবল শান্তি—কেবল তৃপ্তি। বাবা, আমার হৃদয়দেবতা যদি বৎসরান্তেই এই ধরণী ত্যাগ করিয়া অমরলোকে গমন করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি জীবনাবসানে সেই মহাপুরুষের সহিত মিলিত হইতে পারিব। সে ভরসা আমার আছে। পিতঃ, সেই পবিত্র রাজ্যে বিধাতার অভিশাপ নাই। সে রাজ্যে আমাদের বিরহ ঘটিবে না। সুতরাং আমাকে ঈদৃশ অনুরোধ করিবেন না।

রাজা অশ্বপতি তনয়ার কথা শুনিয়া সমস্ত বুঝিলেন। তাঁহার হৃদয় হইতে বিষাদের মেঘ কাটিয়া গেল। কর্ত্তব্যের অরুণ-কিরণ সম্পাতে তাঁহার হৃদয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি তনয়ার এক-নিষ্ঠায় প্রীত হইয়া বলিলেন, "মা, তুমি আমার তত্ত্বজ্ঞানবতী একান্ত স্থিরবুদ্ধি তনয়া। পার্থিব জীবনের দুঃখদুর্দ্দশা ভাবিয়া তোমাকে আর ঈদৃশ অনুরোধ করিব না। মা, বিষাদ ত্যাগ কর। তোমার বাসনা অচিরেই পূর্ণ হইবে।"

এতক্ষণ দেবর্ষি নীরবে কন্যা ও পিতার কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। সাবিত্রীর পতিপরায়ণতা ও অশ্বপতির ঔদার্য্য দেখিয়া তিনি অত্যন্ত

সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার বীণার তারে ঝঙ্কার উঠিল। যেন সেই অপূর্ব্ব ঝঙ্কার পার্থিব কোলাহল ত্যাগ করিয়া সঙ্গীততানমুখরিত দেবলোকে উপস্থিত হইল।

দেবর্ষি বলিলেন, "মহারাজ, তোমার এই ভুবনমোহিনী কন্যার অন্তঃসৌন্দর্য্যে এই ধরণী পবিত্র হইবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তোমার কন্যা মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা। ইঁহার নিকটে অমঙ্গল আসিতে পারিবে না। মদ্ররাজ, সৌরকিরণের নিকট যেমন অন্ধকার আসিতে পারে না, তদ্রূপ এই অলৌকিক সতীত্বকিরণমণ্ডিতা দেবীপ্রতিমার নিকট পার্থিব কোন কালিমা আসিবে না। আর এই পবিত্রতার জাহ্নবীধারা পর্ব্বতপ্রমাণ বাধায় ব্যাহত না হইয়া শান্তোদার বিশাল মহাসাগরেই বিলীন হইবে।"

এই বলিয়া দেবর্ষি সাবিত্রীকে সস্নেহে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "মা, আশীর্ব্বাদ করি তোমার সতীত্বশোভা অক্ষুণ্ণ হউক এবং তুমি উত্তরকালীন রমণীসমাজের অত্যুজ্জ্বল আদর্শরূপে বিদ্যমান থাক। বৎসে, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাসে তোমার গৌরবপূত কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে আলিখিত থাকিবে।"

মহর্ষি পুলকিতপ্রাণে বীণাবাদন করিতে করিতে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। রাজা অশ্বপতি তনয়াকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া পার্শ্বে বসাইলেন। সভাসদ্‌বর্গ সাবিত্রীর একনিষ্ঠায় সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। রাজা অশ্বপতি বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া সেদিন সভাভঙ্গের আদেশ দিয়া সেই অপূর্ব্ব ব্রততেজোমণ্ডিতা তনয়া সহ অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

৬

মহারাণী মালবীদেবী আজ সভাভঙ্গের এত বিলম্ব দেখিয়া চিন্তিতা ছিলেন। সহসা রাজা ও প্রাণাধিকা তনয়াকে সম্মুখে দেখিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আজ এত বিলম্বে সভাভঙ্গের কারণ কি ?"

রাজা বলিলেন, "রাজ্ঞি, আজ দেবর্ষি নারদ রাজসভায় আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত সাবিত্রীর বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছিল ; সেইজন্য এত বিলম্ব।"

এই বলিয়া রাজা রাণীকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বিবৃত করিলেন। রাণী সহর্ষে সাবিত্রীর মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "মা আমার, তোমার মত তনয়াকে গর্ভে ধারণ করিয়া আমি নিজেকে ধন্য বোধ করিতেছি। তোমার বাসনা অপূর্ণ থাকিবে না। তুমি আমার দ্যুলোকবাসিনী ব্রহ্মাণীর আশীর্ব্বাদের ফল। মা, তোমার স্বর্গীয় পাতিব্রত্যে পৃথিবী গৌরবান্বিত হউক।" সাবিত্রী বিনম্রবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজা ভাবিলেন, 'আমি ধন্য, এই দেবী-কল্পা পত্নী, শক্তিস্বরূপিণী পবিত্রতাময়ী তনয়া লাভ করিয়া আমি চরিতার্থ হইয়াছি।'

রাজা বলিলেন, "মহিষি, রাজর্ষি দ্যুমৎসেন এখন বনবাসী। সুতরাং তিনি এখন রাজ-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পুত্রের বিবাহ দিতে মদ্ররাজ্যে আসিতে পারিবেন না। এই জন্য ইচ্ছা করিয়াছি, সামান্য কয়েকজন অনুচর ও প্রধান ঋত্বিক মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের আশ্রমেই আমি সাবিত্রীকে সত্যবানের হস্তে সমর্পণ করিয়া আসি।"

রাণী সম্মতি প্রকাশ করিলেন। রাজা অশ্বপতি, সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর শুভ পরিণয়ে অভিলাষী হইয়া বশিষ্ঠাশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

রাজর্ষি দ্যুমৎসেন রাজা অশ্বপতির সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "মদ্ররাজ, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক যে মদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন ইহাতে আশ্রমের গৌরববৃদ্ধি হইল। দৈববশে আমি

অন্ধ। আপনার পবিত্র মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না। আমি মানস-নেত্রে আপনার মনোজ্ঞ মূর্ত্তি সর্ব্বদাই সন্দর্শন করিয়া থাকি।"

অতঃপর রাজর্ষি রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "আপনার সুশীলা তনয়া সেদিন আমার এই আশ্রমে আসিয়াছিলেন। মা আমার নারীরূপে দেবী। তাঁহার শাস্ত্রানুরাগ ও সবিনয় ব্যবহার আমাকে মোহিত করিয়াছে। আমার পত্নী বলেন, 'মানবীতে এত-রূপ সম্ভবে না। গুণেও তিনি সরস্বতীর তুল্যা।' মদ্ররাজ, আপনার সেই মমতাময়ী তনয়ার কুশল ত ?"

রাজা শুনিয়া সহর্ষে বলিলেন, "আপনাদের অনুগ্রহে রাজ্যের সম্পূর্ণ মঙ্গল, আমার তনয়াটিরও কুশল।

উভয়ে এইরূপে অনেক কথাবার্ত্তা ও আলাপ চলিল। পরিশেষে রাজা অশ্বপতি বলিলেন, "রাজর্ষে, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সেই কন্যারত্নটিকে আপনি পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন।"

রাজর্ষি দ্যুমৎসেন বলিলেন, "মদ্ররাজ, সর্ব্ববিষয়ে এই শুভ সম্বন্ধ গৌরবজনক। কিন্তু এক বিষয়ে আমি বড় অসদ্ভাব দেখিতেছি। আমি হৃতরাজ্য—অর্থহীন। সেই লাবণ্যময়ী বালিকা রাজৈশ্বর্য্যে সুখ-লালিতা হইয়া কিরূপে বনবাসিনী হইবেন ?"

রাজা বলিলেন, "আপনাকে সে চিন্তা করিতে হইবে না। এই অল্প বয়সে সাবিত্রী যাহা শিখিয়াছে তাহা অতুলনীয়। সুখ ও দুঃখ তাহার নিকট তুল্য। উভয়কে বিধাতার দান বলিয়া সে মনে করে। মা যে আমার মূর্ত্তিমতী নিবৃত্তি। রাজর্ষে, তাহার শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। রাজপুরীতে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিতা হইয়াও মা আমার ব্রতপরায়ণা যোগিনী। তাহার সেই যোগ-সাধনার মূলে কি শুভ উদ্দেশ্য নিহিত আছে, অল্পবুদ্ধি আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।"

রাজর্ষি বলিলেন, "মহারাজ, একদিনের সাহচর্য্যেই আমি সাবিত্রীর গুণের পরিচয় পাইয়াছি। আমার স্ত্রী সাবিত্রীর রূপগুণের একান্ত পক্ষপাতিনী। কিন্তু সেই স্বভাবকোমলা সরলা বালিকার ভবিষ্যৎ জীবন স্মরণ করিয়া আমি সম্মতি দান করিতে পারিতেছি না! রাজন্, প্রফুল্ল কুসুমে কণ্টক বিদ্ধ করিতে কে চায়?"

ইহা শুনিয়া অশ্বপতি বলিলেন, "রাজর্ষে, আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মা আমার ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও যোগিনী। সে ইচ্ছা করিয়াই সমস্ত ঐশ্বর্য্য হইতে দূরে থাকিতে ভালবাসে। আর আপনি দুর্ভাগ্যই বা কিসে? পার্থিব ধনরত্ন হইতে কি অন্তরের ধন মূল্যবান্ নয়? যখন আপনার হৃদয় ব্রহ্মানন্দে বিভোর, তখন আপনার ধনের অভাব কি? হে ব্রহ্মবিৎ, ভ্রমান্ধ-তিমিরে লক্ষ্যহীনকে আর বিভ্রমে ফেলিবেন না। আপনার হৃদয় দেবতার রত্নপীঠ, আর আমার হৃদয় কামনার সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠ। রাজর্ষে, তথাপি আমার নিবেদন এই যে, অন্ধকারময় খনিগর্ভে জন্ম বলিয়া কি লোকে মণির অনাদর করে? না, পঙ্কজাত বলিয়া কমলিনীকে গ্রহণ করে না? আমার সেই শীলবতী কন্যা আপনার উপযুক্ত পুত্রবধূ হইবে, অধিকন্তু রাজর্ষে, সে আপনার ভাগ্যবান্ পুত্র সত্যবানের প্রতি অনুরাগবতী।"

শুনিয়া রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের হৃদয়ে আশার নবীন আলোক পতিত হইল। তিনি যেন সেই ভাবিপুত্রবধূর মূর্ত্তিমতী দেবীপ্রতিমাখানি স্নেহদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। রাজর্ষি, মদ্ররাজের অপূর্ব্ব দৈন্য ও শিষ্টাচারে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আর অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

বিদায়ের অভিবাদন আলিঙ্গন সমাপনান্তে রাজা অশ্বপতি বলিলেন, "রাজর্ষে, আর একটি কথা ভুলিয়াছি। আমার ইচ্ছা, আমার তনয়ার এই পবিত্র মিলনোৎসব আপনার পুণ্যতীর্থ তপোবনেই

অনুষ্ঠিত হউক। যেহেতু গঙ্গাধারা সে নিজেই আসিয়া মহাসাগরে আত্মসমর্পণ করে।”

রাজর্ষি দ্যুমৎসেন নানা চিন্তা করিয়া তাহাতেই সম্মতি দান করিলেন।

৭

রাজা অশ্বপতি সাবিত্রীর সহিত সত্যবানের বিবাহ দিবার জন্য বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করিলেন। রাজপুরীতে বিবাহ হইলে যে প্রকার আড়ম্বর হইত, আশ্রমপীড়ার আশঙ্কায় অশ্বপতি তাদৃশ সমৃদ্ধির সহিত তপোবন গমনে অভিলাষী না হইলেও মদ্ররাজ্যবাসী প্রকৃতিপুঞ্জের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে নিতান্ত সাধারণভাবে তপোবন গমন সম্পন্ন হইল না। রাজকন্যা সাবিত্রীর বিবাহ—প্রজাগণ সাবিত্রীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে; সুতরাং রাজার অনভিপ্রেত হইলেও তাহারা রাজকুমারীর বিবাহে রাজার অগ্রেই বশিষ্ঠাশ্রমে উপস্থিত হইল।

অশ্বপতি শুভক্ষণে ঋষিবেশী সত্যবানের করে প্রাণাধিকা সাবিত্রীকে দান করিলেন। তাঁহার এই কন্যাসম্প্রদানের দিনে নানারূপে দান কার্য্য সম্পাদিত হইল। রাজা বিদ্যার্থী ঋষিকুমারগণকে রাজভোগ্য অন্নপানীয় এবং ঋষিপত্নী ও ঋষিবালকবালিকাগণকে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইয়া দিলেন। তাঁহাদের সেই পবিত্রতাময়ী দেহ-কান্তিতে রত্নসমুজ্জ্বল বেশভূষা বড় সুন্দর দেখাইতে লাগিল। আশ্রমবাসী মুনিগণ রাজার এই কন্যাদানসংশ্লিষ্ট বদান্যতায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া দুই হাত তুলিয়া নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

রাজা অশ্বপতি কিছু দিন একত্র অবস্থানের পর তপোবনবাসী মুনিগণকে অভিবাদন করিয়া সাশ্রুনয়নে কন্যা-জামাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। মুনিগণ রাজার বিনয় ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া

আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। মদ্ররাজ তপোবন ত্যাগ করিলে সেই তপোবন যেন কেমন হতশ্রী অনুমিত হইতে লাগিল।

মাতাপিতার বিরহ-দুঃখে সাবিত্রী কাতরা থাকিলেও তিনি কর্ত্তব্য ভুলিয়া যান নাই। রাজকুমারী সাবিত্রী ভাবিলেন, আমি এখন ঋষিপত্নী, সুতরাং আমার এতাদৃশ বস্ত্রালঙ্কারে প্রয়োজন কি? এই ভাবিয়া তিনি পিতৃদত্ত বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার পরিত্যাগ করতঃ ঋষি-পত্নীগণের উপযুক্ত গৈরিকবসনে বরবপু আবৃত করিলেন। সত্যবানের জননী শৈব্যাদেবী নববধূর এইরূপ বেশভূষার পরিবর্ত্তনে একদিকে অতীব দুঃখিতা হইলেন, অন্যদিকে আশৈশব রাজৈশ্বর্য্যে পালিতা সাবিত্রীর এই প্রকার আত্মত্যাগ দর্শন করিয়া পুলকাশ্রুনীরে ভাসিতে লাগিলেন।

সাবিত্রী প্রত্যূষে উঠিয়া সমস্ত গৃহকার্য্য করেন। তাঁহার কার্য্য-তৎপরতায় কুটীরদ্বারগুলি মার্জ্জিত, অঙ্গনগুলি পরিষ্কৃত এবং সমগ্র তপোবন যেন সুসজ্জীভূত হইতে লাগিল। সাবিত্রী তপোবনে পুষ্পিত ও ফলবান্ বৃক্ষগুলির মূলদেশে আলবাল বন্ধন করিয়া দিলেন। ভূমিতে পতিত লতাগুলিকে বৃক্ষকাণ্ডে আবদ্ধ করিয়া দিয়া তাহাতে প্রাতঃসন্ধ্যা সলিল সেচন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ সাবিত্রীর এইরূপ অনুরাগে অল্পদিনের মধ্যেই তপোবনের অপূর্ব্বশোভা আরও বাড়িয়া উঠিল।

তপোবনের সকলেই দেখিলেন, রাজকুমারী সাবিত্রী যেন সাধনার পবিত্রতাময়ী মূর্ত্তি। প্রত্যেক বিষয়েই সিদ্ধি যেন তাঁহারই অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সাবিত্রীর পরিচর্য্যায় রাজর্ষির হোমধেনু অধিকতর দুগ্ধবতী হইল। বৎসটিও প্রচুর মাতৃস্তন্য পান করিয়া স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইল। দ্যুমৎসেন ও তদীয় পত্নী, সাবিত্রীদেবীর পরিচর্য্যায় শরীরে নব বল লাভ করিলেন। সমবয়স্কা ঋষিপত্নীগণ সকলেই সাবিত্রীর সখীত্ব লাভ করিয়া পুলকিতা হইলেন। মুনিগণ সাবিত্রীর অপূর্ব্ব

শাস্ত্রজ্ঞান ও ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া বুঝিলেন, সাবিত্রী সাধারণ মানবী নহেন। সাবিত্রী, এক্ষণে সত্যবানের রহস্যপ্রিয়া সঙ্গিনী, শ্বশুর ও শ্বশ্রূদেবীর ভক্তিনম্রা সেবিকা, ঋষিপত্নীগণের চারুহাসিনী সখী, মুনিকুমারগণের মমতাময়ী ধাত্রী, তপোবনস্থ বৃক্ষলতার সাক্ষাৎ বসন্তশ্রী, বন্যপশুপক্ষীর অশ্রুনেত্রা করুণা এবং অতিথি আতুরের স্নেহার্দ্রহৃদয়া জননী। এ-হেন সাবিত্রীকে বধূত্বে প্রাপ্ত হইয়া অন্ধ রাজা দ্যুমৎসেন ও তদীয় পত্নী ভাবিতেন, সাবিত্রী তাঁহাদের দৈন্যদুর্দ্দশার মধ্যে বিধাতার একমাত্র স্নেহাশীর্ব্বাদ।

এইরূপে সাবিত্রী তপোবনে এক প্রেমময় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই রাজ্যের রাজা সত্যবান, অন্ধ শ্বশুর ও শ্বশ্রূদেবী সেই রাজ্যের দেব-দেবী, আর সেই ভক্তিময়ী প্রীতিময়ী সাবিত্রী সেই নবীন রাজ্যের স্নেহ-কোমলা রাণী—দুই হস্তে কল্যাণ ও মমতা বিতরণ করিতেছেন।

বনপথে প্রথম সাক্ষাতের পবিত্র মুহূর্ত্তে সত্যবান্ সাবিত্রীর যে অনুপম রূপরাশি সন্দর্শন করিয়াছিলেন, দেখিলেন, সেই রূপরাশি শুদ্ধ যৌবনের উচ্ছল বিকাশ নহে। সাবিত্রীর অন্তঃসৌন্দর্য্যই বাহিরের রূপরাশিকে এত উজ্জ্বলতর করিয়াছে। সত্যবান্ সাবিত্রীর মত পত্নী লাভ করিয়া হৃদয়ে যেন কত বল পাইলেন। শাস্ত্রে বলে, সাধ্বী পত্নী স্বামীর হৃদয়ের বল, মমতার সজীব আলেখ্য, সৌভাগ্যের অগ্রদূতিকা। সত্যবান্ রাজকুমারী সাবিত্রীর পবিত্র প্রেমে শান্ত বনভূমির মধ্যে এক নবীন প্রেমরাজ্য দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, এই আশ্রমের নৈসর্গিক শোভা সাবিত্রীর রূপে মধুরতর হইয়াছে। রাজকুমারী সাবিত্রীর পবিত্র প্রেম-উপায়ন প্রাপ্ত হইয়া সত্যবানের হৃদয়ে নবীন বল আসিল। সত্যবান্ ভাবিলেন, আমার পূর্ব্বজীবনে কত সুকৃতি ছিল, সেই সুকৃতির ফলে আমি সাবিত্রীর মত পত্নী লাভ করিয়াছি। আবাল্য বিলাসের ক্রোড়ে প্রতিপালিতা সাবিত্রী তপস্বী

ঋষিকুমারের জীবনসঙ্গিনী হইয়া চিরাভ্যস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অভাব অনুভব করিবে ভাবিয়া সত্যবান্ প্রথমে আকুল হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন দেখিলেন, সাবিত্রী প্রেমার্দ্রহৃদয়া বনবাসিনী যোগিনী। সত্যবান্ ভাবিলেন, এতদিন মুমুক্ষু তপস্বিগণের সাহচর্য্যে আমার যে শিক্ষা হয় নাই, রাজকন্যা সাবিত্রী রাজ-প্রাসাদের মধ্যে তাহা শিক্ষা করিয়াছে। তপোবনের শান্ত স্নিগ্ধ শোভায় আমি যাহা পাই নাই, সাবিত্রী রাজান্তঃপুরে তাহা পাইয়াছে। বুঝিলাম, হৃদয়ের জিনিষ কেবল তপোবনেই নাই। তাহা লাভ করিতে হইলে অগ্রে হৃদয়কে তদুপযুক্ত করিতে হয়। সত্যবান্ মনে মনে বলিলেন, বিধাতা আমাকে আরও শিখাইবার জন্য এ-হেন সাবিত্রীকে আমার হস্তে দিয়াছেন। সাবিত্রী যে আমার বিধাতার দান।

একদিন সত্যবান্ নিভৃতে সাবিত্রীর দেখা পাইলেন। সুনীল গগনের তলে নির্ঝরিণীর তীরে উভয়ে এক শিলাতটে উপবেশন করিয়া সত্যবান্ সাবিত্রীর স্নেহকোমল হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, "দরিদ্রের ধন সাবিত্রি, যখন আমার দৈন্য-দুর্দ্দশার কাল ছায়ায় তোমার ঐ প্রফুল্ল মুখখানি ম্লান ও আশ্রমের ধূলিরাশিসংস্পর্শে যখন তোমার কুঞ্চিত অলকরাশি বিমলিন দেখি, তখন মনে হয়, তুমি আমাকে বরণ করিয়া ভাল কর নাই। সৌরভপূত কুসুম দেবতার গলেই শোভা পায়। এই কৌস্তুভমণি দারিদ্র্য-নিপীড়িত হতভাগ্যের গলে শোভা পাইবে কেন? সাবিত্রি, সেই বনপথে পবিত্র মুহূর্ত্তে কেন তুমি এই হতভাগ্যের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলে?"

সাবিত্রী অভিমানভরে বলিলেন, "নাথ, রমণীর হৃদয় বুঝিতে পারে পুরুষের এমন সাধ্য নাই। রমণীর হৃদয়ে ত বাসনার বিশ্বগ্রাসিনী জ্বালা নাই। রমণী বিশ্বাসপূর্ণ পবিত্রতা। তাহা বিধাতৃ-নিয়মে পবিত্রপ্রাণ পুরুষের হৃদয়ে বিলীন হয়। পুরুষশ্রেষ্ঠ, তোমার হৃদয়ে আমার প্রাণের দেবতা আনন্দের উপবন দেখিয়াছিল, তাই

সত্যবান বলিলেন, "সাবিত্রি, সেই বনপথে পবিত্র মুহূর্ত্তে কেন তুমি এই হতভাগ্যের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলে ?"

New Artistic Press, Calcutta

তোমাকে লাভ করিয়া সে তৃপ্ত—সে পূর্ণকাম। নাথ, কেন তুমি এমন নিদারুণ কথা বলিয়া আমার প্রাণে ব্যথা দাও। প্রেম ধনৈশ্বর্য্য চায় না, সে চায় আত্মবিস্মৃত ভালবাসা; দুটি প্রাণকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করাই তাহার মধুর অবদান। আর্য্যপুত্র, তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত, আমি অশিক্ষিতা নারী, আমি তোমাকে প্রেমের মহিমা কি বুঝাইব? আমি তোমাকে লাভ করিয়া পার্থিব কোন অভাবকে অভাব বলিয়া মনে করি না। তোমার মত পুরুষরত্নকে লাভ করিয়া আমার ধনের কোনও অভাব নাই। স্বামীর চিত্তবিনোদন জন্যই স্ত্রীর বেশভূষার প্রয়োজন। তুমি যখন আমায় এত ভালবাস, তখন আমার আর বেশভূষায় প্রয়োজন কি? পৃথিবীর জলে প্রেমের পিপাসা দূর হয় না। স্বর্গের অমৃতবিন্দু পানেই সে পিপাসার শান্তি হয়। অভ্রভেদী প্রাসাদ মধ্যে শান্তি নাই—শান্তি সংসারের বাহিরে, লোকালয় হইতে দূরে—নির্জ্জন তপোবনে। নাথ, তোমার ঐ লাবণ্যপূত মুখখানি দেখিয়াই আমার প্রাণের পিপাসা নিবারিত হইয়াছে। তোমার পবিত্র সঙ্গ আমার রাজসুখ, তোমার প্রেমপূত বক্ষঃই আমার পবিত্র রাজ-শয্যা। আমার অভাব কিসের? তোমার সযত্ন-আহৃত কুসুমগুচ্ছ আমার রত্নভূষণ, তোমার প্রদত্ত দেবোদ্দিষ্ট বনফলই আমার রাজভোগ, তোমার অমৃতমধুর বাণীই আমার সুশীতল পেয়। তোমার মত উচ্চপ্রাণ স্বামী লাভ করিয়া বৈজয়ন্তবাসিনী ইন্দ্রাণী অপেক্ষাও আমি নিজেকে অধিকতর সৌভাগ্যবতী মনে করি।"

সত্যবান সাবিত্রীর মুখ হইতে এই অমৃতমধুর কথাগুলি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বক্ষে টানিয়া প্রেমভরে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "সাবিত্রি, ক্ষমা কর, আর আমি তোমাকে কখনও এমন কথা বলিব না।"

এইরূপে আদরে সোহাগে সাবিত্রীর দিন কাটিতে লাগিল। সাবিত্রী অন্তরের ব্যথা চাপা দিয়া প্রফুল্লমুখে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

বসন্তকাল। বাসন্ত ঐশ্বর্য্যপূর্ণ প্রকৃতির আনন্দকানন মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গগণের সঙ্গীততানে মুখরিত। পুষ্পমুকুল বসন্তের মোহন স্পর্শে বিকশিত হইয়াছে। বসন্ত ধরণীকে ফুলে ফুলে ছাইয়া ফেলিয়াছে। এমন সুন্দর বাসন্তী নিশায় একদিন সত্যবান্ সহসা জাগরিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। দেখিলেন, গৃহের রন্ধ্রপথ দিয়া চন্দ্রকিরণ আসিয়া সাবিত্রীর মুখের উপর খেলা করিতেছে। সত্যবান্ সাবিত্রীর চন্দ্রালোকবিলসিত মুখশোভা একাগ্রদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় ছাপাইয়া আনন্দের তুফান উঠিল। ভাবাবেশে তিনি নিদ্রিতা প্রিয়তমার কপোলে চুম্বন করিলেন। সাবিত্রী আকুল-উষ্ণ চুম্বনের মোহন স্পর্শে জাগিয়া উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্বামী নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। সন্তঃজাগরিত প্রিয়তমার তন্দ্রাজড়িত অক্ষিযুগলের সলজ্জ দৃষ্টিতে সত্যবান্ যেন কোন্ নবীন লোকের অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। রজতকৌমুদীস্নাত বাসন্তী রজনীতে নির্জ্জন তপোবনে মধুর মলয়ানিল-সঞ্চারস্নিগ্ধ প্রকোষ্ঠে নবীন দম্পতী আজ পরস্পর প্রেমে বিভোর!

সত্যবান্ বলিলেন, "দেখ সাবিত্রি, চন্দ্রকিরণে বনস্থলীর কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে; ততোধিক শোভা হইয়াছে এই দীনের কুটীরখানিতে, আনন্দময়ী তুমি আনন্দের বন্যা লইয়া আসিয়াছ।" এই বলিয়া সত্যবান্ সাবিত্রীর চিবুক স্পর্শ করিলেন।

সাবিত্রী তাঁহার নিদ্রাবসন্ন দেহখানিকে সত্যবানের দেহে আশ্লিষ্ট করিয়া বলিলেন, "তাই বুঝি সেই আনন্দপ্লাবনে ভাসিয়া যাইতে যাইতে সহসা কূল পাইয়াছ?"

সত্যবান্ এই রহস্যে অতীব প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, "প্রাণাধিকে, তোমাকে লাভ করিয়া আমি ধন্য—তৃপ্ত। দেবি, তুমি মমতার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি। তোমার অন্তরের রত্নভাণ্ডার আমার অভাবরাশিকে পূর্ণ করিয়াছে। তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি হৃদয়ে নবীন

বল পাইয়াছি।” বাধা দিয়া সাবিত্রী বলিলেন, “নাথ, ইহাই কি তপস্বিবরের নিশীথ উপাসনা? পত্নীর গুণগানেই বুঝি হৃদয়ের দেবতাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছ?”

সত্যবান্ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, “দেবি, এই রজনীতে প্রিয়তমার নিদ্রালস চক্ষু-প্রবাহিত প্রীতির অশ্রু-স্নানেই প্রেমদেবতার পূজা। দেবি, এই পূজাতেই হৃদয়ের তৃপ্তি, সুতরাং দেবতারও তৃপ্তি। তুমি কি আমাকে ব্যর্থ পূজক মনে কর?”

সাবিত্রী বলিলেন, “ওগো আমার হৃদয়-মন্দিরের পূজক, এখন ও শ্লোক পাঠ রাখ। রূপের ব্যাখ্যায় নারীর আদর বাড়ে না। নারীর রূপ প্রসাধনে নয়, রূপ তাহার হৃদয়ে। আমাকে সেই অন্তরের রূপ চিনিতে শিক্ষা দাও। নাথ, বাহ্য রূপ ত নারীর নারীত্বকে আচ্ছন্নই করে। অন্তরের সৌন্দর্য্য ত বেশভূষায় মলিন হইয়া যায়। তবে কেন এই রূপের মোহ!”

সত্যবান্ সহর্ষে বলিলেন, “দেবি, আমি তোমাকে কি শিখাইব? তোমার নিকট আমার এখনও অনেক শিখিবার আছে।” সাবিত্রী লজ্জিতা হইলেন।

এত সুখে থাকিয়াও সাবিত্রীর হৃদয় ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় কাতর হইয়া পড়িত। তাঁহার সকল কার্য্যেই সেই ভীষণ কথা মনে পড়িত। সাবিত্রী দেখিতেন, সমস্ত শুভের মধ্যে সেই বৎসরান্তের নিদারুণ ঘটনা যেন ভীষণ দৈত্যের মত তাঁহাকে উপহাস করিতেছে। দারুণ দুশ্চিন্তায় সাবিত্রীর শরীর দিন দিন কৃশ হইয়া যাইতে লাগিল, চক্ষুর কোলে কালিমা সঞ্চার হইল, সমস্ত দেহে অবসাদের পাণ্ডুরতা আসিল। সত্যবান্ ও সত্যবানের জননী শচীদেবী ইহা প্রত্যক্ষ করিলেন। বৃদ্ধ রাজর্ষি দ্যুমৎসেন পত্নীর মুখে পুত্রবধূর অসুস্থতার কথা শ্রবণ করিয়া, একদিন সাবিত্রীকে পার্শ্বে ডাকিয়া বলিলেন, “মা, শুনিলাম তোমার শরীর দিন দিন কৃশ হইয়া যাইতেছে। তোমার

স্বচ্ছন্দ সরল খেলা নাই, তুমি আর সহচরী মুনিকন্যাদের সহিত বনে ভ্রমণ কর না ; মা, কেন এরূপ চিত্তবিকার ? আমার মনে হয়, তুমি স্নেহময় জনক ও পুণ্যবতী জননীদেবীর বিরহে এত কাতরা হইতেছ। তুমি চিরদিন ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিতা হইয়াছ ; এখন দারুণ দৈন্যের মধ্যে পড়িয়া বোধ হয় এত কষ্ট পাইতেছ। এজন্য আমার ইচ্ছা, তুমি কিছুদিনের জন্য পিতৃগৃহে গিয়া বাস কর।”

সাবিত্রী বলিলেন, “পিতঃ, আমার উপর এ আদেশ করিবেন না ! আমি কোন ক্লেশ বোধ করি না। আপনাদের পরিচর্য্যাই আমার কর্ত্তব্য ; ইহাতেই আমার তৃপ্তি—যত দিন বাঁচিব তত দিন চরণছাড়া করিবেন না।”

রাজা দ্যুমৎসেন স্নেহভরে বলিলেন, “মঙ্গলময়ী সাবিত্রি, জগজ্জননী তোমার অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করুন। প্রেমময়ের প্রেমসুধা তোমার ক্লান্ত জীবনকে সজীব করিয়া তুলুক—তুমি কল্যাণ ও পবিত্রতায় বিজয়িনী হও।”

সাবিত্রী অভিবাদনান্তে স্বকার্য্যে গমন করিলেন। শচীদেবী রাজর্ষির নিকট আগমন করিলে দ্যুমৎসেন বলিলেন, “দেখ, সাবিত্রীকে সমস্ত গৃহকার্য্য করিতে দিও না। বোধ হয় সাবিত্রী আশ্রমে আসিয়া, সর্ব্বক্ষণ শ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়া এইরূপ দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে।” শচীদেবী বলিলেন, “নাথ, সুশীলা সাবিত্রী আমাকে কোন কাজ করিতে দেয় না। আমি কোন কাজ করিতে গেলে আমার হাতের কাজ সে করিতে বসে এবং বলে ‘মা, আমি তোমাকে কোন কাজ করিতে দিব না।’ আমি তাহার কথা না শুনিলে সে অশ্রুপূর্ণ লোচনে আমার দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার সেই অশ্রুসিক্ত ম্লান মুখখানি দেখিলে আমি যেন কেমন হইয়া যাই। আমি কাজ ছাড়িয়া দিলেই মা আমার আনন্দপূর্ণা হইয়া হাসিতে হাসিতে সেই কার্য্য সম্পন্ন করে। সর্ব্ব কার্য্যেই সিদ্ধি যেন সাবিত্রীর পুলকস্পর্শ

অভিনন্দনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। নাথ, আমি দেখিয়াছি, আমাদের শয্যা পরিত্যাগের কত পূর্ব্বে সাবিত্রী শয্যাত্যাগ করিয়া সমস্ত গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া রাখিয়াছে—আশ্রমখানি পরিষ্কৃত হইয়াছে—পথের কঙ্কর ও ধূলিরাশি সম্মার্জ্জিত হইয়াছে। মা আমার যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।"

পত্নীর মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া রাজর্ষি বলিলেন, "তবে কি সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর প্রণয় জন্মে নাই? সাধ্বী স্ত্রীর ইহা অপেক্ষা মনোবেদনা আর কিছু নাই।" শচীদেবী বলিলেন, "তাহা আমি মনে করি না। সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর অত্যন্ত প্রণয়। তবে জানি না, বিধাতা সাবিত্রীকে কেন এ অশান্তির দহনে দগ্ধীভূত করিতেছেন।"

৮

সাবিত্রী পরম বিদুষী ছিলেন। পিতৃগৃহে উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়াছিলেন। সুতরাং যে-দিন নারদ-কথিত সেই এক বৎসর পূর্ণ হইবার দিন আসিবে—সমস্ত কার্য্যের মধ্যে তাহা একবার গণনা করা তাঁহার নিত্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল। একদিন সাবিত্রী দেখিলেন—সেই দিন আসিতে আর চারি দিন মাত্র বাকি। দেখিতে দেখিতে এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে—আর চারিটি দিন মাত্র অবশিষ্ট। এই দিন চতুষ্টয়ের অবসানে তাঁহার জীবনাধিক স্বামীর শেষদশা স্মরণ করিয়া সাবিত্রী মুহ্যমানা হইয়া পড়িলেন না। তাঁহার হৃদয় বলিতে লাগিল, সাবিত্রি, ভয় পাইও না। তোমার আত্ম-নির্ভরতার অক্ষয় কবচ এই দুরন্ত আহবে তোমাকে বিজয়িনী করিবে। তিনি ভাবিলেন, নিষ্ঠুর মৃত্যুদেবতা আমার অঙ্ক হইতে আমার স্বামিদেবতাকে অপহরণ করিবে! পিতার মুখে শুনিয়াছি, সতীর

সতীত্বকে দেবতারাও ভয় করেন। আমার কি এমন বল নাই যাহাতে আমি সেই নির্ম্মম দেবতার নিষ্ঠুর বিধান লঙ্ঘন করিতে পারি ? অদৃষ্টের সহিত যুদ্ধ আমাকে করিতেই হইবে।

এই ভাবিয়া সাবিত্রী ত্রিরাত্রব্রত করিবার সংকল্প করিলেন। পিতৃগৃহে রাজ-পুরোহিতের মুখে শুনিয়াছিলেন ত্রিরাত্রব্রত অনুষ্ঠান করিলে মানব অসাধ্য সাধন করিতে পারে—নিয়তির গতি পরিবর্ত্তিত হয়। আজ শুভক্ষণেই তাঁহার এই কথা মনে পড়িল। তিনি ভাবিলেন অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার জীবনে যে গভীর শোকদৃশ্য রহিয়াছে, কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সেই স্থলে তাঁহার চিরবাঞ্ছিত অবিচ্ছেদ্য দয়িতসম্মিলনের উজ্জ্বল দৃশ্য নিপাতিত করিতে হইবে। এই ভাবিয়া তিনি শ্বশ্রূদেবীকে তাঁহার ঐকান্তিকী ইচ্ছা জানাইবার জন্য ত্বরিত পদে গমন করিলেন।

শচীদেবী প্রাতঃস্নান সমাধা করিয়া স্বামীর ইষ্টারাধনার জন্য দূর্ব্বা ও যবাঙ্কুর সংগ্রহ করিতেছেন এমন সময়ে সাবিত্রী তথায় উপস্থিত হইয়া শ্বশ্রূদেবীকে তাঁহার মনের ইচ্ছা জানাইলেন। শচীদেবী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "মঙ্গলময়ী মা আমার, এই সে-দিন কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত সম্পূর্ণ করিলে—আবার কেন মা, ত্রিরাত্র ব্রত! এ ব্রত যে বড় কঠিন। ব্রত উপবাসে মা আমার দিন দিনই কৃশ হইয়া যাইতেছ। মা তোমার ঐ উপবাসখিন্ন দেহলতা দর্শন করিয়া আমি তোমাকে এ বিষয়ে সম্মতি দিতে পারি না।"

সাবিত্রী অনুনয় করিয়া বলিলেন, "মা, আমাকে যে এ ব্রত সম্পূর্ণ করিতেই হইবে—এই ব্রত অনুষ্ঠানের সঙ্গে যে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা রহস্যপূর্ণ সম্বন্ধ বিজড়িত আছে। আপনাকে মিনতি করিয়া বলিতেছি আমাকে এ বিষয়ে সম্মতি দান করুন। শক্তিরূপিণী নারী আত্মশক্তির উপরে বিশ্বাস রাখিয়া পারলৌকিক জীবনে অনন্ত শক্তির অধিকারিণী হয়। আমার জীবনেও এইরূপ কঠোর সাধনার

প্রয়োজন আছে। মা, এ ব্রত যে আমার অবশ্য অনুষ্ঠেয়। আপনি আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়া আমাকে এ বিষয়ে সম্মতি দান করুন।”

সহসা সাবিত্রীর এইরূপ কষ্টসাধ্য ব্রত-অনুষ্ঠানের কারণ বুঝিতে না পারিয়া শচীদেবী সাবিত্রীকে সঙ্গে লইয়া রাজর্ষির নিকট আগমন করিলেন এবং সাবিত্রীর ত্রিরাত্রব্রত অনুষ্ঠানের কথা জানাইলেন। রাজর্ষি বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—“মা, ত্রিরাত্রব্রত বড়ই আয়াসসাধ্য—তিন দিবস নিরম্বু উপবাসে এ ব্রত করিতে হয়। ব্রত উপবাসে তোমার দেহখানি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—আর এ কৃচ্ছ্রসাধনায় প্রয়োজন নাই। দেবতা শুধু ভক্তি-উপহার গ্রহণ করেন। উপবাসে ক্লেশ বোধ হইলে ভক্তি আইসে না। সুতরাং তাহাতে দেবতার প্রীতিও হয় না।” সাবিত্রী শুনিয়া বলিলেন, “বাবা, এ ব্রতে আমার কষ্ট হইবে না। এ ব্রত যে আমাকে সম্পূর্ণ করিতেই হইবে। বাবা, মা, অক্ষমা দাসীর এ স্নেহ-অত্যাচার সহ্য করুন। আমাকে এ-বিষয়ে সম্মতি দান করুন।”

শচীদেবী সাবিত্রীর চিবুক ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন, “মা আমার, তোমার কামনা পূর্ণ হউক।” সাবিত্রী রাজর্ষি ও শ্বশ্রূদেবীর চরণ বন্দনা করিয়া, স্বামীর অনুমতি লাভের জন্য পূজা-নিরত স্বামীর নিকটে উপনীত হইলেন। অসময়ে সাবিত্রীকে পূজা-গৃহে দেখিয়া সত্যবান্ সবিস্ময়ে বলিলেন, “কে এ বিজয়িনী! মুমূর্ষুর জীবনে অমৃতবারি সেচন করিতে কে এলে দেবি!”

সাবিত্রী বলিলেন, “নাথ, আমি কোনও দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া ত্রিরাত্র-ব্রত করিব অভিলাষ করিয়াছি। বাবা মা সম্মতি দিয়াছেন—এখন তোমার সম্মতি লাভের জন্য আসিয়াছি। তুমি দয়া করিয়া এ ব্রত সাধনে আমায় অনুমতি দাও।”

সত্যবান্ সাবিত্রীর ললাটে হোমশেষের তিলক ও গলদেশে দেবতার নির্ম্মাল্যমালা পরাইয়া দিয়া বলিলেন, “মঙ্গলময়ী দেবি,

তুমি আবার কি ব্রত করিবে? তুমি যে মূর্ত্তিমতী শান্তি, তোমার আগমনে আমাদের সমূহ অশান্তি কাটিয়া গিয়াছে, তপোবন যে তোমার শুভ পদার্পণে জরামৃত্যুবিহীন অমরনিকেতন সদৃশ হইয়াছে। দেবি, এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। এ নবীন প্রেমের রাজ্যে তুমি অমঙ্গলের আশঙ্কা করিও না। তোমার প্রভাবে অমঙ্গল এস্থান হইতে দূরে গমন করিয়াছে।”

সাবিত্রী বলিলেন, “নাথ, শরীরী জীব জন্ম, জরা ও মৃত্যুর অধীন। যখন আমরা দেহ ধারণ করিয়াছি, তখন আধি, ব্যাধি জরা ও মৃত্যু আমাদের নিত্যসঙ্গী। এই হেতু ব্রত-উপবাস-দান আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। দেব, কেন তবে তুমি এ দাসীকে শাস্ত্রাদেশ পালনে বাধা দিতেছ?”

সত্যবান্ এবার পরাভূত হইয়া বলিলেন, “না সাবিত্রি, আমি তোমায় কখনও বাধা দিব না। তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হউক।” সাবিত্রী মনে মনে ‘তথাস্তু’ বলিয়া আশ্রমবাসী মুনিগণের চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করণার্থ ধীরপদে তথা হইতে গমন করিলেন।

৯

ব্রতপরায়ণা সাবিত্রী কঠোর সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। একদিন—দুইদিন কাটিয়া গেল; তৃতীয় দিবসও অতীত হইল—সাবিত্রীর জ্ঞান নাই। ব্রতপরায়ণা যোগিনীর সম্মুখ দিয়া সুদীর্ঘ বিংশতি প্রহর অতিবাহিত হইয়া গেল, তবু তাঁহার চৈতন্য নাই। কঠোর সাধনায় তিনি দেবতার আসন টলাইলেন। বেদমাতা সাবিত্রী তনয়ার এই অপূর্ব্ব নিষ্ঠা দর্শনে অতীব প্রীত-প্রফুল্লচিত্তে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, “হে পদ্মযোনি, আমার বরপুত্রী ঐ দেখ স্বামীর দীর্ঘজীবন প্রাপ্তির আশায় মুদিত নয়নে ত্রিরাত্র ব্রত

আরম্ভ করিয়াছে। আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। আজ সে ব্রতশেষে হতাশপ্রাণে অগ্নিতে আহুতি দিলে তোমার এই জগৎ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। সতীত্ব-তেজ অতীব ভীষণ। কিরূপে পতি-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণীর অভিলাষ পূর্ণ হইবে চিন্তা করিয়া দেখ!"

ব্রহ্মা বলিলেন, "দেবি, মদ্ররাজের জামাতার জীবিতকাল পার্থিব আর একদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। সত্যবান্ নিজ কর্ম্মফলে এত অল্পায়ুঃ। দেবি, তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কর্ম্মফলেই অদৃষ্টের বিলোপ। সাবিত্রীর কর্ম্মফলে সত্যবানের অদৃষ্টের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—সত্যবান্ দীর্ঘায়ুঃ হইবে। তুমি মদ্ররাজ-কন্যার কামনা পূর্ণ কর।" শুনিয়া ব্রহ্মাণী পুলকিত হইয়া পৃথিবীতে আসিবার জন্য ব্রহ্মার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, "দেবি, ঐ দেখ, রজনীর শেষ যামার্দ্ধে পৃথিবীর পূর্ব্বাকাশ ঊষার কনক কিরণে উদ্ভাসিত হইয়াছে—ব্রাহ্মণগণ তোমার ধ্যান করিতেছে, ঐ শোন দেবি, অযুত কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইতেছে—

"রক্তবর্ণাং দ্বিভুজাং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরাং
হংসাসনসমারূঢ়াং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মদৈবতাং ঋগ্বেদোদাহৃতাং—"

বেদমাতা সাবিত্রী মরালবাহনে সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিলেন।

ব্রতশেষের আর অর্দ্ধযামমাত্র অবশিষ্ট। এখনও বাঞ্ছিত প্রাপ্তি হইল না। সাবিত্রী অবসন্না হইয়া পড়িলেন। অশ্রুজলে তাঁহার কমলসদৃশ মুখখানি ভাসিতে লাগিল। কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "দেবী ব্রহ্মাণি, মাতৃমুখে শুনিয়াছি, আমি তোমারই আশীর্ব্বাদে জন্মিয়াছি। আমি মৃত্যুমলিন পৃথিবীতে কি এতই হেয় যে, এত কৃচ্ছ্রসাধনায় তোমার দর্শন পাইলাম না? মা, কেন এ হতভাগিনী তনয়ার উপর এত নির্য্যাতন? যদি তোমার করুণা প্রাপ্ত হই, তবেই এ জীবন রাখিব—নচেৎ মা'র নামে এই ঘৃণ্যদেহ এই হোমানলে পূর্ণাহুতি দিব।" এই ভাবিয়া সাবিত্রী চক্ষু মুদ্রিত করিলেন,

দেখিলেন—রক্তবর্ণা দ্বিভুজা অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরা হংসাসনসমারূঢ়া ব্রহ্মাণী যেন সূর্য্যমণ্ডল হইতে পৃথিবীতে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, “মা সাবিত্রি, আমি তোমার তপশ্চর্য্যায় সুখী হইয়াছি, তোমার কামনা পূর্ণ হইবে। একনিষ্ঠার বলে তোমার মৃত পতি পুনর্জ্জীবিত হইবেন। ধর্ম্মরাজের বরে তোমার শ্বশুরকুলে পিতৃকুলে কিছু অভাব থাকিবে না। মা সাবিত্রি, কর্ম্মের ভীষণ সংগ্রামে তুমি বিজয়িনী হইয়াছ, তোমার ব্রত পূর্ণ হইয়াছে। মা, হোমানলে পূর্ণাহুতি দাও। পৃথিবীতে উষার আলো কর্ম্মের গান বহিয়া আনিয়াছে।”—সহসা সাবিত্রী সংজ্ঞালাভ করিয়া শুনিলেন, বনদেবী বিহঙ্গকূজনে পূর্ণাহুতির বাজনা বাজাইতেছেন।

সাবিত্রী ত্রিরাত্র ব্রত শেষ করিয়া উঠিলেন। তাঁহার অসাধারণ সংযম, ঐকান্তিক নিষ্ঠা দেখিয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। শ্বশ্রূদেবী আসিয়া বলিলেন, “মা, ব্রত ত সম্পূর্ণ হইয়াছে, এখন কিঞ্চিৎ দেবতার প্রসাদ গ্রহণ কর।” সাবিত্রী বলিলেন, “আজ না মা, অদ্য অষ্ট প্রহর স্বামিসহ একত্র অবস্থান পূর্ব্বক কল্য সূর্য্যোদয়ের পর স্বামীর চরণামৃত পান করিব। ইহাই ব্রতের নিয়ম। মা, দেখিতেছ ত এই তিন দিন উপবাসে আমার কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ হয় নাই। তোমাদের পুণ্যচরণে ভক্তি থাকিলে অদ্যও নিরাপদে কাটিয়া যাইবে।” শচীদেবী সাবিত্রীর ব্রতানুরাগ দেখিয়া ভাবিলেন, যখন ত্রিরাত্র ব্রতে সম্মতি দিয়াছি তখন আর পারণের দিনে অনুরোধ করিয়া মা'র আমার ব্রত ভঙ্গ করিব না।

১০

জ্যৈষ্ঠমাস—কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথি। পৃথিবী সান্ধ্য-রক্তিমার রক্তকৌষেয় বাস ও অস্তোন্মুখ সূর্য্যের রক্তচন্দনের ফোঁটা পরিয়া শোভা পাইতেছে। সাবিত্রী দেখিলেন, সত্যবান্ একখানি কুঠার

স্কন্ধে করিয়া বনে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। সাবিত্রী ত্বরিত পদে সত্যবানের নিকট গিয়া বলিলেন, "নাথ, সান্ধ্য আরতির সময় আসিতেছে—এ সময়ে কোথায় যাইতেছ ?"

সত্যবান বলিলেন, "আজ চতুর্দ্দশী, সাগ্নিক ব্রাহ্মণের পক্ষে সায়ংসন্ধ্যা অবিহিত। পিতার হোমকাষ্ঠ শেষ হইতেছে। প্রত্যূষে হোমকাষ্ঠের প্রয়োজন। ইচ্ছা করিয়াছি এই সময়ে কিছু বনফল ও কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিব।"

সাবিত্রী বলিলেন, "সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, অদ্য এই অসময়ে যাইবার প্রয়োজন নাই। কুটীরে যে বনফল সংগৃহীত আছে তাহাতে কল্য চলিবে কিন্তু হোমকাষ্ঠ যে কিছুই নাই।"

সত্যবান প্রেমভরে বলিলেন, "সাবিত্রি, বাধা দিও না। মাতা-পিতার কার্য্যে সন্তানের বিপদ্ ঘটে না।"

সাবিত্রী নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "নাথ, জানি আমি মাতাপিতার প্রিয়চিকীর্ষু সন্তানের বিপদ ঘটে না, তথাপি আর একটি বাধা এই যে, আমার ত্রিরাত্র ব্রতের নিয়ম অদ্য অষ্টপ্রহর স্বামিসঙ্গে থাকিতে হইবে। তুমি এখন যদি বনে গমন কর তবে আমাকেও সঙ্গে লইয়া চল।"

সত্যবান্ সম্মত হইলেন। শ্বশুর ও শ্বশ্রূদেবীর আদেশে সাবিত্রী সত্যবানের সহিত কাষ্ঠসংগ্রহার্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কিরূপে এই কালরজনী প্রভাত হইবে সাবিত্রী অনন্যমনে তাহাই চিন্তা করিতেছেন, আর সত্যবান্ মরণের তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন—ব্রত-শুষ্ক পত্নীর জ্যোতির্ম্ময় বদনমণ্ডল ও ব্রততেজো-মণ্ডিতা অনবদ্যাঙ্গীর দেহবিচ্ছুরিত সতীত্বতেজ।

ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল। সত্যবান্ কাষ্ঠসংগ্রহার্থ এক শুষ্কবৃক্ষে আরোহণ করিয়া এক শাখায় কুঠারাঘাত করিলেন। সহসা তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার মস্তকে যেন কেহ

সহস্র সূচি বিদ্ধ করিতেছে এরূপ যন্ত্রণা হইতে লাগিল। সত্যবানের হস্ত হইতে কুঠার নিম্নে পড়িয়া গেল। সাবিত্রী দক্ষিণ নয়নের স্পন্দনে বুঝিলেন, মহর্ষিকথিত সেই শেষমুহূর্ত্ত সমুপস্থিত। তখন তিনি ব্যগ্রহৃদয়ে বলিলেন, "নাথ, সত্বর নামিয়া আইস। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিও না!" ধীরে ধীরে সত্যবান্ বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিয়া বৃক্ষতলে উপবেশন করিবামাত্র সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ বিমলিন হইয়া গেল। সাবিত্রী আঁধার জগৎ দ্বিগুণ আঁধার দেখিলেন। সেই ঝিল্লিরবমুখরিত কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর তিমিরাবগুণ্ঠিত রজনীতে হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল বনমধ্যে পতিদেহ-ক্রোড়ে সাবিত্রী একা! তথাপি সাবিত্রী কাঁদিলেন না। ভাবিলেন 'বিপদি ধৈর্য্যং'—বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বনীয় ইহা শাস্ত্রাদেশ। বিপদে অধীর হইলে বিপদ আরও ঘনাইয়া আইসে। সাবিত্রী অঞ্চলে মুখ মুছিয়া মৃতকল্প পতিকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিলেন। সমস্ত জগৎ যেন সতীর দিকে চাহিয়া রহিল। বনের প্রাণিকুল দেখিতে লাগিল, কে এ রমণী যেন স্থিরা বিদ্যুল্লতা। নীল আকাশের গায় নক্ষত্রমণ্ডলী যেন নিশ্চল চক্ষে সতীর অলৌকিক সতীত্ব-তেজ দেখিতে লাগিল।

সাবিত্রী সত্যবানের বক্ষে হাত দিয়া দেখিলেন, এখনও হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। কিন্তু তাহা ক্রমেই যেন মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে—ভাবিলেন মহর্ষির কথা বুঝি এবার সত্য হয়!

সহসা সেই অন্ধকারময় বনভূমি দিব্যালোকে আলোকিত হইয়া উঠিল। সাবিত্রী নবজলধরদেহে বিদ্যুতের মত শোভমান এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে মহিষবাহনে আসিতে দেখিয়া বুঝিলেন, মৃত্যু-দেবতা আসিতেছেন! সাবিত্রীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি মন দৃঢ় করিলেন; ভাবিলেন, দেবতার নিকট শঙ্কা কি? বিশেষতঃ ইনি ধর্ম্মরাজ। ইঁহার সম্মুখে আমার আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

সাবিত্রী সাহসে বুক বাঁধিয়া পুরোবর্ত্তী দণ্ডপাশহস্ত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি ধর্ম্মরাজ যম ?"

ধর্ম্মরাজ বলিলেন, "হাঁ। তোমার পতির আয়ুঃশেষ হইয়াছে, তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য আমি আসিয়াছি।"

সাবিত্রী সত্যবানের মস্তক ধীরে ধীরে ভূমিশয়নে রাখিয়া পুরোবর্ত্তী ধর্ম্মরাজের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। যম এই অবসরে সতী-দেহ-চ্যুত মুমূর্ষু সত্যবানের অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত প্রাণ-পুরুষকে বাহির করিয়া লইয়া দক্ষিণ দিগভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

সাবিত্রী দেখিলেন, সত্যবানের হৃদ্‌পিণ্ডের ক্ষীণ স্পন্দন রহিত হইয়া গিয়াছে—তাঁহার সেই সহাস মুখমণ্ডলে মৃত্যুর কালিমা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া উঠিলেন; বুঝিলেন আজ তিনি একা—নিতান্তই একা! সংসারে রমণী-জীবনের একমাত্র অবলম্বন ঐ যে মৃত্যুদেবতার অনুবর্ত্তী, এই ভাবিয়া সাবিত্রী রুদ্ধনিশ্বাসে পাগলিনীর মত ধর্ম্মরাজের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

সাবিত্রী উন্মাদিনীর ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল গতিতে অনুসরণ করিয়াছে দেখিয়া ধর্ম্মরাজ বলিলেন, "সাবিত্রি, কেন এ প্রয়াস ? বিধাতৃবিধানে সকলেই নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে। সত্যবানের আয়ুঃশেষ হইয়াছে, অতঃপর তাঁহার প্রাণপুরুষে আমার অধিকার। কেন আর সেই প্রাণপুরুষের প্রতি তোমার এ মায়া। গৃহে প্রত্যাগত হও—কর্ত্তব্য সাধন কর। ইহজীবনের অপর পারে তুমি তোমার পতির সহিত পুনরায় মিলিত হইবে।"

সাবিত্রী বলিলেন, "ধর্ম্মরাজ, আপনি মানুষের হৃদয় বুঝিতে পারেন না। আপনারা মানুষের জীবনের সঙ্গে মায়ার মিলন করিয়া দিয়াছেন। আমি পতির মায়া পরিত্যাগ করিব কিরূপে ?"

ধর্ম্মরাজ বলিলেন, "প্রিয়বাদিনি, আমি তোমার কথায় অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি! তুমি সত্যবানের জীবন ব্যতীত অন্য কোন বর প্রার্থনা কর।"

সাবিত্রী গত রজনীর সেই মরালবাহনার আশ্বাসবাণী মনে করিলেন। ভাবিলেন, দেবীর আদেশ সফল হইবার এই বুঝি পূর্ব্ব-সূচনা। নচেৎ শরীরী জীবের পক্ষে মৃত্যুদেবতার প্রত্যক্ষ দর্শন কিরূপে সম্ভব! শুদ্ধ তাহাই নহে, বিনয়বধির মৃত্যুদেবতা আজ আবার বরদমূর্ত্তিতে তাঁহার পুরোভাগে উপস্থিত! সাবিত্রী দৈববাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বলিলেন, "দেব, যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তাহা হইলে আমাকে এমন বর দান করুন যাহাতে আমার শ্বশুর দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন।"

ধর্ম্মরাজ বলিলেন, "তথাস্তু।" এই বলিয়া তিনি আবার নিজ পুরীর দিকে গমন করিতে লাগিলেন।

কতকদূর গিয়া কৃতান্তদেব পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন—সাবিত্রী তখনও তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন।

যম বলিলেন, "সাবিত্রি, যাও, গৃহে গিয়া মৃত স্বামীর ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাধা কর।"

সাবিত্রী বলিলেন, "দেব, আমি যে গৃহহারা, আমার গৃহ কোথায়? আমার জীবনসর্ব্বস্ব আজ আপনার অনুবর্ত্তী। আমি কিরূপে পতিকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারি? আপনি ধর্ম্মরাজ হইয়া অনন্যশরণা আমাকে এ কি আদেশ করিতেছেন?"

যম বলিলেন, "সতি, আমি তোমার কথায় সমধিক প্রীতি লাভ করিয়াছি; তুমি সত্যবানের জীবন ব্যতীত অন্য কোন বর প্রার্থনা কর।"

সাবিত্রী বিনয় প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ, যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যাহাতে আমার শ্বশুর হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন।"

যম বলিলেন, "তাহাই হইবে।" এই বলিয়া তিনি নিজপুরীর দিকে চলিলেন। কতক দূর গিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, তখনও সাবিত্রী যুক্তকরে তাঁহার পশ্চাৎ আগমন করিতেছেন।

যম বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, কে এ অসামান্যা রমণী! প্রকাশ্যে বলিলেন "সাবিত্রি, এখনও প্রত্যাবৃত্ত হও। এ যে নিদারুণ প্রেতদেশের পথে আসিতেছ। সম্মুখে ভীষণ বৈতরিণী। উহার পারেই আমার রাজ্য। বিধাতার বিধানে বিশৃঙ্খলা সম্পাদন ধর্ম্মবিগর্হিত। আর অগ্রসর হইও না। আমি তোমার ধর্ম্মজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যবানের জীবন ব্যতীত তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর।"

সাবিত্রী ভাবিলেন পিতা আমার অপুত্রক; অন্ধকার রজনীতে একমাত্র তারকার মত আমাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। এই ভাবিয়া তিনি পিতার শতপুত্রলাভ বর প্রার্থনা করিলেন।

ধর্ম্মরাজ বলিলেন—"তাহাই হইবে মা, তাহাই হইবে। আর অগ্রসর হইও না। যাও, শ্বশুর ও শ্বশ্রূদেবীর সেবা করিয়া ধন্যা হও।"

সাবিত্রী ভাবিলেন সব ত হইল। দৈববরে পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের সমস্ত অভাব পূর্ণ হইয়াছে কিন্তু আমার হৃদয়ের অভাব ত পূর্ণ হইল না! হৃদয়ের আসন যে শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে! এই ভাবিয়া তিনি অগ্রগামী যমরাজের পশ্চাতে আবার গমন করিতে লাগিলেন।

সাবিত্রী এখনও তাঁহার অনুবর্ত্তিনী দেখিয়া ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীর একনিষ্ঠায় অতীব প্রীত হইয়া বলিলেন, "সাবিত্রি, তোমার ত সমস্ত কামনাই পূর্ণ হইয়াছে। আর কেন কষ্ট পাইতেছ—প্রতিনিবৃত্ত হও।"

সাবিত্রী বলিলেন, "দেব, আমার হৃদয়ের আসন যে শূন্য। সে-আসনে যে-দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম, সে-দেবতাটি যে আমার মৃত্যুমলিন। হে কৃপাময়, অমৃত-বর্ষণে আমার সেই জীবন-দেবতাটিকে পুনর্জ্জীবিত করুন।"

যম বলিলেন, "মা, নির্ব্বাপিত জীবনদীপ আর জ্বলে না—শুষ্ক কুসুম আর হাসে না। নিয়তির বশে তোমার স্বামী এ পৃথিবীতে আর পুনর্জ্জীবিত হইবে না। আমি তোমার প্রতি অতীব প্রসন্ন হইয়াছি; তুমি সত্যবানের জীবন ব্যতীত আর এক বর প্রার্থনা কর।"

সাবিত্রী বলিলেন, "দেব, দ্বিচারিণী না হইয়া যেন আমি শত-পুত্রের জননী হই।"

ধর্ম্মরাজ বলিলেন, "তথাস্তু। এইবার তুমি বশিষ্ঠাশ্রমে প্রত্যাগত হও। মা, খেদ করিও না। তোমার আর অপ্রাপ্য কিছুই নাই।"

সাবিত্রী বলিলেন, "দেব, কামনার বিনাশ হইয়াও ত বিনাশ হইতেছে না। বর্ষার ধারাপাতে ধরণী শীতল হইলেও কাল না হইলে বীজের অঙ্কুর হয় না। আমি ভবিষ্যতে শতপুত্রের মাতা হইব, কিন্তু আমার স্বামী যে আপনার পাশবদ্ধ। দেব, আমার স্বামীর প্রাণপুরুষটি প্রদান করুন। নচেৎ আমি যে ধর্ম্মচ্যুত হইব—কিরূপে আমি দ্বিচারিণী না হইয়া শতপুত্রের মাতা হইব ?"

মৃত্যুদেবতা ভাবিলেন—তাই ত, আমি কোন্ মায়ারাজ্যে বিচরণ করিতেছিলাম। আজ যেন সতীশিরোমণি সাবিত্রী তাঁহার প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। ধর্ম্মরাজ সেই বিশ্ববিজয়িনী শক্তিরূপিণীকে বলিলেন, "মা, এই লও তোমার স্বামীর প্রাণপুরুষ। বুঝিলাম মা, সতীর তুল্য শক্তিশালিনী আর কেহ নাই। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সীমন্তের সিন্দূর অক্ষয় হউক।" এই বলিয়া যম অন্তর্হিত হইলেন।

১১

লব্ধকামা সাবিত্রী, যথায় সত্যবানের মৃতদেহ পতিত ছিল তথায় মুহূর্ত্তমধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রাণপুরুষটিকে সত্যবানের বক্ষে স্পর্শ করাইলেন। অমনি সত্যবান্ প্রবুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "সাবিত্রি,

শিরঃপীড়ায় বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখনও মাথা ঘুরিতেছে। চারিদিক শূন্য দেখিতেছি।"

সাবিত্রী বলিলেন, "নাথ, অচিরেই সুস্থ হইবে। একটু বিশ্রাম কর। এই রজনীতে আর আশ্রমে যাইয়া কাজ নাই।" সত্যবান্ বলিলেন, "না সাবিত্রি, শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া পড়াতে অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে, পিতার যজ্ঞসাধনের জন্য প্রত্যূষেই কাষ্ঠের প্রয়োজন। চল শীঘ্র আমরা আশ্রমের অভিমুখে গমন করি।"

এদিকে ধর্ম্মরাজের বরে অন্ধ রাজর্ষির অন্ধত্ব দূর হইল। তিনি এত দিনের পর সহসা দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া চমৎকৃত হইয়া মহিষী শচীদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহিষি, আমার সত্যবান্ ও বধূমাতা কি এখনও বন হইতে প্রত্যাগত হয় নাই?" শচীদেবী বলিলেন, "না রাজর্ষে, সত্যবান্ ও বধূমাতা এখনও বন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই। এত রাত্রি হইয়া গেল। তথাপি তাহারা কুটীরে ফিরিয়া আসিল না কেন? বোধ হয় বাছারা কোনও বিপদে পড়িয়াছে। অতএব চলুন বনে প্রবেশ করিয়া তাহাদের অন্বেষণ করি।"

এই বলিয়া অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা পুত্র ও পুত্রবধূর জন্য বিকল হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন, সত্যবান সাবিত্রীর হস্ত ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে আশ্রমে আগমন করিতেছেন।

বৃদ্ধরাজা দ্যুমৎসেন অন্ধত্ব নিবন্ধন এত দিন পুত্রবধূর মুখখানি দেখিতে পান নাই। আজ সাবিত্রীকে সন্দর্শন করিয়া বলিলেন, "মা আমার সাক্ষাৎ দেবী!"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় শাল্বরাজ্য হইতে দূত আসিয়া সংবাদ দিল, রাজসেনাপতি শত্রুকে পরাজিত করিয়া রাজ্য পুনরধিকার করিয়াছেন।

বশিষ্ঠাশ্রমে আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল।

মদ্ররাজ দেখিলেন, আজ জ্যৈষ্ঠীয় অমানিশা। গত রজনীতে মহর্ষি-নির্দ্দিষ্ট বৎসর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। না জানি সাবিত্রীর অদৃষ্টে কি অঘটনই ঘটিয়াছে এই ভাবিয়া তিনি বিষণ্ণমুখে বশিষ্ঠাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, আশ্রমে আনন্দোৎসব! আর সাবিত্রী মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণার মত রন্ধনশালা আলো করিয়া ক্ষুধিতের জন্য অন্ন প্রস্তুত করিতেছেন।

মদ্ররাজ আসিয়াছেন শুনিয়া সাবিত্রী ছুটিয়া গিয়া পিতার চরণ বন্দনা করিলেন। অশ্বপতি বলিলেন, "মা, কাল যে মহর্ষি-নির্দ্দিষ্ট বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।" সাবিত্রী সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট বিবৃত করিলেন। আজ সকলের নিকট সাবিত্রীর বর্ষগোপ্য মন্ত্র ব্যক্ত হইল। সকলে সাবিত্রীর অলৌকিক কার্য্য শ্রবণ করিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

আমরাও বলি, এস দেবি, এই শোকতাপ-কলুষিত মর্ত্তাধামে পবিত্রতার বিমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ কর। ভারতের গৃহে গৃহে তোমার পবিত্রমধুর নাম কীর্ত্তিত হউক। দুরাশার অন্ধকারে তোমার চিরনমস্য বরমূর্ত্তি হতভাগ্য আমাদিগকে দেখাইয়া তৃপ্ত কর—ধন্য কর। তোমার পবিত্রনামস্মৃতি সর্ব্বদেশীয়, সর্ব্বজাতীয় নারীকুলের হৃদয় পতিপ্রেমে পূর্ণ করুক।

তৃতীয় আখ্যান

দময়ন্তী

তৃতীয় আখ্যান

দময়ন্তী

১

তুষারকিরীট হিমাচলের পাদদেশস্থ বর্ত্তমান কমায়ুন প্রদেশ পূর্ব্বকালে নিষধদেশ * নামে কথিত হইত। সেই অমরাবতী সদৃশ নিষধদেশে বীরসেন নামে এক প্রবলপ্রতাপ রাজা ছিলেন। নল তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। অলকা তাঁহার রাজধানী ছিল।

মহারাজ নল একদিন মৃগয়া-ব্যপদেশে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। শিকারের জন্য বহু পর্য্যটনে সবিশেষ ক্লান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে বহুবারিবিহঙ্গকূজিত মনোহর এক সরোবর-তীরে উপনীত হইলেন। নল দেখিলেন, তথায় এক বিচিত্রপক্ষ হংস নয়নযুগল মুদ্রিত করিয়া নিদ্রিত রহিয়াছে। রাজা ধীরে ধীরে হংসের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে ধারণ করিবামাত্র সে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিল রাজাকর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছে। সে আপনার বন্দিত্ব এবং সহচরচ্যুতির দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া সবিনয়ে বলিল, "রাজন্, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে ছাড়িয়া দিন। আমি তীর্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বচ্ছন্দজাত জলজ দ্রব্যাদি ভোজন করিয়া থাকি, কদাপি মানুষের কোন বৈরিতা করি না। হে মহানুভব, আমাকে বন্দী করিয়া আপনি কি পৌরুষ অর্জ্জন করিবেন?"

রাজা হংসের এই বিনয়মধুর বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া তাহাকে মুক্তিদান করিলেন। হংস তখন সন্তুষ্টচিত্তে বলিল, "মহারাজ,

* কোন কোন মতে আধুনিক মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত জব্বলপুর অঞ্চল।

আপনি যেমন দয়া করিয়া আমায় স্বাধীনতা দান করিলেন, আমিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ সমুচিত চেষ্টা করিব। রাজন্, আপনি এখন পর্য্যন্ত অবিবাহিত। সংসারাশ্রমী ব্যক্তিগণের পক্ষে পরিণয় অতীব শুভকর কার্য্য। রমণী-হৃদয়ের শীতলতায় কর্ত্তব্যপরুষ পুরুষের প্রাণ সুকোমল হয়। রমণীর আত্মদান, রমণীর রমণীয়তা সংসার-সমরে পুরুষকে বলীয়ান্ করে। মহারাজ, অবিলম্বে আপনার পবিত্র উদ্বাহ-সূত্রে আবদ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু আপনার যোগ্য রমণী সংসারে দুর্লভ। আমি উত্তরে মানসসরোবর হইতে দক্ষিণে মহাসমুদ্রস্পৃষ্ট ভগবতী কুমারীদেবীর মন্দির পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া থাকি। দেখিয়াছি, বিদর্ভরাজকন্যা লোকললামভূতা দময়ন্তীই আপনার মহিষী হইবার উপযুক্ত।" এই বলিয়া হংস বিস্ময়মৌন রাজার নিকট দময়ন্তীর রূপগুণের প্রশংসা আরম্ভ করিল। মহারাজ নলের প্রাণে রমণীর মধুর হৃদয়ের ছায়া পড়িল। নল ভাবিলেন, বিধাতা না জানি কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসমাবেশে সেই বরবর্ণিনী দময়ন্তীর সৃষ্টি করিয়াছেন।

অবিলম্বে হংস সুনীল আকাশে উড্ডীন হইয়া মহারাজ নলের গুণকাহিনী গান করিতে করিতে দক্ষিণ মুখে গমন করিল। রাজা এই ব্যাপার দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

২

অধুনা যে স্থানের নাম বেরার, পূর্ব্বকালে তাহা বিদর্ভ নামে অভিহিত হইত। তথায় ভীমপরাক্রম ভীম নামে সর্ব্বগুণান্বিত এক নরপতি রাজত্ব করিতেন। কুণ্ডিননগরী তাঁহার রাজধানী ছিল।

রাজা ভীম প্রজাগণকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বোধ করিতেন। তাঁহার মমতা ও সুবিচার প্রাপ্ত হইয়া প্রজাগণ কোন কষ্ট অনুভব করিত না।

মহারাজ ভীমের ঐশ্বর্য্য অবর্ণনীয়। তাঁহার সেই আকাশস্পর্শী প্রাসাদ, বিবিধ রত্নসমুজ্জ্বল কোষাগার ভুবনে অতুলনীয় হইলেও অনপত্যতা নিবন্ধন সমস্তই তাঁহার চক্ষে তুচ্ছ ও নিষ্প্রভ বলিয়া প্রতীত হইত, এবং তিনি তজ্জন্যই আপনাকে একান্ত অসহায় ও হতভাগ্য মনে করিতেন। তিনি ভাবিতেন, নিঃসন্তান ব্যক্তির পক্ষে এই ধনধান্যময়ী পৃথিবী ভীতিবহুল অরণ্যসদৃশ। গুরুতর রাজকার্য্যের অবসানে তিনি যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেন তখন তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী মালবী দেবীর ক্ষুণ্ণ মন, অশ্রুবারিসিক্ত নয়নপল্লব ও বিষণ্ণ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া সমধিক মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইতেন এবং দৈবানুগ্রহে অপত্যলাভেচ্ছায় যত্নবতী হইবার জন্য রাণীকে নানাবিধ উপদেশ দিতেন।

সমহিষী মহারাজ ভীম অপত্যলাভেচ্ছায় বহু দেবদেবীর উপাসনা করিলেন; কিন্তু নিষ্ঠুর অদৃষ্টের নিকট তাহা উপহসিত হইল।

একদিন রাজা ভীম রাজসভায় উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে মহর্ষি দমন সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা পরম সমাদরে দমনকে অভ্যর্থনা করিয়া সিংহাসনে বসাইলেন। মহর্ষি রাজার অভ্যর্থনা ও শুশ্রূষায় সবিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাকে অভীপ্সিত সন্তান প্রাপ্তির বর দান করিলেন। যে নিরপত্যতাহেতু তাঁহার হৃদয় দিবাযামিনী দগ্ধ হইতেছিল আজ মহর্ষির বরে সেই হৃদয়ে আশ্বাসের মলয়-সমীরণ প্রবাহিত হইল।

মহিষী ক্রমে ক্রমে তিন পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করিলেন। মহর্ষি দমনের বরে প্রাপ্ত বলিয়া রাজা ভীম পুত্রত্রয়ের দম, দান্ত ও দমন এবং একমাত্র তনয়ার দময়ন্তী নাম নির্দ্দেশ করিলেন। রাজপুরী সেই স্বচ্ছন্দ সরল শিশুগুলির কমনীয় লাবণ্যে জ্যোতির্ম্ময়, কলহাস্যে মুখরিত এবং ধাবন কুর্দ্দনে প্রমোদপূর্ণ হইয়া উঠিল। সমহিষী রাজা পুত্রকন্যা-গণের কুসুমসুকুমার অনিন্দ্যসুন্দর দেহকান্তি দেখিয়া তৃপ্ত হইলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দময়ন্তীর রূপলাবণ্য বাড়িতে লাগিল। সকলেই দেখিত, সেই পুষ্পপেলবা বালিকার দেহে কি অপরূপ সুষমা। যৌবনের প্রারম্ভে দময়ন্তীর রূপ যেন উথলিয়া উঠিল। স্বভাব-সুন্দরী দময়ন্তীর মোহময়ী মূর্ত্তি যৌবনের পুলকস্পর্শে সমধিক মনোহারিণী হইল। কৌমুদীস্নাতা মাধবিকা যেমন বসন্তের মলয়ানিল সঞ্চারে চারিদিক সৌরভময় করে, নব-উদ্ভিন্নযৌবনা দময়ন্তীও সেইরূপ তাঁহার অলোকসামান্য রূপ ও অসামান্য গুণরাশি লাভ করিয়া চতুর্দ্দিকে আপনার মহিমা বিস্তার করিতে লাগিলেন। বসন্তের মধুময় আবির্ভাবে প্রকৃতিতে যেমন পুষ্পকলিকা জাগিয়া উঠে, তেমনি দময়ন্তীর প্রাণে নবীন যৌবনের প্রীতিস্নিগ্ধ অভিনন্দনে কর্ত্তব্যজ্ঞানের অঙ্কুর জন্মিল। দময়ন্তী কল্পনার তুলিকায় ভবিষ্যৎ জীবনের কত মনোহর চিত্র অঙ্কিত করিলেন। তিনি ভাবিলেন, আত্মবিস্মৃত প্রেমই রমণীর প্রাণ। ভগবতী লোপামুদ্রা, রঘুকুলকমলিনী ইন্দুমতী, লক্ষ্মীস্বরূপিণী রুক্মিণী যে বংশকে ধন্য করিয়াছেন যেন আমিও সেই বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারি।

একদিন বসন্তের মধুময় প্রভাতে দময়ন্তী অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে সখী-গণের সহিত ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক সখী বলিয়া উঠিল, "ঐ দেখ, লতিকাটি কেমন তাহার সুকোমল বাহুদ্বারা এক শ্যামসুন্দর তরুকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে! সহচারিণী আর এক সখী বলিল, "ঐ দেখ, সরসীজলে বিকসিত শতদলের উপরে তরুণ সূর্য্যের স্বর্ণাভা কেমন সোহাগ-চুম্বন আঁকিয়া দিতেছে! সখি, এ মধুর প্রভাতে সর্ব্বত্রই প্রীতির খেলা। কেবল আনন্দ—কেবল উচ্ছ্বাস—কেবল মিলনামোদ।"

দময়ন্তী বলিলেন, "সখি, ভগবানের রাজ্যে গ্রহ নক্ষত্র হইতে পশু পক্ষী, কীটপতঙ্গ চেতন অচেতন, তাবৎ পদার্থই অচ্ছেদ্য প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ। এ বন্ধন কাটাইবার উপায় নাই। সখি, সেই নিমিত্তই রমণী ও পুরুষের প্রাণ পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে চাহিতেছে।
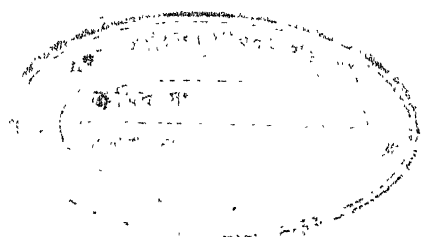
দময়ন্তী দেখিলেন, এক তুষারশুভ্র হংস কলতান করিতে করিতে তাহার নিকটে আসিয়া
নিষধাধিপতি মহারাজ নলের গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিল।—১২২ পৃঃ

সেই অন্যোন্যনির্ভর প্রাণ দুইটির স্বতঃসম্মিলনেই মিলনের আনন্দ বাজিয়া উঠে। সখি, ঐ যে কুসুমকলিকা দেখিতেছ, যেদিন তাহা অলিগুঞ্জনে মুখরিত দেখিবে সেই দিন সে সার্থক। রমণীও যেদিন রমণীত্বের গৌরবে পতিদেবতার প্রণয়পূত সোহাগগুঞ্জনে পুলকিত হইবে সেই দিন সে রমণী ধন্য।” পার্শ্ববর্ত্তিনী এক সখী বলিয়া উঠিল, “হাঁ সখি, কবে আমরা তোমাকে সেইরূপ দেখিব?” দময়ন্তী লজ্জিতা হইলেন।

এইরূপে নানা আমোদে উদ্যান ভ্রমণ করিতে করিতে দময়ন্তী সরোবরতীরে উপনীত হইয়া দেখিলেন, এক তুষারশুভ্র হংস কলতান করিতে করিতে তাঁহার নিকট আসিয়া নিষধাধিপতি মহারাজ নলের গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিল। তিনি হংসের মুখ হইতে নলের অলৌকিক বিবরণ শুনিয়া ভাবিলেন ‘সেই ভাগ্যবান্ কে? মানুষের ত কথাই নাই। তীর্য্যক্ পক্ষিজাতিতেও যে পুরুষের গুণগান করে, না জানি সেই নর-দেবতা কি স্বর্গীয় মহিমা প্রকাশার্থ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।’

দময়ন্তীকে এইরূপ বিস্মিত দেখিয়া হংস বলিল, “রাজকুমারি, যদি তুমি স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি এখনিই নিষধদেশে গমন করি।” দময়ন্তী কোন কথা কহিতে পারিলেন না। কিন্তু এমন ভাব প্রকাশ করিলেন, যাহাতে তিনি মহারাজ নলের রূপগুণের পক্ষপাতিনী হইয়াছেন এইরূপ বোধ হইল।

তখন সেই হংস স্বর্ণ পক্ষ বিস্তার করিয়া নীলাকাশে উড্ডীন হইল। সরোবরনীর পরিত্যাগের সময় যেন উচ্ছলিত সলিলতরঙ্গ হংসের পদযুগল স্পর্শ করিয়া দময়ন্তীর প্রাণের কথাটি জানাইবার জন্য অনুরোধ করিল। হংস পুলকিত প্রাণে কলস্বর করিতে করিতে উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। দময়ন্তী তাহার প্রতি অনিমিষ লোচনে চাহিয়া রহিলেন। এইরূপে হংসদৌত্যে মিলনের দেবতাকে স্মরণ করিয়া দময়ন্তী নলের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন।

ক্রীড়া ও পুষ্পচয়ন উপলক্ষে সখীগণ দময়ন্তী হইতে একটু দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল। এজন্য তাহারা দময়ন্তীর সহিত হংসের কথা কিছুই শুনিতে পায় নাই। কিন্তু একটি হংস উড়িয়া যাইতেছে, আর রাজকুমারী তাহার প্রতি অনিমিষ লোচনে চাহিয়া রহিয়াছেন দেখিতে পাইয়া তাহারা বিস্মিত হইল। সখীগণ নিকটে আসিলে দময়ন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ সখীগণ, তোমরা এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?" এক রহস্যপ্রিয়া সখী উত্তর করিল, "আমরা ভাই, পুষ্পচয়নে ব্যাপৃত ছিলাম এবং আমাদের সখীর গলে দিবার জন্য নবরাগরঞ্জিত মালতীমালা গাঁথিতেছিলাম।"

দময়ন্তী ভাবিলেন, ইহারা কি হংসের সহিত আমার কথাবার্ত্তা শুনিয়াছে ? ইহারা কি নিষধাধিপতি পুরুষর্ষভ নলের কথা জানে ? দময়ন্তী সখীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিষধদেশ কোথায় ? আর নিষধরাজ নল সম্বন্ধে তোমরা কোন কথা শুনিয়াছ কি ?" এক সখী বলিয়া উঠিল, "সেদিন শুনিয়াছি ভাই, তিনি রূপে মদন, বিদ্যায় বৃহস্পতি, শৌর্য্যে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়, ন্যায়বিচারে মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম। যদি বিধাতার করুণায় তিনি আমাদের সখীর—" শুনিয়া দময়ন্তী সখীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার রোষের মধ্য দিয়া চক্ষুতারকা পুলকস্পন্দনে নাচিয়া উঠিতেছিল, আর তাঁহার বিম্বসদৃশ ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির রেখা বিকসিত হইতেছিল। দময়ন্তী সখীগণের নিকট আর আত্মগোপন করিতে পারিলেন না।

৩

একদিন রাজা ভীম স্নানাহার সমাপনান্তে বিশ্রামকক্ষে পর্য্যঙ্কের উপর শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে মহিষী আসিয়া তাঁহার চরণতলে উপবেশন করিলেন। রাণী স্বামীর পদযুগল স্বীয়

উৎসঙ্গদেশে স্থাপন করিয়া হস্তাবর্ত্তন করিতে করিতে বলিলেন, "মহারাজ, আজ আপনার নিকট আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে।"

রাজা। বল রাণি, তোমার আবার কি জিজ্ঞাস্য ?

রাণী। মহারাজ, দময়ন্তী আমার এত বড় হইয়াছে, তাহার বিবাহের কোন আয়োজন করিতেছেন কিনা, আজ তাহাই আমি জানিতে চাই।

রাজা। রাণি, আমি নানা রাজপুত্রের পরিচয় অবগত হইয়াছি, কিন্তু কোন রাজপুত্রই আমার দময়ন্তীর উপযুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি না।

রাণী। কেন নিষধরাজকুমার নল ? শুনিলাম তিনি এখনও অবিবাহিত; আমার ইচ্ছা, আপনি অবিলম্বে নিষধাধিপতির নিকট এই প্রস্তাব করিয়া মন্ত্রীকে প্রেরণ করুন।

রাজা। মহিষি, এ অতি শ্লাঘ্য সম্বন্ধ। কিন্তু নল কি এ সম্বন্ধ গ্রহণ করিবেন ? রাণি, তুমি জান না, নল নররূপে দেবতা। তিনি বিশাল রাজ্যের অধিপতি। আমার সাহস হয় না, তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব করি। আমার দময়ন্তীর কি এমন সৌভাগ্য যে সে নিষধরাজ-মহিষী হইবে !

রাণী। কেন মহারাজ, আপনি ইহা অসম্ভব দেখিতেছেন কিসে ? দময়ন্তী আমার যেরূপ সুশীলা, যেমন শিক্ষিতা, এরূপ নারীরত্ন যে সকলেরই কাম্য। আমার বিশ্বাস, আপনি নিষধাধিপতির নিকট এ প্রস্তাব করিলে তিনি কখনই তাহা প্রত্যাখ্যান করিবেন না। আরও মহারাজ, কুসুমের সৌরভের মত যশঃ ও সদ্‌গুণকাহিনী আপনিই বিস্তৃত হইয়া পড়ে। নচেৎ কোথায় বিদর্ভ, আর কোথায় বা নিষধ। নিষধরাজের এই যে কীর্ত্তি-

কাহিনী আপনি বর্ণন করিলেন, কে তাহা আপনার রাজ্যে বহন করিয়া আনিয়াছে? এইরূপ মহারাজ, কে বলিল আমার দময়ন্তীর এতাদৃশ নারীত্বের গৌরব নিষধরাজ-সিংহাসন স্পর্শ করে নাই?

রাজা শুনিয়া একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "রাজ্ঞি, আমি নিষধাধিপতির নিকট এ-প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি।"

রাণী। মহারাজ, আপনি সঙ্কুচিত হইবেন না। নাথ, পঙ্কজাত বলিয়া কি কমলিনী দেবতার চরণে স্থানপ্রাপ্ত হইতে পারে না? মহারাজ, গুণই সকলের প্রধান। আমার দময়ন্তী যে রূপে রতি, ঐশ্বর্য্যে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। মহারাজ, উৎপত্তিস্থল লইয়া দ্রব্যের বিচার হয় না; তাহা হইলে জগতে মণির আদর থাকিত কি? হইতে পারে নিষধদেশ আপনার রাজ্য অপেক্ষা সমৃদ্ধ, কিন্তু মহারাজ, নিশ্চয় জানিবেন, আপনার এই নারীত্ব ও দেবীত্ব গুণের একমাত্র মিলনভূমি দময়ন্তী হইতে আপনার ঐশ্বর্য্য সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। নিশ্চয়ই নিষধাধীশ আপনার দময়ন্তীর রূপগুণের পক্ষপাতী হইয়াছেন। মহারাজ, আমি যেন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, আমরা যেমন নল সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখিয়াছি, নলের হৃদয়েও তেমনি বিদর্ভদেশ ও বিদর্ভ-রাজকুমারীর প্রতিচ্ছায়া পড়িয়াছে।

রাজা। রাণি, তোমার কথায় আশ্বস্ত হইলাম। আচ্ছা, যদি নল আমার দময়ন্তীর রূপগুণের পক্ষপাতী হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার নিকট আর মন্ত্রীকে প্রেরণ করিবার আবশ্যকতা কি। কন্যার স্বয়ম্বর-প্রথা আমাদের কুলক্রমাগত। আমি দময়ন্তীর স্বয়ম্বর

ঘোষণা করি। মৎপ্রেরিত দূত নিষধরাজ্যে গমন করিয়া দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের কথা বিঘোষিত করুক। যদি মহারাজ নল এ-বিষয়ে অভিলাষী থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি স্বয়ম্বরসভায় আগমন করিবেন—আর আমাদেরও সঙ্কল্প সিদ্ধি হইবে।

রাণী। আচ্ছা, তাহাই হউক।

রাজার আদেশে অবিলম্বেই রাজকুমারীর স্বয়ম্বরের বিপুল আয়োজন হইতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যেই স্বয়ম্বরের সংবাদ বিদর্ভরাজধানীতে প্রচারিত হইয়া গেল।

৪

রাজকুমারীর স্বয়ম্বর শুনিয়া প্রজাগণের আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাহারা মনের আনন্দে আপনাপন গৃহদ্বার সাজাইতে আরম্ভ করিল এবং সকলেই স্বয়ম্বরদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে নানা রাজ্য হইতে স্বয়ম্বরাহূত রাজা ও রাজানুচরগণের আগমনে কুণ্ডিননগরী অপূর্ব্ব শ্রীশালিনী হইয়া উঠিল। নগরীর বহির্দ্দেশে অগণ্য পটনিবাস স্থাপিত হইল। সমবেত রাজন্যগণের বিপুল ঐশ্বর্য্যে, হস্তী ঘোটকাদির বৃংহণ ও হ্রেষারবে, সৈন্যগণের কোলাহলে, কুণ্ডিননগরী পর্ব্বকালীন সমুদ্রের মত সঙ্ক্ষুব্ধিত হইয়া উঠিল। রাজপথ নবনির্ম্মিত তোরণসমূহে সুশোভিত হইল। অগণ্য পতাকা যেন নগরীর প্রাসাদের উচ্চতা হইতে মস্তক উত্তোলিত করতঃ বায়ুকম্পিত হইয়া স্বয়ম্বরের সংবাদ ও বিদর্ভদেশের আনন্দ-সমাচার প্রদান করিতেছিল। ফলতঃ রাজা ভীম তনয়ার স্বয়ম্বর উপলক্ষে উৎসব আয়োজনে কিছুমাত্র যত্নের ত্রুটি করেন নাই। ক্রমে স্বয়ম্বরের নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইল।

মহারাজ নল দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে নিমন্ত্রিত হইয়া বিপুল আড়ম্বরে আসিতেছিলেন। অলোকসামান্য রূপবতী দময়ন্তীকে লাভ করিবার বাসনায় ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু ও যম স্বর্গ হইতে আগমন করিতেছিলেন; পথিমধ্যে তাঁহাদের সহিত নলের সাক্ষাৎ হইল। নল ভাবিলেন, মানবীর স্বয়ম্বরসভায় দেবতার আগমন! এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার কখন ত দেখি নাই। না জানি, বিদর্ভরাজকুমারী কত সুন্দরী। নল মানসতুলিকায় সেই বরবর্ণিনীর অনুপম চিত্রপট আঁকিতে লাগিলেন।

দেবতাগণও নলের অপরূপ রূপ ও সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া আপনাদের ঐশ্বর্য্যের প্রতি হীনশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং স্থিরবিশ্বাস করিলেন, স্বয়ম্বর-সভায় নল উপস্থিত হইলে নিশ্চয়ই সেই রাজ-কুমারীর করধৃত বরমাল্য এই ভাগ্যবানেরই কণ্ঠদেশে আলম্বিত হইবে। এইরূপ কল্পনা করিয়া দেবগণ এক কৌশলজাল বিস্তার করিলেন।

ইন্দ্র, অগ্নি বায়ু ও যমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "নলের যেরূপ ভুবনমোহন রূপ ও অতুল সমৃদ্ধি দেখিতেছি তাহাতে আমার মনে হয়, সেই রমণীরত্ন দময়ন্তী নিশ্চয়ই নলকে বরমাল্য প্রদান করিবে। এজন্য আমি ইচ্ছা করিতেছি, এমন কোন ব্যবস্থা করা হউক, যাহাতে নল স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হইতে অসমর্থ হন। তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।" সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ইন্দ্র বলিলেন, "দেবগণ, নল অতীব বিনয়ী ও সাধু। অধিকন্তু তিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ। আমাদের অনুরোধে নল দূতবেশে রাজকুমারীর নিকট গমন করিয়া আমাদের অভিপ্রায় বিবৃত করিলে রাজকুমারী আমাদের চারি জনের মধ্যে একজনের প্রতি নিশ্চয়ই অনুরাগবতী হইবেন।" মানবীর সৌন্দর্য্যে অন্ধ দেবগণ বুঝিলেন না, সৌরকরেই কমলিনী বিকশিত হয়, বাসন্ত মলয়ানিল সঞ্চারেই প্রকৃতির হৃদয়ে প্রেমাঙ্কুর জাগিয়া উঠে, চন্দ্রকিরণেই চকোরীর পিপাসার শান্তি হয়।

দেবগণ আত্মপরিচয় দিয়া নলকে বলিলেন, "হে নিষধরাজ, তুমি আমাদিগের অতীব প্রিয়। আশা করি, তুমি আমাদিগের একটি কথা রক্ষা করিবে।"

নল সবিনয়ে বলিলেন, "দেবাদেশ পালন করিতে পারিলে এ অধম চরিতার্থ হইবে। বলুন, আমি আপনাদের কোন্ প্রিয় কার্য্য সাধন করিব।"

ইন্দ্র বলিলেন, "হে প্রিয়ভাষী নল, তোমার সৌজন্যে আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি! আমরা অলোকসামান্যা দময়ন্তীকে লাভ করিবার জন্য স্বর্গ হইতে আসিতেছি। তুমি দূতবেশে দময়ন্তীর নিকটে গিয়া এই সংবাদ বিদিত কর এবং যাহাতে দময়ন্তী আমাদের চারি জনের মধ্যে একজনকে বরমাল্য প্রদান করেন তজ্জন্য সচেষ্ট হও।"

সহসা নলের হৃদয়ে মহাবিষাদের সঞ্চার হইল। নল ভাবিলেন, আমি এত দিন যাঁহার মোহনমূর্ত্তিকে হৃদয়সিংহাসনে স্থান দান করিয়াছি—শয়নে স্বপনে জাগরণে যাহা আমার জীবনের সঙ্গিনী, এই জীবনসংগ্রামে যাঁহার আশ্বাসবাণী আমাকে উৎসাহিত করিবে, যাঁহাকে আমি ভবিষ্যজীবনের একমাত্র সহচরী বলিয়া কল্পনা করিয়াছি, কিরূপে তাঁহাকে অন্যের প্রতি অনুরাগিণী করিবার জন্য প্রয়াস পাইব। এ যে অতি অসম্ভব কথা! সজীব দেহ হইতে শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিবার এ যে বিফল প্রয়াস, এ যে স্বহস্তে আত্মবিনাশ। সহসা কন্দর্পগঞ্জিত সেই মুখখানিতে বিষাদের কৃষ্ণচ্ছায়া পতিত হইল দেখিয়া দেবগণ বলিলেন, "নল, তোমার প্রতিশ্রুতি স্মরণ কর। তুমি পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছ। তোমার আত্মবিস্মৃত উদাসভাব ও উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখিয়া আমরা তোমার মনের ভাব বুঝিয়াছি। কিন্তু হে নিষধাধীশ, সত্যই পুরুষের প্রাণ, আশা করি তুমি ইহা বিস্মৃত হইবে না।"

সহসা নলের চমক ভাঙ্গিল। নল বুঝিলেন, যথার্থই ত! সত্যই পুরুষের প্রাণ, সত্যরক্ষাই পুরুষার্থ; আমাকে সত্যরক্ষা করিতেই হইবে। যত বড় গুরুতর বিষয় হউক না কেন, সত্যের নিকট তাহাকে অবনমিত করিয়া দিতে হইবে।

সত্যসন্ধ নলের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নল বলিলেন, "দেবগণ, আমি এইক্ষণেই বিদর্ভরাজকুমারীর নিকট গমন করিতেছি। কিন্তু রাজান্তঃপুরের দুষ্প্রবেশতা অতিক্রম করিয়া কিরূপে রাজকুমারীর নিকট উপস্থিত হইব অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার উপায় করিয়া দিন।"

দেবতাগণ নলের উক্তি শ্রবণ করিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। তখন ইন্দ্র নলকে মায়াপ্রচ্ছন্নতা বর দান করিলেন। নল সেই বরপ্রভাবে অন্যের অলক্ষিতে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারিবেন।

দেবকার্য্য সাধনের জন্য নল রাজকুমারীর মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নলের হৃদয়ে দুইটি প্রবল পক্ষ আসিয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিল। একটি সত্য, অন্যটি অনুরাগ।

৫

আজ দময়ন্তীর স্বয়ম্বর। স্বয়ম্বরোচিত বেশভূষায় সজ্জিতা দময়ন্তী রহস্যপ্রিয়া সখীগণের রহস্যালাপে উৎফুল্ল হইয়া স্বয়ম্বর-সভায় গমনার্থ অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা প্রকোষ্ঠদ্বার কাহার পুলকস্পর্শ অনুভব করিয়া উন্মুক্ত হইয়া গেল। দময়ন্তী দেখিলেন, এক সুবেশ-সুন্দর যুবাপুরুষ সেই গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সখীগণ সহ দময়ন্তী সেই পরমসুন্দর যুবা পুরুষের সহসা আবির্ভাবে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। রাজকুমারী দময়ন্তী আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। শূন্য আসন যেন সাগ্রহে আগন্তুককে অভিনন্দন করিতে লাগিল।

চারুহাসিনী সখীগণের মুখে ভীতিমিশ্রিত বিস্ময়ের ছায়াপাত দেখিয়া দময়ন্তী আগন্তুককে যথাবিধি অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "আচারবিৎ মহাত্মারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কোন অপরিচিত পুরুষের পক্ষে অন্তঃপুরে প্রবেশ করা সর্ব্বথা অনুচিত, তথাপি আপনি যখন অজ্ঞাতসারে আমার মন্দিরে আগমন করিয়াছেন তখন আপনি আমার অতিথি—আমার নমস্য। কৃপাপূর্ব্বক আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। মহাশয়, ইহা অন্তঃপুরের বহিঃপ্রকোষ্ঠ। সুতরাং এখানে আপনার উপযুক্ত আসনের ব্যবস্থা নাই। দেখুন, আমার সখীগণও আপনার সহসা আবির্ভাবে সভয়বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছে। মহাভাগ, আপনাকে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করিতে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া এই অসহয়া বালিকার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন না।"

হায় অসহয়া বালিকা, তুমি নীরবে তোমার জীবিতনাথের যে অভ্যর্থনা করিয়াছ, তাহা কত মধুর, কত শান্ত, কত উদার! তোমার ঐ বাক্যসুধাই যে এই নবীন অতিথির জন্য মধুপর্ক। তোমার হর্ষ-বাষ্পই যে আজ অতিথিসৎকারের জন্য পাদ্য ও অর্ঘ্য। তোমার হৃদয়-সিংহাসনই যে অতিথির জন্য আজ প্রসারিত। প্রেমের দেবতা যেন নেপথ্য-দেশ হইতে বলিতেছিল, বালিকা, আজ রমণীজীবনের তোরণ-দ্বারে জীবন-দেবতার এই অপূর্ব্ব অভিনন্দন বুঝিতে পারিলে না।

দময়ন্তী সম্মুখস্থ এক আসনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "হে মহাভাগ, এখানে অন্য কোন আসনের সমবধান নাই। এই আসন আপনার অনুপযুক্ত হইলেও অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহাতেই উপবেশন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন।" দময়ন্তীর রূপরাশি দর্শনে আত্মহারা নল তথাপি নিরুত্তর।

দময়ন্তী নির্ব্বাক্‌মৌন পুরুষবরকে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া সবিনয়ে বলিলেন, "মহোদয়, আপনি কে এবং কিজন্য এখানে আগমন করিয়াছেন? অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করুন। নিশ্চয়ই আপনি

সামান্য পুরুষ নহেন, নচেৎ এই সহস্রদৌবারিকরক্ষিত অন্তঃপুর-প্রকোষ্ঠে আপনি কিরূপে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন? আপনার দেহের কমনীয়তা বীরত্বের সমাবেশে কেমন মধুর! আপনার অঙ্গ-সৌন্দর্য্য দর্শনে মনে হয়, যেন আপনি সাক্ষাৎ কুসুমধনু। কিন্তু পুষ্পধন্বা যে অনঙ্গ বলিয়া জানি। তবে কি আপনি অশ্বিনীকুমার? না, তাহাও ত হইতে পারে না; যেহেতু অশ্বিনীকুমার যে যুগলরূপে বিদ্যমান। মহাশয় কে আপনি? আপনি কোন্ দেশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, এবং আজ এই স্বয়ম্বরসভাগমনোদ্যতা রাজকুমারীর প্রকোষ্ঠে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন বলিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন।"

নল স্বীয় অশান্ত হৃদয় কথঞ্চিৎ স্থির করিয়া বলিলেন, "রাজ-কুমারি, আমি দেবদূত,—কোন দৈব আদেশ আপনাকে জানাইবার জন্য এস্থানে আগমন করিয়াছি।"

দময়ন্তী। বলুন, দেবতারা আমার প্রতি কি আদেশ করিয়াছেন।

নল। শোভনে, আপনার স্বয়ম্বরে দেবরাজ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও ধর্ম্মরাজ যম আগমন করিয়া নগরোপকণ্ঠস্থ এক চত্বরে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা আপনার রূপগুণের একান্ত পক্ষপাতী। তাঁহাদের ইচ্ছা, আপনি তাঁহাদের মধ্যে এক জনকে পতিত্বে বরণ করুন।

দময়ন্তী। মহাভাগ, আপনি তাঁহাদের চরণে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবেন, আমি তাঁহাদের এ আদেশ পালন করিতে পারিব না। যেহেতু আমি আমার হৃদয় অন্য একজনকে দান করিয়াছি। দেবগণই ধর্ম্মরক্ষা করেন। তাঁহাদের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা, যেন তাঁহাদের অনুগ্রহে আমি স্বয়ম্বর-সভায় আমার বাঞ্ছিতকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার গলে বরমাল্য অর্পণ করিতে পারি।

নল। শুচিস্মিতে, আপনি এ কি কথা বলিতেছেন? ত্রিদশনাথ ইন্দ্র, জগৎ-পাবক বৈশ্বানর, জলেশ্বর বরুণ, মৃত্যুপতি ধর্ম্ম, আপনার পাণিগ্রহণার্থ স্বয়ম্বর-সভায় সমুপস্থিত। এই সকল ত্রিলোকবন্দ্য সুরশ্রেষ্ঠকে উপেক্ষা করিয়া আপনি সামান্য মানবের কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করিবেন?

দময়ন্তী। মহাশয়, এ আপনার কিরূপ কথা? এই জগতে যাহার যাহা ন্যায্য অধিকার তাহার তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমি মানবী। আমি নরদেবতাকেই পতিত্বে বরণ করিয়া ধন্য হইব। আমি দেবীত্ব চাই না।

নল। দেবি, দেবতারা চিরদিনই গুণের আদর করিয়া থাকেন। ইন্দ্র দেবতা হইয়াও পুলোমনন্দিনী শচীকে, ভগবান বৈশ্বানর মাহিষ্মতীরাজ নীলধ্বজের তনয়া স্বাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অলোকসামান্য রূপে-গুণে আপনিও দেব-আকাঙ্ক্ষিত। সুতরাং আশা করি, আপনি দেবতাগণের বাসনানুযায়ী কার্য্য করিতে অন্যথা করিবেন না।

দময়ন্তী। দেবদূত, চরিত্রবলেই নরনারী ধন্য হয়। আমার সেই পুরুষাদর্শ পতি চরিত্রবলে ত্রিলোকবিখ্যাত। সুতরাং তিনি দেবতা হইতে ন্যূন কেমন করিয়া বলিব? দেখুন, দেবরাজ—যাঁহার বামভাগে চিরযৌবনা শচীদেবী শোভা পাইতেছেন, তিনি আজ সামান্যা মানবীর রূপজ মোহে মানবীর স্বয়ম্বরে আগমন করিয়াছেন। সর্ব্বশুচি অগ্নি-দেব—তিনিও আজ স্বাহাদেবীর উজ্জ্বল রূপরাশি বিস্মৃত হইয়া এক হীনা মানবীকে কামনা করিতেছেন। সুপ্রশান্ত বরুণ—তিনি অপরূপ রূপবতী বরুণানীর স্নেহকোমল ভুজলতার স্নিগ্ধ আলিঙ্গন ভুলিয়া হীনা মানবীর রূপে

আত্মহারা; আর ধর্ম্মরাজ—যিনি ধর্ম্মের রক্ষক, তিনিও আজ ন্যায়ের মর্য্যাদা ভুলিয়া নারীর প্রাণকে দেবীত্বের প্রলোভনে অতলে ডুবাইবার প্রয়াস পাইতেছেন। আমি এই সকলের সমাদর করিব কিরূপে? মহাভাগ, অন্যের প্রদত্ত ধনে কাহারও গৌরব বৃদ্ধি হয় না! স্বোপার্জ্জিত ধনেই প্রকৃত গৌরব। এই জন্যই আমি দেবতাদের স্বেচ্ছা-প্রদত্ত দেবীত্বের অভিলাষিণী নহি। আমি তাঁহাদের কৃপাকাঙ্ক্ষিণী। অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিবেন, যেন তাঁহাদের কৃপায় আমার নারীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে।

নল, বিদর্ভরাজকুমারীর এইরূপ চরিত্রবল দর্শনে অতীব প্রীত হইয়া বিদায় গ্রহণে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। দময়ন্তী বলিলেন, "মহাত্মন্, আপনার এ আচরণ প্রশংসনীয় নহে। আপনি বিনা পরিচয়ে এস্থান হইতে যাইতে চাহিতেছেন কিরূপে? শাস্ত্রে বলে, কোন দুই ব্যক্তির মধ্যে চারিটি কথা হইলেই তাহাদের বন্ধুত্ব বন্ধন হয়। আপনার সহিত আমার যখন এত কথা হইয়াছে তখন নিশ্চয়ই আপনার সহিত আমার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে; সম্ভবতঃ দেবদূতের নিকট ইহা অপরিজ্ঞাত নহে।"

নল বলিলেন, "বরবর্ণিনি, আমার অন্য পরিচয়ের আবশ্যকতা নাই। আমি দেবদূত—ইহাই যথেষ্ট।"

দময়ন্তী বলিলেন, "বড় দুঃখের কথা যে, রাজকন্যার অন্তঃপুরে আগত পুরুষ ন্যায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া বিনা পরিচয়ে স্থান পরিত্যাগে সাহসী হইতেছেন!"

এইবার নল বিপদে পড়িলেন। আত্মপরিচয় না দিয়া কিরূপে তিনি সেই স্থান ত্যাগ করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। নল বলিলেন, "রাজকুমারি, সাধুগণ কখনও নিজের মুখে নিজের নাম উচ্চারণ করেন না। আমি তবে কিরূপে তাহা করিতে পারি? আর আপনার ইহা

জানিবারই বা বিশেষ আবশ্যকতা কি? আর যদি বিশেষ কৌতূহল হইয়া থাকে তাহা হইলে এই জানিবেন যে, আমি বিদর্ভরাজতনয়ার স্বয়ম্বরে আহূত জনৈক রাজকুমার।"

সহসা দময়ন্তীর প্রাণে আশার ক্ষীণ রশ্মি পতিত হইল। দময়ন্তী হংসমুখে মহারাজ নলের যে অমানুষিক গুণ ও অবদানের কথা শুনিয়াছিলেন, আজ যেন আগন্তুকের মূর্ত্তিতে তাহাই দেখিতে পাইলেন। দময়ন্তী ভাবিতে লাগিলেন, যদি এই সময়ে সেই হংসদূতের সহিত আর একবার সাক্ষাৎ হইত তাহা হইলে আর এই ঘোর সন্দেহের আবর্ত্তে পড়িয়া কষ্ট পাইতে হইত না। সহসা তাঁহার প্রাণে অদৃষ্টপূর্ব্ব নিষধরাজের ছবি প্রতিবিম্বিত হইল। দময়ন্তী দেখিলেন, তাঁহার দৃষ্টি আগন্তুকের চক্ষের দিকে নিবদ্ধ হইলেই যেন কি এক লজ্জা তাহাকে ম্লান করিয়া দেয়, কেমন এক সঙ্কোচ যেন হৃদয়কে পীড়া দান করে। দময়ন্তী ভাবিতেছেন, এই সৌম্যদর্শন যুবক যদি নিষধরাজকুমার হইতেন—

ক্ষণকাল পরে হৃদয়ের আবেগ দমন করিয়া দময়ন্তী বলিলেন, "রাজকুমার, যদি স্বীয় নামগ্রহণে আপত্তি থাকে তাহা হইলে বলুন, আপনি কোন্ রাজ্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন।"

নল কথাটা চাপা দিয়া বলিলেন, "রাজকুমারি, আমি দেবদূত সুতরাং কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ রীতিবিরুদ্ধ নহে। আপনার বাঞ্ছিত পুরুষটি কে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

দময়ন্তী বলিলেন, "রাজকুমার, এ অতি আশ্চর্য্য কথা! আপনি এখনও আমার নিকট আত্মগোপন করিতেছেন, অথচ চতুরতাপূর্ব্বক আপনার প্রশ্নের উত্তরপ্রাপ্তির আশা করিতেছেন? আপনি কি জানেন না, যিনি যেমন তাঁহার প্রতি তেমনি ব্যবহার করিতে হয়!"

নল বলিলেন, "প্রিয়বাদিনি, দূতের পক্ষে আত্মপরিচয় প্রদান করা নিষিদ্ধ সুতরাং আমি সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আমার পরিচয় দিই

নাই। কৌতুক প্রদর্শন ইহার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু আপনি আপনার অতিথির প্রতি অন্যায় আচরণ করিতেছেন।"

শুনিয়া দময়ন্তী অধিকতর লজ্জিত হইলেন। হৃদয় প্রকাশ করিতে চাহিতেছিল কিন্তু ওষ্ঠদ্বয় যেন চাপিয়া রাখিতেছিল! কিছুতেই মুখ হইতে সে-কথা বাহির হইল না।

তখন দময়ন্তীর সঙ্কেতে পার্শ্ববর্ত্তিনী এক সখী বলিয়া উঠিল, "দেবদূত, আমাদের সখী নিষধরাজকুমার নলকে হৃদয় দান করিয়াছেন। সখী সর্ব্বক্ষণ সেই মহাপুরুষের চিন্তায় আত্মহারা। আপনি দেবগণের চরণে প্রণাম জানাইয়া বলিবেন, যেন তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে স্বয়ম্বর-সভায় রাজকুমারী তাঁহার বাঞ্ছিতের কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করিতে পারেন।"

নল বলিলেন, "সুশীলে, নিষধরাজকুমারকে তোমরা কখনও দেখিয়াছ কি? বোধ হয় না, কারণ তাহা হইলে তোমাদের সম্মুখে এ প্রহেলিকা উপস্থিত হইত না। আমিই নিষধরাজকুমার"—সঙ্গে সঙ্গে দেবদূত অদৃশ্য হইলেন।

"আমিই নিষধরাজকুমার," দময়ন্তী নলের মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া পুলকবিহ্বল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ক্ষণপরেই নলের প্রতি আপনার আচরণ স্মরণ করিয়া কাতর স্বরে বলিলেন, "সখি, তবে ত আমি নিষধরাজকুমারের প্রতি অন্যায় করিয়াছি।"

পার্শ্ববর্ত্তিনী এক সখী বলিয়া উঠিল, "না রাজকুমারি, তোমার ইহাতে কোনও অন্যায় হয় নাই। বরং তুমি অপরিচিত আগন্তুকের প্রতি যথেষ্ট সদ্ব্যবহারই করিয়াছ। মানুষ ত অন্তর্য্যামী নহে! তাহা হইলে দেবতা ও মানুষে প্রভেদ কি রহিল। সখি, চিন্তিত হইও না, দূতবেশী নিষধেশ তোমার সদাচারে তুষ্টই হইয়াছেন।"

এমন সময়ে পুরনারী-পরিবৃতা মহিষী সে-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই স্বয়ম্বরোচিত বেশভূষা-সজ্জিতা তনয়ার শিরে

দূর্ব্বাক্ষত দিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ বলিলেন, "মা দময়ন্তি, তোমার বাসনা পূর্ণ হউক, দেবগণ তোমার সহায় হউন।" পুরস্ত্রীগণ একে একে দময়ন্তীর শিরে ধানদূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। দময়ন্তী মাতার চরণে প্রণাম করিয়া ধাত্রীর সহিত স্বয়ম্বর-সভার দিকে অগ্রসর হইলেন।

৬

রাজপ্রাসাদের সম্মুখেই স্বয়ম্বরসভা। মর্ম্মরনির্ম্মিত উচ্চ স্তম্ভোপরি চন্দ্রাতপ প্রলম্বিত হইয়াছে। স্তম্ভগাত্র নানা বর্ণের পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত। বিবিধ সুরভি কুসুমের মনোহর মালা চতুর্দ্দিকে সুবাস বিকীর্ণ করিতেছে। স্বয়ম্বর-সভার চারিদিকে চারিটি নবনির্ম্মিত তোরণ। এই তোরণ চতুষ্টয় বিবিধ পত্রপুষ্পফলে সুশোভিত। ভারতের নানা রাজ্য হইতে সমাগত রাজকুমারগণ পৃথক্ পৃথক্ আসনে উপবেশন করিয়া আছেন—যেন নীল আকাশতলে জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রপুঞ্জের আবির্ভাব হইয়াছে। সুবেশ সুন্দর কান্তিমান্ অনুচরগণ জনবহুল সভায় চন্দ্রিকা-শুভ্র চামর ব্যজনে রাজকুমারগণের স্বেদসলিল নিবারণ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে সুগন্ধ বারিপূর্ণ কৃত্রিম উৎস। বায়ুপ্রবাহ সেই সকল উৎসের শীকরসম্পৃক্ত হইয়া স্বয়ম্বরসভাকে শীতল ও স্নিগ্ধ করিতেছে। চতুর্দ্দিকে সুসজ্জিত মঞ্চশ্রেণীর উপরে অসংখ্য দর্শকের সমারোহ।

শুভমুহূর্ত্তে দময়ন্তী স্বয়ম্বরসভায় প্রবেশ করিলেন। অমনি রাজপ্রাসাদ হইতে শঙ্খধ্বনি ও নারীকণ্ঠনিঃসৃত হুলুধ্বনি সমুত্থিত হইল। তোরণদ্বারের সমীপস্থ উচ্চ মঞ্চের উপর হইতে নহবতের মধুর স্বর আসিয়া স্বয়ম্বরসভাকে প্রমোদপূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল।

দময়ন্তী সভাপ্রবেশ করিবামাত্র সহস্র নেত্র তাঁহার উপর পতিত হইল। সেই জনবহুল সভায় নানা ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টির মধ্যে দময়ন্তীর

হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া নতমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সভাস্থ তাবৎ রাজকুমার এবং দর্শকগণ আজ রাজকুমারী দময়ন্তীর স্বয়ম্বরোচিত বেশভূষা দর্শনে মনে করিলেন দময়ন্তী বুঝি বিধাতার অপূর্ব্ব রচনা। বোধ হয় বিধাতা তাঁহার সৃষ্টির সকল সৌন্দর্য্যের সমাবেশে এই সর্ব্বশোভাময়ী রমণীমূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। সকল রাজপুত্রই ভাবিতে লাগিলেন, না জানি এই বরবর্ণিনীর হস্তধৃত বরমাল্য আজ কোন্ ভাগ্যবানের কণ্ঠে আশ্লিষ্ট হইবে।

রাজপুরোহিতের আদেশে তৎক্ষণাৎ জনকোলাহল ও বাদ্যনিনাদ নিবারিত হইল। অবিলম্বে বৈতালিক আসিয়া রাজকুমারগণের পরিচয় ও গুণাবলি কীর্ত্তন করিতে লাগিল। কিন্তু দময়ন্তীর শ্রবণে বৈতালিকের একটি কথাও প্রবিষ্ট হইতেছিল না। দময়ন্তী যে-দেবতার অন্বেষণ করিতেছিলেন সে-দেবতার পরিচয় না পাইয়া রাজকুমারগণকে যথোচিত অভিবাদনান্তে সে-স্থান ত্যাগ করিয়া স্বয়ম্বরসভার অপরাংশে উপস্থিত হইলেন।

এ যে বড় কঠিন স্থান। এই স্থান যে দুইটি প্রীতিধারার স্বতঃসম্মিলনে চিরপবিত্র হইবে। জাহ্নবীযমুনারূপিণী দুইটি প্রীতি-ধারার মিলন-ক্ষেত্রে সহসা এক প্রহেলিকা!

দময়ন্তী সেই স্থানেই উপস্থিত হইলেই বৈতালিক বলিয়া উঠিল, "রাজকুমারি, এই যে পুরোভাগে সকল সুলক্ষণযুক্ত উন্নতদেহ রাজ-কুমারকে দেখিতেছেন ইনি নিষধাধিপতি মহারাজ নল। ইনি সর্ব্বদা অনলস। শাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ জ্ঞান এবং ধনুর্ব্বেদে ইনি অত্যন্ত পারদর্শী। ইনি বিপন্নশরণ, জিতেন্দ্রিয় এবং প্রজাবৎসল। ইঁহার কমনীয় দেহে রূপ-লাবণ্য ও রাজশ্রীর অপূর্ব্ব সমন্বয়।"

দময়ন্তীর প্রাণ যে এতক্ষণ এই দেবতারই অন্বেষণ করিতেছিল। আজ বৈতালিকের এই মধুর কথা শুনিয়া হৃদয়ের উচ্ছলিত প্রীতিরাশি
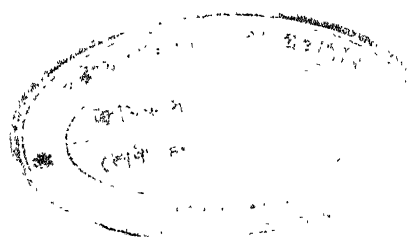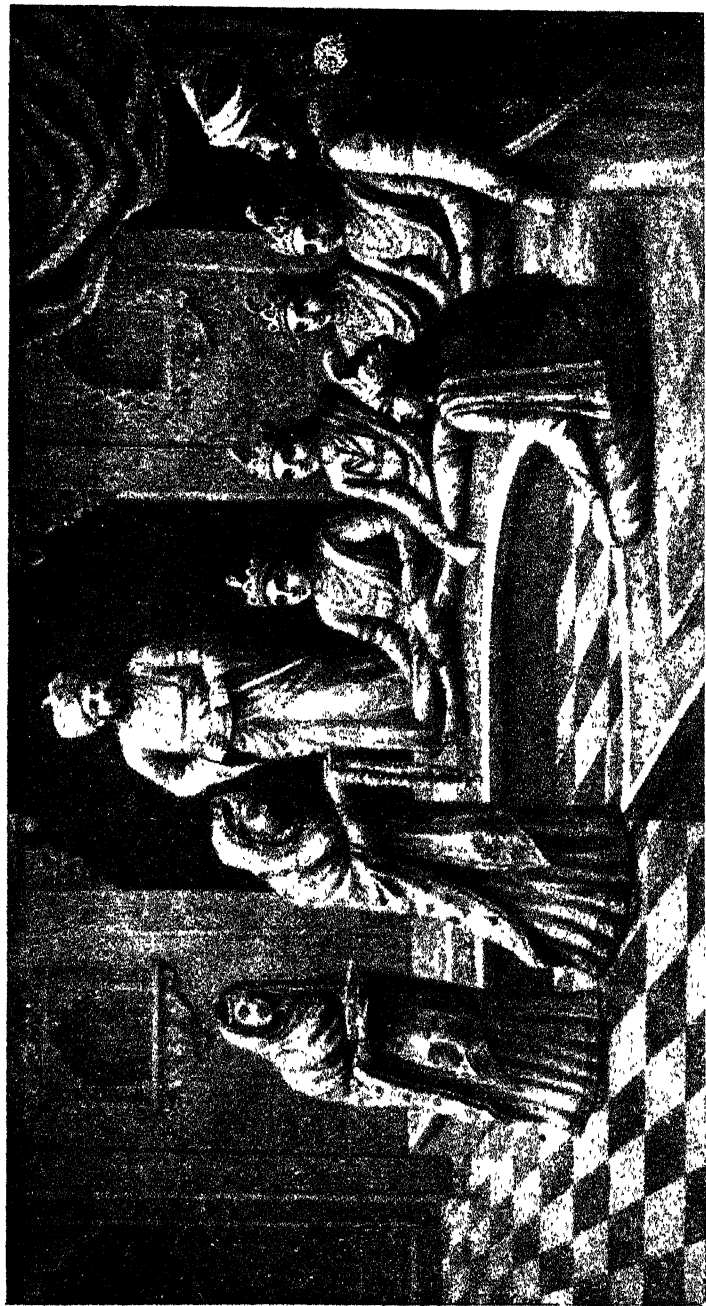
দময়ন্তী কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "হে দেবগণ, আপনারা ধর্ম্মের রক্ষক, আপনাদের করুণায় যেন আমার সতীধর্ম্ম ব্যাহত না হয়।" —১১২ পৃঃ

শান্ত করিয়া সলজ্জ হাসিতে মুখখানি পবিত্র করতঃ দময়ন্তী সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন এ কি প্রহেলিকা! স্বয়ম্বরসভায় অনলতুল্য উজ্জ্বল পঞ্চ নলমূর্ত্তি! ভীমাত্মজা দেখিয়া বিস্মিত, স্তম্ভিত ও ভীত হইলেন! তাঁহার করধৃত পুষ্পমালা কম্পিত হইয়া উঠিল। ললাটে ঘর্ম্ম সঞ্চার হইল, দময়ন্তী দেবগণের ছলনা বুঝিতে পারিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "হে দেবগণ, আপনারা ধর্ম্মের রক্ষক, আপনাদের করুণায় যেন আমার সতীধর্ম্ম ব্যাহত না হয়। আমি যেন আমার মানসপতি নিষধরাজকুমারকে চিনিতে পারি। হে দেবগণ, আমি হীনা মানবী। আমাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়া আপনারা দেবত্বের সম্মান হইতে স্খলিত হইবেন না।" এই কথা বলিতে বলিতে বর্ষাবারি-বিধৌত কমলিনীর ন্যায় শোভনা দময়ন্তীর বিশাল লোচনযুগল অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তখন সেই সতীর অশ্রুজলের ঔজ্জ্বল্যে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতাগণের বক্ষঃশোভী মন্দারমালা মলিন হইয়া গেল।

সহসা দময়ন্তীর স্মরণ হইল, দেবতাগণের পদ মৃত্তিকা স্পর্শ করে না এবং দেবচক্ষু পলকশূন্য। দময়ন্তী সাহসে ভর করিয়া সেই অভিন্নরূপধারী পঞ্চমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিলেন, তাঁহাদের মধ্যে চারিটির নেত্র পলকহীন এবং পদও ভূমিস্পর্শশূন্য।

দময়ন্তী এই প্রভেদ অনুভব করিয়া অন্যতমের কণ্ঠদেশে ভগবতী দাক্ষায়ণীর পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া সেই বরমাল্য পরাইয়া দিলেন। দেখিলেন, ইন্দ্রাদি দেবতাচতুষ্টয় মুহূর্ত্তমধ্যে স্বীয় রূপ পুনর্গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, "ধন্য দময়ন্তী, তোমার এই পুণ্যকাহিনী চিরকাল ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।" এই বলিয়া দেবগণ অন্তর্হিত হইলেন।

দময়ন্তী যে মুহূর্ত্তে নলকে বরমাল্য প্রদান করিলেন, তন্মুহূর্ত্তেই সেই শান্ত স্বয়ম্বর সভা সহস্রবামাকণ্ঠনিঃসৃত হুলুধ্বনিতে, পুরনারী-

নিনাদিত শঙ্খনিঃস্বনে, সমবেত জনসঙ্ঘের কলরবে এবং নানা বাদিত্রনিনাদে মুখরিত হইয়া উঠিল।

সকলেই বলিতে লাগিল, "ধন্য দময়ন্তী, মানসিক বলে দেবতার লীলা ব্যর্থ করিয়াছেন; ধন্য নিষধরাজকুমার, এহেন রমণীরত্নকে লাভ করিয়াছেন।" রাজা ভীম পরম সমাদরে দময়ন্তীর সহিত নিষধরাজকুমারকে শুভ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। সমবেত রাজকুমারগণ দময়ন্তীর অসাধারণ নিষ্ঠা দর্শনে পরম পুলকিত হইয়া নবদম্পতীকে যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ ও অভিবাদন করতঃ নিজ নিজ রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

৭

ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি ও যম স্বর্গের পথে চলিয়াছেন। পথিমধ্যে কলি ও দ্বাপরের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কলি, এ পথে কোথায় যাইতেছ?"

কলি। শুনিয়াছি আজ বিদর্ভরাজকুমারী অপরূপরূপলাবণ্যবতী দময়ন্তীর স্বয়ম্বর-সভায় দেব ও মানবের অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছে। এই নূতন দৃশ্য দেখিবার জন্য সেই স্বয়ম্বর-সভায় গমন করিতেছি।

ইন্দ্র। কলি, প্রত্যাবৃত্ত হও। আমরা সেই স্বয়ম্বর-সভা হইতে আসিতেছি। অনিন্দ্যসুন্দরী বিদর্ভরাজনন্দিনী আমাদের সমক্ষে নিষধাধীশ নলকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন। আমরা নবীন দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিতেছি।

কলি। যে দিক্‌পালগণের সমক্ষে সামান্য মানবের গলে বরমাল্য প্রদান করিতে পারে, সেই গর্ব্বিতা রাজকন্যার প্রতি আশীর্ব্বাদ! আপনারা এ কি বলিতেছেন?

ইন্দ্র। কেন কলি, তুমি কি জান না সতী যে বিশ্ব-বিজয়িনী! বিদর্ভরাজকন্যা দৈবপ্রলোভনের মধ্যেও তাঁহার সতীধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন, ইহা ত প্রত্যেকের গৌরবের কথা। তুমি তাহার উপর এত অসন্তুষ্ট কেন?

কলি। দেবগণকে অবহেলা করে এত স্পর্দ্ধা তাহার? আচ্ছা আমি তাহার এই দর্প হরণ করিব।

ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ বলিলেন, "কলি, বৃথা রুষ্ট হওয়া অনুচিত; স্বস্থানে গমন কর। আর যদি ইচ্ছা হয়, নিষধরাজ্যে গিয়া সেই নব-পরিণীত দম্পতীর মোহনমূর্ত্তি দেখিয়া চক্ষু সার্থক কর।" এই বলিয়া তাঁহারা সুরলোকে গমন করিলেন।

কলি দেবগণের কথায় বাহ্যতঃ শান্তভাব দেখাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। কিন্তু দেবগণের অপমানে যেন তুষানলে দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। অনন্তর দ্বাপরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কিরূপে এই দময়ন্তী সুখে কালাতিপাত করে আমাকে দেখিতে হইবে।"

নল-দময়ন্তী পবিত্র উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া নিষধদেশে গমন করিলেন। প্রজাগণ লক্ষ্মীস্বরূপিণী দময়ন্তীকে দেখিয়া পুলকিত হইল। দময়ন্তী প্রজাগণকে মাতৃত্বের ছায়ায় শীতল করিয়া তুলিলেন। বিপন্নের বিপদ্ মোচন, আশ্রিতের রক্ষণ, ক্ষুধিতকে অন্নদান করিয়া দময়ন্তী লোকমাতা ধরিত্রীর মত শোভা পাইতে লাগিলেন।

কালক্রমে দময়ন্তী এক পুত্র ও এক কন্যারত্ন লাভ করিলেন। পুত্রের নাম ইন্দ্রসেন ও তনয়ার নাম ইন্দ্রসেনা নির্দ্দিষ্ট হইল। মাতৃত্বগর্ব্বিতা দময়ন্তী সুখের সংসারে স্বামীর আচরিত পুণ্যকর্ম্মে সহকারিণী হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

নিরবচ্ছিন্ন সুখ পৃথিবীতে কেহ ভোগ করিতে পারে না। এই জন্যই বিধাতার রাজ্যে দুঃখের প্রশ্নেই মনুষ্যত্বের পরীক্ষা। যাঁহারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তাঁহারাই প্রকৃত মনুষ্য। দময়ন্তী এই

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া ভারতের চিরনমস্যা হইয়া রহিয়াছেন।

কলি নলের উপর পূর্ব্বাপরই অসন্তুষ্ট ছিল। এজন্য সর্ব্বদাই তাহার লক্ষ্য ছিল কোন ছিদ্র পাইলেই নলের দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। একদিন মহারাজ নল অশুচি অবস্থায় সন্ধ্যোপাসনা করিতেছিলেন, কলি এই অবসরে তাঁহার দেহ আশ্রয় করিল।

মহারাজ নলের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। তাহার নাম পুষ্কর। রাজা নল যেমন মনুষ্যত্বের পূর্ণ মূর্ত্তি, রাজভ্রাতা পুষ্কর তদ্রূপ নারকীয় পিশাচের বীভৎস ছবি। পুষ্করের দুষ্কর কোন কাজ ছিল না। স্বার্থের জন্য তাহার অকরণীয় কিছুই ছিল না।

৮

পুষ্কর অক্ষক্রীড়ায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। সে জ্যেষ্ঠের সেই অতুলন যশ, রাজ্যের বিস্তৃতি, প্রজাগণের বাধ্যতা প্রভৃতি অনুভব করিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে পুড়িত। নলদেহাবিষ্ট কলি একদিন পুষ্করকে বলিল, "পুষ্কর, তোমাকে নলের সহিত অক্ষক্রীড়া করিতে হইবে। আমি ও দ্বাপর তোমার সাহায্য করিব। তুমি নিশ্চয়ই আমাদের উভয়ের সাহায্যে নলকে পরাজিত করিয়া নিষধের একাধিপত্য প্রাপ্ত হইবে।" কলির প্ররোচনায় পুষ্কর অসৎবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া জ্যেষ্ঠ সহোদরকে অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান করিল।

পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়রাজগণের মধ্যে এরূপ নিয়ম ছিল যে, যুদ্ধেই হউক আর অক্ষক্রীড়াতেই হউক আহূত হইলে তাহাতে সম্মত হইতেই হইবে। মহারাজ নল সেই ক্ষত্রিয়নীতির বশীভূত হইয়া পুষ্করের সহিত অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। কলি অক্ষের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া নলের সর্ব্বনাশ দেখিতে লাগিল।

অক্ষক্রীড়াসক্ত মহারাজ নলের বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিল। দিন নাই, রাত্রি নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবল অক্ষক্রীড়া। ক্রমে রাজ্যধন সমস্তই হারিয়া গেলেন। অতঃপর নিজে আর পত্নীমাত্র অবশিষ্ট !

পুষ্কর দেখিল, ক্রমে ক্রমে জ্যেষ্ঠের সমস্তই আত্মসাৎ করিয়াছে। তখন সে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "তোমার সমস্তই ত জিতিয়া লইয়াছি। এবার তোমার দময়ন্তীকে পণ রাখ।"

রাজা নলের চমক ভাঙ্গিল। সিংহগর্জ্জনে বলিয়া উঠিলেন, "রে নরপিশাচ, এই কি তোর ভদ্রতা? তুই অক্ষক্রীড়ায় অন্ধ হইয়া জননীসমা জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়ার উপর বিকৃতভাব পোষণ করিতেছিস্।" নল সহসা খেলা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কলি রাজার দৈন্য দেখিয়া উপহাস করিতে লাগিল। কিন্তু সে বুঝিল না, সাধনা অদৃষ্টের গতিকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করে। বুদ্ধিনাশ সর্ব্বনাশের সহায়, কিন্তু সাধনা সুকৃতির জননী। মহারাজ নলের প্রাণে আজ সাধনার প্রবল ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল। এতদিন উপেক্ষার পদাঘাতে যে মঙ্গলঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন আজ সাধনার মন্ত্রে তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল।

রাজা দেখিলেন, নগরে আর তাঁহার স্থান নাই। তিনি সর্ব্ব-শোকহর বিপন্নশরণ বনে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়া দময়ন্তীকে বলিলেন, "প্রিয়তমে, আমি গ্রহপীড়িত। প্রাণাধিক ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে লইয়া তুমি কিছু দিনের জন্য পিতৃগৃহে গমন কর। আমি আমার অদৃষ্ট পরীক্ষার্থ নানাস্থানে ভ্রমণ করিব। আমাকে অদৃষ্টের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতেই হইবে।"

দময়ন্তী সজলনয়নে বলিলেন, "মহারাজ, দারুণ অক্ষক্রীড়ার নেশায় যখন তুমি উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলে, তখন মনে হয় কি আমি কত দিন অশ্রুজলে তোমার উন্মত্ততা দূর করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলাম?

মহারাজ, মনে পড়ে কি, প্রাণাধিক ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনার কোমল বাহুপাশে তোমাকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছিলাম? তুমি যেদিন কুসুমসুকুমার পুত্রকন্যার বাহুবন্ধন মোচন করিয়া গমন করিয়াছিলে সেই দিনই আমি বুঝিয়াছিলাম, কি এক বিষম মাদকতায় তোমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে। মহারাজ, আমি সেই দিনেই ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে বিশ্বস্ত সারথি বার্ষ্ণেয়ের সঙ্গে আমার পিত্রালয়ে প্রেরণ করিয়া বিপদ্‌সাগরে মজ্জমান তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি। মহারাজ, যদি সেই মোহনিদ্রা কাটিয়া থাকে, তবে দেখ তুমি এখনও নিরাশ্রয় হও নাই। তোমার পার্শ্বে এক অনন্য-নির্ভরা রমণীর প্রাণ তোমার সমস্ত বিপদকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।"

রাজা বলিলেন, "দময়ন্তি, জানি আমি নারীই দিগ্‌ভ্রান্ত হতভাগ্য স্বামীর দুর্ভাগ্য রজনীর ঘোর অন্ধকারের মধ্যে মঙ্গলকিরণবর্ষী ধ্রুবতারা। সতী স্ত্রীই বিপদ্‌সাগরে একমাত্র আশ্রয়তরণী। আমার শতজন্মের সাধনার পুরস্কার দময়ন্তি, হতভাগ্যকে দূরে ফেলিও না। প্রিয়তমে, অদৃষ্টবিড়ম্বিত আমি কিছু দিন নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া দেখিব, আমার নিয়তির পরিবর্ত্তন হয় কি না। এজন্য আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা, তুমি কিছু দিন পিত্রালয়ে গিয়া বাস কর।"

দময়ন্তীর প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। তিনি কাঁদিয়া বলিলেন, "কেন মহারাজ, দাসী শ্রীচরণে এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে, তুমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছ? মহারাজ, আমাকে তোমার সঙ্গ ছাড়িয়া পিতৃগৃহে যাইবার আদেশ করিও না। তোমার পবিত্র সাহচর্য্যেই আমি সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইব। বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন তুমি ক্লান্ত হইয়া পড়িবে তখন আমি পল্লবব্যজনে তোমার শ্রান্তি দূর করিব। নাথ, সাধ্বী স্ত্রীর পতি-বিরহিত অবস্থার মত শাস্তি আর নাই। আমি বুক পাতিয়া বজ্র গ্রহণ করিতে পারি,

অবিকৃতমুখে কালকূট পান করিতে পারি কিন্তু তোমার পবিত্র সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কিছুতেই জীবিত থাকিতে পারিব না। নাথ, দয়া করিয়া আমাকে তোমার পুণ্যচরণ-ছাড়া করিও না।”

তখন নল বলিলেন, “চল, চল দময়ন্তি, তুমি আমার সঙ্গে। হতভাগ্যের অন্ধকার জীবনে ক্ষীণ আলোকরেখার মত, দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ধ্রুবতারার মত, ছিন্নতার বীণার ক্ষীণ ঝঙ্কারের মত তুমি আমার নিত্য সহচরী থাকিবে।”

৯

গভীর নিশীথে রাজা ও রাণী উভয়ে রাজপুরী হইতে বহির্গত হইলেন। কোথায় যাইবেন স্থিরতা নাই। বন কোন্ দিকে, কিছুই জানেন না। ভগবানে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক নিরুদ্দেশ গতিতে চলিলেন।

তাঁহারা নগর ছাড়িয়া এক প্রান্তরে আসিয়া পড়িলেন। ঘোর অন্ধকার, কিছুই লক্ষ্য হয় না। উভয়ে সেই রজনীর সূচীভেদ্য অন্ধকারের ভিতর দিয়া গমন করিয়া এক গহন বনে প্রবেশ করিলেন। বনমধ্যে অন্ধকারের গভীরতা যেন অধিকতর বোধ হইতে লাগিল। নল ও দময়ন্তী কোনক্রমে সেই বনে রাত্রিযাপন করিলেন।

ক্রমে পূর্ব্বাকাশ লোহিত বর্ণ ধারণ করিল। ধরণী সমস্ত রাত্রির বিরহবেদনা ভুলিয়া যেন প্রভাতসূর্য্যকে সাদরে বরণ করিয়া লইল। পৃথিবীতে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল।

একদিন নল বনমধ্যে কতকগুলি স্বর্ণপক্ষ বিহঙ্গম দেখিয়া তাহা-দিগকে ধরিবার অভিপ্রায়ে আপনার পরিহিত বসনখানি আস্তীর্ণ করিলেন। কলিমায়াসৃষ্ট পক্ষীসকল নলের সেই বসনখানি দেহচ্যুত করিয়া লইয়া আকাশে উড্ডীন হইল। নল বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, সেই সকল পক্ষী বলিতে-ছিল, “হে নল, যাহাদের কোপে তুমি রাজ্যচ্যুত ও ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত হইয়া

বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ, যাহাদের প্রভাবে নিষধের রাজভক্ত প্রজাগণ তোমার বিপদের সময় সমাদর করে নাই, আমরা সেই অক্ষ; তোমাকে বনমধ্যে লজ্জিত ও নির্য্যাতিত করিবার জন্যই পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া তোমার বস্ত্র অপহরণ করিলাম।” মহারাজ নল কোনরূপে পল্লব-বসনে লজ্জা নিবারণ করিয়া দময়ন্তীর নিকট আসিলেন। যে রাজদেহে মূল্যবান্ কৌষেয় বসন শোভা পাইত আজ তাহাতে পল্লববসন দেখিয়া দময়ন্তী অবিরল ধারায় বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

নল বলিলেন, “রাণি, দুঃখ করিয়া কি হইবে? অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা ভোগ করিতেই হইবে। এইরূপ বিড়ম্বনার মধ্যে অতীতের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিস্মৃত হইয়া বর্ত্তমানের দুঃখদুর্দ্দশাকেই বরেণ্য করিয়া তুলিতে হইবে। ‘বর্ত্তমানের অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলই ভবিষ্যতের উপভোগ্য।’ ইহাই জ্ঞানিগণের উপদেশ; সুতরাং অতীত গৌরব-কাহিনী স্মরণ করিয়া তোমার মত উচ্চহৃদয়া রমণীর মুহ্যমান হওয়া উচিত নহে।”

দময়ন্তী নয়নের অশ্রু মার্জ্জন করিয়া বলিলেন, “নিষধেশ, আমি জানি সব, বুঝিও সব। কিন্তু মহারাজ, তোমার এই ধূলিক্লিন্ন দেহদর্শনে যখন তোমার সেই চন্দনচর্চ্চিত দেহখানি মনে পড়ে, কুঙ্কুমকণা যে দেহে লেপন করিতে ব্যথা অনুভব করিতাম যখন তাহা ভূমিশয়নে কঙ্করলিপ্ত দেখি তখন মহারাজ, আর আমার ধৈর্য্যের বাঁধ থাকে না—হৃদয় এক অশান্তির বন্যায় ভাসিয়া যায়।”

নল স্নেহভরে বলিলেন, “প্রিয়ে, ভগবানের রাজ্যে সুখ বা দুঃখ বলিয়া কিছু নাই। ভগবানের রাজ্যে সবই সুখময়। তিনি মানবের জন্য আপনার বিশালভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। আমাদের নিয়তি যখন যাহা প্রয়োজনীয় তাহাই গ্রহণ করিতেছে সুতরাং সুখ দুঃখ যা-কিছু সমস্তই ভগবানের দান। যেদিন দেখিবে রাণি, সুখের

সহিত দুঃখের অভেদ জ্ঞান হইয়াছে, সেদিন হৃদয়ে কোন অশান্তি থাকিবে না। দেখিবে, হৃদয়ে স্বর্গের বীণা ঝঙ্কৃত হইতেছে, প্রেমময়ের অভয়বাণী জীবনকে আশ্বস্ত করিতেছে।" দময়ন্তী পুলক-বিহ্বল নেত্রে নলের এইরূপ সহাসসুন্দর মূর্ত্তি ও আনন্দ দেখিয়া সকল দুঃখ বিস্মৃত হইলেন।

মহারাজ নল পত্নীকে এইরূপে উপদেশ দিতেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে দুর্ভাবনার অনল জ্বলিত তাহা অননুভবনীয়। সেই তেজোময় উন্নত বপু চিন্তাকীটদষ্ট হইয়া ক্রমে কঙ্কালসার হইয়া পড়িল। মহারাজ নল আপনার জন্য তত ভাবিতেন না। যখন দেখিতেন দময়ন্তীর সেই কোমল চরণদ্বয় বনভ্রমণে রক্তিমাভা ধারণ করিয়াছে, যখন দেখিতেন বনরেণুসম্পাতে চারুকুন্তলা দময়ন্তীর কুটিল অলকগুচ্ছ পলিতবৎ দেখাইতেছে, যখন দেখিতেন সেই নলিন-নয়নার নেত্রদ্বয় অশ্রুকলুষিত, তখন তাঁহার বক্ষঃপঞ্জর যেন শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইত। মনে হইত, হায়, যে রাজেন্দ্রাণী রাজপ্রাসাদের মধ্যে মর্ম্মরপ্রাঙ্গণে বিচরণ করিতেন, শত শত দাসী সুবাসিত তৈলে যাঁহার কেশদামের সংস্কার করিত, যাঁহার আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগলে স্বর্গের শোভা পরিদৃষ্ট হইত, অহো দুর্দ্দৈব, আজ তিনি বনবাসিনী! কোনরূপে অন্তরের ব্যথা চাপা দিয়া মহারাজ নল পত্নীকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

একদিন নল ভাবিলেন, দুষ্ট কলির ছলনায় আজ আমার এই দুর্দ্দশা! আমি সহায়হীন, বনবাসী। শুনিয়াছি অযোধ্যারাজ ঋতুপর্ণ অক্ষক্রীড়ায় অত্যন্ত পারদর্শী। আমাকে যে প্রকারে হউক রাজা ঋতুপর্ণের নিকট গিয়া অক্ষবিদ্যা আয়ত্ত করিতেই হইবে। কিন্তু আমার সাধনার দ্বারে দময়ন্তী এক অন্তরায়।

এই ভাবিয়া নল বলিলেন, "মহিষি, এইরূপে বনবাসিনী হইয়া তুমি কেন স্বেচ্ছায় কষ্টভোগ করিতেছ? আমার ইচ্ছা, তুমি পিতৃগৃহে

গমন কর। গ্রহভোগ্য কয়েক বৎসর অতীত হইলে আমি আবার তোমার সহিত মিলিত হইব। প্রিয়তমে, আমার এই দুর্দ্দশায় কেন তুমি যন্ত্রণা ভোগ করিবে। আরও দেখ, জীবনাধিক ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনা আমাদের অভাবে কত কষ্ট ভোগ করিতেছে। এই অবস্থায় যদি তুমি তোমার পিতৃগৃহে গমন কর, তাহা হইলে তাহারা কত পুলকিত হইবে। তাহাদের সেই বিষাদমলিন মুখমণ্ডল আনন্দের কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।"

দময়ন্তী বলিলেন, "নাথ, তোমার সাহচর্য্যে আমি কোন ক্লেশই অনুভব করি না। দুঃখের অবস্থাতেই মানুষের আত্মীয়ের প্রয়োজন হয়—পিপাসার সময়েই জল ভাল লাগে। নাথ, তোমার এই দুঃসময় কি শুধু তোমারই? তাহা হইলে কি তুমি আমাকে তোমা হইতে পৃথক্ বোধ কর? মহারাজ, পত্নী কি স্বামীর সুখেরই অংশভাগিনী? স্বামীর দুঃখের ভার মাথায় বহিতে পারিলেই যে রমণীর গৌরব, আর যে রমণী তাহাতে সমর্থা সে-ই ধন্যা। মহারাজ, আমার একান্ত প্রার্থনা, আমাকে পিতৃগৃহে যাইবার আদেশ করিও না। আর যদি যাইতেই হয়, তবে চল, উভয়ে বিদর্ভে যাই। আমার পিতৃগৃহে তুমি পরম সমাদরে থাকিতে পারিবে।"

নল বলিলেন, "ইহা অতি অসম্ভব কথা। শাস্ত্রে বলে, 'দুরবস্থার সময়ে কখনও কুটুম্ব-গৃহে যাইতে নাই।' সুতরাং আমি তোমার কথা রক্ষা করিতে পারিতেছি না। আরও দেখ, আমি যে স্থানে বিপুল ঐশ্বর্য্যে পরিবৃত হইয়া গমন করিয়াছিলাম আজ কোন্ মুখে পত্নীর বসনার্দ্ধ পরিধান করিয়া তথায় গমন করিব? রাণি, এ অদৃষ্টের পরিহাস আমার অসহ্য!"

রাণী। নাথ, ইহা আমি বুঝি, কিন্তু কি করিবে? এই বনে কিরূপে তোমার মুখে কটুতিক্তকষায় বনফল তুলিয়া দিব! বলিব কি মহারাজ, যাঁহাকে স্বর্ণথালায় অমৃতসম

পায়সান্ন দিতে কুণ্ঠিত হইতাম, যখন তাঁহাকে পর্ণপুটে বনফল দিতে হয়, অধিকন্তু পিপাসিত তোমার জন্য যখন সরসী হইতে পদ্মপত্রে জল লইয়া আসিতে হয়, তখন যে আমার বুক ভাঙ্গিয়া যায়!

নল। না মহিষি, ইহাতে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু দুঃখ আমার পরাধীনতার অন্নে। রাজ্ঞি, বনের উন্মুক্ত বিহঙ্গকে স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাজভোগ দিলে সে কি প্রফুল্ল থাকিতে পারে? প্রিয়তমে, আমাকে সে অনুরোধ করিও না।

দময়ন্তী আর কথা কহিতে পারিলেন না। শুধু রাজার সেই দুঃখমলিন মূর্ত্তি দেখিয়া এক বিন্দু অশ্রুবর্ষণ করিলেন।

নল বুঝিলেন এ অবস্থায় কিছুদিনের জন্য দময়ন্তীকে ত্যাগ না করিলে আর উপায় নাই। কিন্তু দময়ন্তী কি তাঁহাকে ত্যাগ করিবে? দময়ন্তী তাঁহাকে ছাড়িয়া পিতৃগৃহেও যাইতে চাহে না। তবে কিরূপে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয়! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নল স্থির করিলেন, দময়ন্তীকে ত্যাগ করিতে হইবে, নচেৎ কিছুতেই এই দুস্তর বিপদ-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। কিন্তু সহসা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল, এই হিংস্রজন্তুসমাকুল অরণ্যে একাকিনী রাখিয়া গেলে দময়ন্তী কিরূপে আত্মরক্ষা করিবেন! আবার ভাবিলেন, 'ধর্ম্মই বিপন্নকে রক্ষা করেন।' সাহসে বুক বাঁধিয়া মহারাজ নল কর্ত্তব্য স্থির করতঃ বলিলেন, "দময়ন্তি, এই যে বনভূমি দেখিতেছ, ইহার উত্তর প্রান্ত হইতে একটি পথ পূর্ব্বাভিমুখে গিয়াছে, তাহাই বিদর্ভ যাইবার পথ। অনেক বণিক্ ও তীর্থযাত্রী সেই পথে গমনাগমন করিয়া থাকে।"

দময়ন্তী সোদ্বেগে বলিলেন, "কেন মহারাজ, দাসীকে এমন কথা বলিতেছ? তবে কি তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে?

তুমি কি আমার আচরণে ব্যথিত হইয়াছ? মহারাজ, আমি জ্ঞানত কোন অন্যায় করি নাই, যদি ভ্রমক্রমে কোন অন্যায় করিয়া থাকি ক্ষমা কর। আমাকে চরণ ছাড়া করিও না। আমি তোমারই আশ্রিতা। এই ক্ষীণা লতিকাকে তরুবরের অঙ্গবিচ্যুত করিয়া তাহাকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করিও না।" এই বলিয়া দময়ন্তী অবিরল ধারায় বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

নল নিরুত্তর। দারুণ দুশ্চিন্তায় তিনি উদ্‌ভ্রান্ত। শিরীষকোমলা দময়ন্তী তাঁহার চরণতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

নল কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "প্রিয়ে, কেন তুমি এত অধীর হইতেছ? আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিবার বাসনা করি নাই, আমি আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া বরং জীবিত থাকিতে পারি, তথাপি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া জীবিত থাকিতে পারিব না।"

দময়ন্তী বলিলেন, "নাথ, যদি তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিবার বাসনা কর নাই তবে কেন বিদর্ভের পথ নির্দ্দেশ করিলে? তোমার উদ্‌ভ্রান্ত ভাব দেখিয়া আমি অস্থির হইতেছি। বুঝি-বা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাও!"

নল কোনরূপে দময়ন্তীকে আশ্বস্ত করিলেন।

১০

একদিন গভীর নিশীথে নল দেখিলেন, দময়ন্তী নিদ্রিতা; তাহার নিদ্রালস বাহুলতা নলের শরীর-বেষ্টন ত্যাগ করিয়া শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে। এই ত পলায়নের দিব্য সুযোগ। নল ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে নিকটে একখানি ছুরিকা রহিয়াছে দেখিয়া মনে করিলেন, দময়ন্তীকে ত্যাগ করাই বিধাতার অভিপ্রায়! নচেৎ এই গহন বনে ছুরিকা কোথা হইতে আসিল। এই ভাবিয়া, নল সেই ছুরিকা দ্বারা বসনের অর্দ্ধাংশ কাটিয়া ফেলিলেন। আজ মহারাজ

নল যেন নির্ম্মুক্ত। ভাবিলেন, কোথায় যাই। এই তমিস্রা রজনীতে, নানা হিংস্রজন্তুসমাকুল গভীর অরণ্যে দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া কোন্ প্রাণে স্থানান্তরে যাইব? একবার ভাবিলেন, না যাইব না, আবার ভাবিলেন, এইরূপ অসহায় অবস্থায় দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করা ভিন্ন অদৃষ্টের সহিত যুদ্ধ করিবার আর অন্য উপায় নাই। সুতরাং দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেই হইবে। আবার ভাবিলেন, এই অনন্যশরণা আমার বিরহে চারিদিক অন্ধকার দেখিবে এবং নিশ্চয়ই প্রিয়া আমার, অনশনে কি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবে। আমার রাজত্বে কাজ নাই। এই দেবীকল্পা নারীই আমার সর্ব্বস্ব, ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও চাই না! এ যে আমার দেবতার আকাঙ্ক্ষিত স্পর্শমণি। নিশ্চয়ই দময়ন্তী হইতে আমার দারিদ্র্য-অন্ধকারের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের আলোক ফুটিয়া উঠিবে। হৃদয় শান্ত হও; জগৎ একদিকে, আর দময়ন্তী অন্য দিকে। আমি দময়ন্তীকে ত্যাগ করিতে পারিব না।

সহসা আবার আশার আশ্বাসনী শক্তি জাগিয়া উঠিল; হৃদয়ে যেন কি এক বাণী অনবরতঃ ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল, 'সম্মুখে তোমার কঠোর কর্ত্তব্য, পত্নীর প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইয়া নিজের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইও না। তুমি রাজা, তোমার জন্য সহস্র প্রাণী কাঁদিতেছে। একজনের ক্রন্দনের জন্য সহস্রের ক্রন্দনকে উপেক্ষা করা রাজনীতি নহে।' নল মনে করিলেন, আমার পুত্রসম প্রজাগণ নিশ্চয়ই দুষ্টের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া কাঁদিতেছে; নচেৎ আমার হৃদয়ে আজ এরূপ ভাব হইবে কেন? এই ভাবিয়া নল উঠিলেন। করজোড়ে পত্নীর উদ্দেশে মনে মনে বলিলেন, "দেবি, আমার অপরাধ লইও না। গুরুতর কর্ত্তব্যের আহ্বানেই আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি। হে ধর্ম্ম, আমার দময়ন্তীকে রক্ষা করিও। হে বনদেবি, তোমার পবিত্র ক্রোড়েই আমার সাধনার ধনকে রাখিয়া যাইতেছি;

দরিদ্রের এই ন্যস্ত ধনটিকে সমাদরে রক্ষা করিও। হে ভগবন্, তোমার চরণে দময়ন্তীকে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি। আজ যে তোমারই পবিত্র আহ্বানে আমার মোহপাশ কাটিয়াছে, শুনিতে পাইতেছি সহস্র প্রাণ আমার জন্য কাঁদিতেছে; প্রভো, এ যে আমার মনুষ্যত্বের পরীক্ষা, এ যে তোমারই আহ্বান। সুতরাং আমার দময়ন্তীর মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ তোমারই মঙ্গলময় হস্তে।" এই বলিয়া নল প্রস্থানোদ্যত হইলেন। এক পা চলিয়া আবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখেন, ক্রমে দুই পদ, তিন পদ চলিয়া আবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন, দময়ন্তী তেমনই নিদ্রিতা রহিয়াছেন কি না!

এ জগতে প্রীতির আকর্ষণ এত দুশ্ছেদ্য যে, তাহা যেন কিছুতেই অতিক্রম করা যায় না। মহারাজ নল সমস্ত বুঝিয়াও আবার দময়ন্তীর দিকে অগ্রসর হইলেন! আবার ভাবিলেন এ কি? কোথায় যাইতেছি? আমার গমনপথ ত পশ্চাতে! আবার এক পদ, দুই পদ, তিন পদ অগ্রসর হইলেন। এইবার তিনি ভাবিলেন, আমাকে এ আকর্ষণ কাটাইতেই হইবে। হৃদয় শান্ত হও, এই ভীষণ কর্ম্মের উপরে আমার ভবিষ্যৎ ও শত শত প্রজার সান্ত্বনা নির্ভর করিতেছে। ক্রমে নল অন্ধকারে মিশাইয়া গেলেন। যতদূর দৃষ্টি চলে এক একবার তিনি পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন দময়ন্তী তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতেছে কি না। পদদলিত বৃক্ষপত্রের শর্ শর্ শব্দে তিনি মনে করিতেছিলেন বুঝি দময়ন্তী নিদ্রাভঙ্গের পর আমার অদর্শনে কাতরা হইয়া আমাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। কিন্তু ক্ষণ পরেই দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখ দিয়া একটা বন্য পশু ছুটিয়া গেল।

দারুণ অন্ধকার—কিছুই দেখা যায় না। নল সেই অন্ধকার রজনীতে আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সপ্তর্ষিমণ্ডলকে দেখিলেন এবং ধ্রুবনক্ষত্র স্থির করিয়া গম্যপথে গমন করিতে লাগিলেন।

একদিকে পত্নীর অবস্থা, অন্য দিকে সহস্র সহস্র প্রজার আকুল ক্রন্দন স্মরণ করিয়া মহারাজ নলের মতির স্থিরতা ছিল না। পরার্থপর মানুষের প্রাণ অন্যের দুঃখে নিজের সুখশান্তিকে, জগৎকে পায়ে ঠেলিয়া কর্ত্তব্যের পথে প্রধাবিত। এই গতি রোধ করা স্বয়ং বিধাতৃপুরুষেরও বোধ হয় অসাধ্য। ভাগীরথীর প্রবলগতি রোধ করিতে মত্ত গজ-রাজেরও ক্ষমতার অতীত হইয়াছিল। অশেষ মঙ্গল যে কার্য্যে তাহা সম্পন্ন হইবেই, বিধাতার রাজ্যে ইহার অন্যথা হইবে না। তাই আজ নলের প্রাণ উন্মুক্ত, তাই তাঁহার প্রাণ আজ বিজয়োন্মাদে উন্মত্ত, তাই তিনি জীবনাধিকা পত্নীর প্রেমপাশ ছিন্ন করতঃ পরার্থতার পথে আত্মভোলা পথিক।

নল ক্রমে এক দুস্তর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একস্থানে দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। সেই অগ্নিগর্ভ হইতে কে যেন আকুল আহ্বানে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। পরার্থপর নলের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন এক বৃহদাকার সর্প সেই অগ্নিপার্শ্বে পতিত রহিয়াছে। সর্প চলচ্ছক্তিহীন। অবিলম্বে তথা হইতে নিরাকৃত না করিলে সে ভস্মসাৎ হইবে এই ভাবিয়া মহারাজ নল মুহূর্ত্তমধ্যে সেই অগ্নিগর্ভে প্রবেশ করিয়া সর্পটিকে বাহিরে আনিলেন। বাহির হইবার সময় সেই দাবাগ্নির লেলিহান শিখা তাঁহার দেহ স্পর্শ করিল। একটি জীবের প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন ভাবিয়া তিনি যে সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন তাহার নিকট অনলশিখা তুচ্ছ। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! ক্রূর সর্প তাঁহাকে দংশন করিল। তথাপি মহারাজ নল তাহাকে ত্যাগ না করিয়া নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিলেন। নল দেখিলেন, সর্পের দংশনে তাঁহার জীবনের আশঙ্কা নাই। কিন্তু তাঁহার দেহ সেই সর্পবিষে তৎক্ষণাৎ বিবর্ণ ও কুব্জ হইয়া গেল। তিনি ভাবিলেন ছদ্মবেশ ধারণের পক্ষে বর্ত্তমান শরীরের অবস্থা আমার অনুকূল।

এমন সময়ে মহারাজ নল শুনিতে পাইলেন, "হে নল, নিঃশঙ্ক হও। আমার বিষে তোমার হৃদয় পীড়িত হইবে না। আমি কর্কোটক। হে রাজন্, আমি তোমাকে এই বস্ত্রযুগল দান করিতেছি, ইহার দ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করিলে তুমি তোমার পূর্ব্বকান্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবে; তুমি অবিলম্বে কোশলপতি মহারাজ ঋতুপর্ণের সারথ্য পদ গ্রহণ কর। তোমার এই বিবর্ণতা ও কুজাকৃতি ছদ্মবেশ ধারণের সম্পূর্ণ অনুকূল। হে নিষ্পাপ নল, আমার দংশন বিধাতারই শুভ আদেশ ইহা বিস্মৃত হইও না।" এই বলিয়া কর্কোটক সহসা অন্তর্হিত হইল।

নল সেই বস্ত্রযুগল গ্রহণ করিয়া রাজা ঋতুপর্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং রাজার নিকট সারথ্য পদ প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "রাজন্, আমি অশ্বের শিক্ষাদানে অতীব পারদর্শী। আমি নিষধাধিপতি নলের সারথ্য করিয়াছি।" ঋতুপর্ণ সমাদরে তাঁহাকে সারথ্য পদ প্রদান করিলেন।

১১

এদিকে দময়ন্তী নিদ্রাভঙ্গের পর দেখিলেন, পূর্ব্বাকাশ ঊষার কনক কিরণে আলোকিত, কিন্তু তাঁহার পার্শ্বে যে ঘোর অন্ধকার! মহারাজ কই! তিনি কোথায় গেলেন? একবার ভাবিলেন, হয় ত নিকটেই কোথাও গিয়াছেন এখনই আসিবেন! কিন্তু অনেকক্ষণ গত হইল এখনও ত আসিলেন না! তবে কি তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও গিয়াছেন? হায় হায়, তাও কি সম্ভব? না না, তাহা হইতে পারে না! তিনি এখনই আসিবেন। আশা তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিল, কিন্তু হৃদয় বলিতে লাগিল, হতভাগিনি! তোমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে!

ক্রমে অনেকক্ষণ গত হইল; দময়ন্তী অস্থির হইয়া সেই বনে নলের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দ্রুত গমন জন্য তাঁহার কেশপাশ

শ্লথ হইয়া গেল; তিনি সেই গলিত-বেণী ধারণ করিয়া নানাদিকে গমন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "হে নাথ, তোমাকে দেখিলেই অরিকুল শত্রুতা ভুলিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করে, তোমার মমতায় বন্ধুর প্রাণ আশ্বস্ত হয়, তবে তুমি কি জন্য আমাকে এত যন্ত্রণা দান করিতেছ? আমি তোমার শ্রীচরণে এমন কি অপরাধ করিয়াছি, যে-জন্য তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে? হে শাস্ত্রজ্ঞ, তুমি নানা ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছ, কিন্তু তাহাতে কি কোথাও অনন্যশরণা সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগের বিধি আছে? তবে কেন তুমি তাহাকে একা রাখিয়া স্থানান্তরে গমন করিলে?" দময়ন্তী রোদন করিতে লাগিলেন।

দময়ন্তী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুঝিলেন, যে নিষ্ঠুর দেবতার কঠিন আদেশে মহারাজ নলের এই অবস্থা ঘটিয়াছে ইহাও তাঁহারই ছলনা। এই ভাবিয়া দময়ন্তী বলিতে লাগিলেন, "রে ঘৃণ্য প্রাণ, আর কেন? তোর ত জীবনের সব সাধ পূর্ণ হইয়াছে। তুই সত্বর বহির্গত হ। নচেৎ আমার সর্ব্বগুণাধার স্বামীকে যে আরও কত দিন তোর জন্য দুঃখের অনলে ভস্মীভূত হইতে হইবে? হে রাজন্, তুমি যে বিপন্নশরণ! কাহারও অশ্রুজল দেখিলে যে তোমার ধৈর্য্য বিনষ্ট হয়। আজ তোমার দময়ন্তী কাঁদিয়া আকুল, তুমি মানস-নেত্রে কি তাহা দেখিতে পাইতেছ না?"

এইরূপে দময়ন্তী বিলাপ করিতে করিতে উন্মাদিনীর মত বনের চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কোথাও মৃগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "হে কুরঙ্গ, তোমরা বনভাগের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া থাক, আমার হৃদয়দেবতাকে কোথাও দেখিলে কি?" এক অশোক তরুতলে উপনীত হইয়া বলিলেন, "হে অশোক, তুমি অতিশয় নারীপ্রিয়, দেখ এই হতভাগিনী ভর্ত্তৃবিরহিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, দয়া করিয়া তাহার শোক নাশ কর, আমার চির-বাঞ্ছিত দয়িত কোথায় রহিয়াছেন বলিয়া দাও।"

শোকার্ত্তা দময়ন্তী এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে এক ভীষণ অজগর সর্পের মুখে পড়িলেন। সর্প তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য আসিতেছে দেখিয়া দময়ন্তীর প্রাণ উড়িয়া গেল। দময়ন্তী কাতর প্রাণে ভাবিলেন, হায় হায়, নরদেবতা জীবিতনাথের স্নেহক্রোড়চ্যুত হইয়া পরিশেষে সর্পের উদরে প্রবেশ করিতে হইল! আমার যে এখনও মহারাজের প্রতি কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই। এইরূপ ভাবিয়া তিনি আত্মরক্ষার্থ প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়িতে লাগিলেন। কিন্তু তিন দিনের উপবাসে তাঁহার দেহলতা ক্রমে অবশ হইয়া আসিল; দময়ন্তী আর পলাইতে পারিলেন না, দুষ্ট অজগরের কবলে পতিত হইলেন। সহসা এক ব্যাধ তথায় উপস্থিত হইয়া সেই অজগরের মুখে তীক্ষ্ণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। সর্প নিহত হইল। দময়ন্তী রক্ষা পাইয়া জীবনদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

দময়ন্তী আবার নূতন বিপদে পড়িলেন। দুষ্ট ব্যাধ দময়ন্তীর অলোকসামান্য রূপরাশি দর্শন করতঃ বলিল, "ওগো, আমি তোমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তুমি আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন কর।"

দময়ন্তী বলিলেন, "তুমি আমার জীবনদাতা। তুমি আমাকে সর্পের মুখ হইতে পরিত্রাণ করিয়া নবজীবন দান করিয়াছ, সুতরাং তুমি আমার পিতৃতুল্য। কেন তুমি এমন ঘৃণ্য কথা বলিতেছ? আমার আদর্শচরিত্র স্বামী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার জন্য আমি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। দয়া করিয়া বলিয়া দাও, এই বনে কোথাও কি সেই পুরুষশ্রেষ্ঠকে দেখিয়াছ?"

ব্যাধ নিরুত্তর। দময়ন্তীর রূপরাশি তাহার হৃদয়কে পোড়াইতেছিল। সে বলিল, "অয়ি শোভনে, তুমি কি বলিতেছ আমি বুঝিতেছি না; চল তুমি আমার গৃহে। তোমার নিষ্ঠুর স্বামীকে ভুলিয়া যাও। আমি হৃদয় দিয়া তোমার পূজা করিব।"

এই কথা শুনিয়া দময়ন্তীর রোষানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। রোষাবেশে সতীর দেহ ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার নেত্রদ্বয় অগ্নিতুল্য জ্যোতিঃ ধারণ করিয়া অসুর-সমরে সতীনেত্রের মত ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। ব্যাধ সেই সতীদেহনিঃসৃত ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

এইরূপে দময়ন্তী ব্যাধের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এখন কোথায় যাই, কোথায় গেলে আমি আমার জীবিতেশ্বরকে পাইব। এই ভাবিয়া তিনি রোদন করিতে করিতে বনের উত্তরাংশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক সরল বিস্তৃত পথ রহিয়াছে; এবং ঐ পথে কতকগুলি বণিক্ বাণিজ্যার্থ গমন করিতেছে। দময়ন্তী সেই সার্থবাহের দলে মিলিত হইলেন। দলপতি তাহাকে আশ্বাস দান করিল এবং অপর বণিক্গণ কর্তৃক তিনি পরম সমাদরে অভ্যর্থিত হইলেন।

ক্রমে রাত্রি হইল। সকলেই বিশ্রামার্থ এক সরোবর-তীরে আপনাদের ভারবাহী পশুসকলের পৃষ্ঠদেশ হইতে পণ্যসকল নামাইয়া তাহা মধ্যস্থলে রক্ষা করতঃ শয়ন করিয়া রহিল। দময়ন্তী এক পার্শ্বে ধূলিশয়নে ক্লান্তি নাশ করিতে লাগিলেন। নিশীথ সময়ে বনানী নিস্তব্ধ ও পথশ্রান্ত সার্থবাহ সুষুপ্ত হইলে কতকগুলি বন্যহস্তী সেই সরোবরে জলপানার্থ আগমন করিল এবং সরোবরতীরে পশুযূথ ও বণিক্সকলকে দর্শন করিয়া রোষাবেশে গর্জ্জন করিতে লাগিল। ভারবাহী পশুসকলের সহিত বন্যগজকুলের ঘোর সংগ্রাম বাধিয়া গেল। বিপন্ন সার্থবাহের অধিকাংশ সেই বিবদমান পশুসঙ্ঘের চরণনিষ্পেষিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন বণিকেরা ভাবিল, নিশ্চয়ই এক কুলক্ষণা নারী আমাদের সঙ্গে রহিয়াছে বলিয়া দেবতার এই রোষ। অতএব ইহাকে অবিলম্বে না বধ করিতে পারিলে আমরা এই দেবরোষ হইতে উদ্ধার পাইব না। দময়ন্তী

তাহাদের এই পরামর্শ শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ সকলের অগোচরে সেই স্থান ত্যাগ করতঃ নিরুদ্দেশগতিতে গমন করিতে লাগিলেন। অন্ধকারে পথ দেখিতে পান না। অতিকষ্টে তিনি তথা হইতে বহুদূরে পড়িলেন।

রজনী প্রভাতা হইল। লক্ষ্যহীন হইয়া দ্রুত গমন করাতে তাঁহার পরিধেয় বসন ছিন্ন, সর্ব্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত হইয়া গিয়াছে। দময়ন্তী উপায়ান্তররহিত হইয়া এক জনপদে প্রবেশ করিলেন। তত্রত্য উদ্দাম বালকগণ তাঁহার এইরূপ বেশ দর্শনে তাঁহাকে উন্মত্তা মনে করিয়া নানা বিদ্রূপ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল। দময়ন্তী আশ্রয়লাভের জন্য পুরোবর্ত্তী রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন ইহা চেদিরাজ সুবাহুর রাজপ্রাসাদ। দময়ন্তী সেই প্রাসাদদ্বারে উপনীত হইলে রাজমাতা বাতায়নপথে সেই দীনবেশা রমণীকে দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তা হইলেন এবং সমীপবর্ত্তিনী পরিচারিকাকে বলিলেন, "তুমি অবিলম্বে ঐ রমণীকে আমার নিকট লইয়া আইস।"

রুক্ষকেশা ছিন্নবসনা দময়ন্তী দাসীর সহিত রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রাজমাতাকে অভিবাদন করিলেন। রাজমাতা দাসীকে বলিলেন, "তুমি অবিলম্বে স্নানাগারে লইয়া গিয়া ইঁহার গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দাও।"

দাসী তাঁহাকে স্নানাগারে লইয়া গেল। দময়ন্তী অঙ্গের কর্দ্দমাদি ধৌত করিয়া, রাজমাতার প্রদত্ত একখানি বস্ত্র পরিধান করিলেন। রাজমাতার করুণায় সেই শোভনাঙ্গীর রূপরাশি যেন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

তখন রাজমাতা তাঁহাকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, কেন তুমি পাগলিনীবেশে পথে পথে ভ্রমণ করিতেছিলে?"

দময়ন্তীর শোকাশ্রুপ্রবাহ উথলিয়া উঠিল! অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। রাজমাতা অঞ্চলের দ্বারা তাঁহার

নেত্রনীর মার্জ্জনা করিয়া দিয়া বলিলেন, "মা, তোমার এখানে কোন আশঙ্কা নাই। স্বচ্ছন্দে তুমি আমার নিকট তোমার অবস্থা বিবৃত কর। তোমার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে তুমি বড় বিপন্না। আমি ক্ষমতামত তোমার বিপদ দূর করিতে চেষ্টা করিব। সীমন্তে সিন্দূর দেখিয়া বুঝিতেছি তুমি সধবা। মা, তবে তোমার এ দুরবস্থা কেন?"

দময়ন্তী হৃদয়ের আবেগ দমন করিয়া বলিলেন, "মা, আমি অতি দীনা। আমার স্বামী দৈবনির্ব্বন্ধে সংসার ত্যাগ করিয়া বনে বাস করিতেছিলেন। দেখিতাম দুরবস্থার পীড়নে তিনি সর্ব্বদা উদ্‌ভ্রান্ত থাকিতেন এবং আমার কোন কষ্ট দেখিলে তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে তিনি আমার নিকট এইরূপ কথাও বলিয়া ফেলিতেন যে, অদৃষ্টের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে নিজের অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইতে হইবে। আমি কাঁদিতাম, তিনি কত সমাদরে আমার চক্ষের জল মুছাইয়া দিতেন। মনে করিতাম, তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে পারিবেন না। মা, আজ চারি দিন হইল, তিনি ঘোর নিশীথে আমাকে গহন কাননে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। আমি এই চারি দিন বনে বনে তাঁহার অন্বেষণ করিয়াছি। কিন্তু কোথাও তাঁহার দর্শন পাই নাই।" এই বলিয়া দময়ন্তী এই চারিদিনের মধ্যে তাঁহাকে কত বিপদে পড়িতে হইয়াছিল সমস্ত বিবৃত করিলেন। সমবেত পুরস্ত্রীগণ তাঁহার পাতিব্রত্যের পরিচয়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

রাজমাতা বলিলেন, "মা, তুমি আমার কন্যার মত আমার নিকটে থাক। এখানে তোমার কোন ভয়ের কারণ নাই। আমি তোমার স্বামীর অনুসন্ধান করাইব।" এই বলিয়া তিনি স্বীয় দুহিতাকে বলিলেন, "সুনন্দা, ইনি তোমার সমবয়স্কা, অতএব তুমি ইঁহাকে আপনার সখীর মত মনে করিবে।"

সুনন্দা দময়ন্তীকে লইয়া স্বীয় প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। দময়ন্তী রাজভবনে রাজমাতার স্নেহ ও সুনন্দার সখীত্ব লাভ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

১২

এদিকে বিদর্ভরাজ স্বীয় জামাতা ও তনয়ার দেশত্যাগের কথা শুনিয়া তাঁহাদের অনুসন্ধানার্থ দেশে দেশে লোক পাঠাইলেন। তাহারা প্রভুর আদেশে জনপদে, অরণ্যে, প্রান্তরে সর্ব্বত্র অহর্নিশ নল ও দময়ন্তীর অন্বেষণ করিতে লাগিল।

একদিন সুদেব নামক এক ব্রাহ্মণ চেদিরাজ্যে উপনীত হইয়া রাজপুরীতে সুনন্দার সহিত বিচরণশীলা দময়ন্তীকে দেখিতে পাইলেন। দময়ন্তী পিতৃগৃহাগত সুদেব ব্রাহ্মণকে চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া মাতাপিতার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। সুনন্দা অদূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন! তিনি যখন শুনিলেন, তাঁহার সখী বিদর্ভরাজকন্যা, তখন অতিশয় বিস্মিত হইয়া সত্বরপদে জননীর নিকটে গিয়া বলিলেন, "মা, আমার সখী সামান্যা রমণী নহেন। তিনি বিদর্ভরাজের কন্যা এবং নিষধাধিপতি মহারাজ নলের সহধর্ম্মিণী দময়ন্তী।" শুনিয়া রাজমাতা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "সুনন্দা, তুমি এ কি বলিতেছ? দময়ন্তী যে তবে আমার নিতান্ত আপনার। কিরূপে তাহার এরূপ অবস্থা হইল? কই, এ পর্য্যন্ত ত আমি কিছুই শুনি নাই। তুমি কি বলিতেছ আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। দময়ন্তীর এইরূপ অবস্থা ঘটিলে নিশ্চয়ই বিদর্ভরাজ আমাকে সে সংবাদ দিতেন। কোথায় দময়ন্তী, একবার তাহাকে আমার নিকট আসিতে বল।"

সুনন্দা দময়ন্তীর নিকট গিয়া বলিল, "সখি, মা তোমাকে ডাকিতেছেন।" দময়ন্তী সুদেব ব্রাহ্মণকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া

রাজমাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ত্বরিত পদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

রাজমাতা বলিলেন, "মা দময়ন্তি, তুমি কেন এতদিন আমাকে নিজের পরিচয় দাও নাই ? আজ আমি সুনন্দার মুখে সব শুনিয়াছি। মা, তোমাকে আমি কখনও দেখি নাই। তুমি যে আমার অঞ্চলের ধন। কেন তুমি আমাকে প্রতারিত করিয়াছিলে ? আমি তোমার যথার্থ পরিচয় জানিতে না পারিয়া হয়ত তোমার উপর অনেক অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি ; আশা করি, এজন্য কিছু মনে করিবে না।"

রাজবাড়ীতে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সেই নবাগতা স্ত্রীলোকটি বিদর্ভরাজকুমারী ও নিষধরাজ-মহিষী, রাজমাতার নিতান্ত আত্মীয়া, আজ বিদর্ভরাজপ্রেরিত এক ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজপুরীতে দময়ন্তীকে দেখিতে পাইয়াছেন, ইত্যাকার নানা কথা রাজপুরীর তাবৎ নরনারীর আলোচ্য হইয়া উঠিল।

রাজমাতার আদেশে সুদেব রীতিমত অভ্যর্থিত হইলেন। পরে শুভদিনে প্রচুর বস্ত্রালঙ্কারসহ পরম সমাদরে দময়ন্তী বিদর্ভরাজ্যে প্রেরিত হইলেন।

১৩

দময়ন্তী পিত্রালয়ে আসিয়া মাতাপিতার চরণ বন্দনা করিলেন। প্রাণাধিকা তনয়ার বিরহে রাজারাণীর প্রাণ কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, আজ দময়ন্তীকে দেখিয়া তাঁহাদের নেত্রযুগল হর্ষবাষ্পে পরিপ্লুত হইল। পিতৃগৃহে দময়ন্তী পরম সমাদরে বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার তাহা ভাল লাগিত না। সর্ব্বদাই নলের বিরহানল তাঁহার হৃদয়কে দগ্ধ করিত। মাতাপিতার এত আদর-যত্ন পাইয়াও দময়ন্তী দিন দিন কৃশ ও বিবর্ণ হইতে লাগিলেন। রাজা মহামতি নলের অন্বেষণের জন্য পুনর্ব্বার নানা দেশে লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা

করিলেন। দময়ন্তী সেই সকল লোককে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "আপনারা দেশে দেশে ভ্রমণ করিবার সময় এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিবেন। যদি কোন ব্যক্তি ইহার উত্তর দান করেন তবে আপনারা তাঁহার সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য সংবাদ জানিয়া আসিবেন।" দময়ন্তী প্রত্যেক দূতকে লিখিয়া দিলেন ঃ—

কোথায় রয়েছ তুমি বসনার্দ্ধচোর,
অভাগিনী নারী ভাসে শোকেব সলিলে,
বহিছে দুর্ব্বার ধারে তার আঁখি-লোর,
তত ভালবাসা তার কেমনে ভুলিলে ?
হে নিঠুর, কোন্ প্রাণে অনন্যশরণা
সুপ্তা বনিতারে হায় রাখি' একাকিনী
সুভীষণ বনমাঝে, কেমনে বল না
ভুলিয়া রয়েছ তব জীবনসঙ্গিনী !
স্বামীর প্রধান কাজ পত্নীর রক্ষণ,
কেমনে ভুলিলে ইহা ওহে শূব বীব,
স্বামী বিনা অবলাব বিফল জীবন
বোঝনাকি হৃদয়েশ, ব্যথা রমণীর।
দিবা অবসানে এবে মলিনা নলিনী,
প্রভাতা হবে না কি এ কালনিশীথিনী ?

দূতসকল দেশে দেশে রাজ্যে রাজ্যে গমন করিয়া ঐ সকল শ্লোক উচ্চারণ করিতে লাগিল। কিন্তু কোথাও উত্তর পাইল না।

একদিন পর্ণাদ নামক এক ব্রাহ্মণ অযোধ্যাপতি ঋতুপর্ণের সভায় গমন করিয়া দময়ন্তী-লিখিত সেই শ্লোক পাঠ করিলেন। কিন্তু কেহই সেই কবিতার উত্তর দানে সমর্থ হইল না।

ঋতুপর্ণ রাজার বিবর্ণ ও কুব্জদেহ সারথি বাহুক সেই শ্লোক শুনিয়া পর্ণাদকে অন্যের অলক্ষিতে বলিলেন, "দ্বিজবর, আমি আপনাকে

ইহার উত্তর দিতে পারি। আপনি প্রত্যাবর্ত্তনকালে আমার নিকট হইতে এই শ্লোকের উত্তর লইয়া যাইবেন।"

পর্ণাদের দেশে যাইবার সময় হইলে বাহুক তাঁহাকে নিম্নলিখিত উত্তরকবিতাটি প্রদান করিলেন ঃ—

সুদূর কোশলধামে ঋতুপর্ণালয়ে,
কাতরে যাপিছে দিন বসনার্দ্ধচোর
গণিয়া সুখের দিন কত ব্যথা সয়ে,
প্রণয়ের সাক্ষী তার তপ্ত আঁখি-লোর।
সুভীষণ অদৃষ্টের তীব্র পরিহাস
উপেক্ষিতা সদা চাই গভীর সাধনা,
সে ত নহে বাসনার নিষ্ফল প্রয়াস,
কিম্বা নহে মদিরার উগ্র উন্মাদনা।
ধর্ম্মই সতীর গতি বিদিত সংসারে,
ইষ্টপদে প্রিয় বস্তু থাকে অবিকৃত,
স্বর্ণের পরীক্ষা হয় অগ্নির মাঝারে
দুঃখ মাঝে সুখরাশি হয় পরীক্ষিত।
সরলে, ভুল না সেই প্রেম সুগভীর,
লিখিয়াছি ক'টি কথা দিয়া আঁখি-নীর।

পর্ণাদ বিদর্ভরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাজান্তঃপুরে গমন করিয়া বলিলেন, "রাজকুমারি, আমি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া নিষধাধিপতির অন্বেষণ করিয়াছি এবং আপনার লিখিত শ্লোক বহু রাজ-সভায় পাঠ করিয়াছি, কিন্তু সে শ্লোকের উত্তর কোথাও পাই নাই। শেষে কোশলরাজ ঋতুপর্ণের সারথির নিকট হইতে এই উত্তর-লিপি পাইয়াছি।"

দময়ন্তী পর্ণাদ-প্রদত্ত সেই পত্রখানি একবার দুইবার তিনবার শতবার পাঠ করিলেন; বুঝিলেন ইহা তাঁহার জীবিতনাথেরই রচনা।

বহুদিন অদর্শনজনিত বিষাদবিষে যে দেহ জর্জ্জরীভূত হইতেছিল তাহাতে আজ আশার সুধা বর্ষিত হইল।

দময়ন্তী উৎকণ্ঠার সহিত বলিলেন, "হে দ্বিজবর, ঋতুপর্ণ রাজার সারথির নাম কি? এবং তাঁহার আকৃতি কিরূপ অনুগ্রহপূর্ব্বক বিবৃত করুন।"

পর্ণাদ বলিলেন, "রাজকুমারি, সারথির নাম বাহুক, সে কৃষ্ণবর্ণ ও কুব্জ হইলেও আকৃতি দেখিয়া তাহাকে উচ্চবংশজাত বলিয়া বোধ হয়।"

এই কথা শুনিয়া দময়ন্তীর সংশয় জন্মিল। তিনি রাজ্ঞীকে বলিলেন, "মা, ঋতুপর্ণ রাজার সারথিই সম্ভবতঃ নিষধাধিপতি মহারাজ নল, আমি সেই সারথিকে দেখিতে চাই। সুদেব শর্ম্মা একবার কোশলে গমন করিয়া 'দময়ন্তীর পুনঃস্বয়ম্বর হইবে.' এই সংবাদ বিঘোষিত করুন। মহারাজ ঋতুপর্ণ স্বয়ম্বরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে সেই সারথিও নিশ্চয়ই রাজার সহিত বিদর্ভরাজ্যে আগমন করিবেন।"

রাণী বলিলেন, "এ কিরূপে সম্ভব? সেই সারথি না-ও আসিতে পারে! রাজার ত একটিমাত্র সারথি নয়?"

দময়ন্তী বলিলেন, "না মা, এ-বিষয়ে আমি এক কৌশল করিয়াছি। কোশল এস্থান হইতে বহু দূরে। যদি সুদেব তথায় গিয়া বলেন যে, কাল বিদর্ভরাজকুমারীর স্বয়ম্বর, তাহা হইলে রাজা ঋতুপর্ণ নিশ্চয়ই সেই সারথিকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিবেন; মা, আমি জানি, নিষধপতি অশ্বচালনায় অদ্বিতীয়। এক দিনে এত দূর আসিতে মহারাজ নল ভিন্ন অন্য কেহ সমর্থ হইবে না।

রাজ্ঞী তনয়ার বচনানুসারে সুদেবকে কোশল দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

সুদেব কোশলরাজসভায় গিয়া বলিল, "আগামী কল্য বিদর্ভ-রাজকুমারীর পুনঃস্বয়ম্বর হইবে।"

মহারাজ ঋতুপর্ণ স্বয়ম্বরে উপস্থিত হইবার জন্য অবিলম্বে প্রস্তুত হইয়া বাহুককে আহ্বান করতঃ বলিলেন, "সারথে, যদি তুমি একদিনের মধ্যে বিদর্ভদেশে উপস্থিত হইতে পার তাহা হইলে আমি তোমাকে তোমার অভীপ্সিত বর প্রদান করিব।"

নল বুঝিলেন ইহা দময়ন্তীর ছলনা মাত্র। সুতরাং তিনি তাঁহার সঙ্কল্প-সিদ্ধির সম্ভাবনা বুঝিয়া সম্মত হইলেন এবং বাছিয়া বাছিয়া বেগগামী তুরঙ্গ রথে যোজনা করিলেন। রথ আকাশপথে গমন করিতে লাগিল।

বাহুক রাজা ঋতুপর্ণকে নানা দেশের কথা বলিতে লাগিলেন। সহসা অশ্বরশ্মি সংযত হইল এবং রথনিযুক্ত ঘোটক চতুষ্টয় ধীরে ধীরে পৃথিবীতে অবতরণ করিল।

ঋতুপর্ণ বলিলেন, "বাহুক, রথবেগ মন্দীভূত হইল কেন?"

বাহুক বলিলেন, "মহারাজ আমরা বিদর্ভ রাজ্যের সমীপবর্ত্তী হইয়াছি।"

রাজা সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য, এত অল্প সময়ের মধ্যে তুমি এত পথ আসিলে কি প্রকারে?"

বাহুক বলিলেন, "মহারাজ, আমি পূর্ব্বে মহারাজ নলের নিকট হইতে অশ্বপরিচালনা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি। এই বিদ্যাপ্রভাবে আমি মুহূর্ত্তমধ্যে শত যোজন পথ রথ চালনা করিতে পারি। ঐ দেখুন তাপ্তী ভদ্রা প্রভৃতি নদীর সলিলসিক্ত বিদর্ভ রাজ্য।"

রাজা বলিলেন, "ভদ্র, আমি তোমার অশ্বচালনায় অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি। বল, তোমাকে কি পুরস্কার দিব।"

বাহুক সবিনয়ে বলিল, "মহারাজ, আপনি অক্ষবিদ্যায় সুনিপুণ। আমাকে সেই বিদ্যা শিখাইয়া দিন।"

রাজা ঋতুপর্ণ বলিলেন, "আমি তোমাকে সেই বিদ্যা শিখাইয়া দিতে স্বীকার করিতেছি। কিন্তু আমি তদ্‌বিনিময়ে তোমার নিকট হইতে এই অশ্বপরিচালনা বিদ্যা শিখিতে চাই।"

বিদর্ভনগরোপকণ্ঠে বাহুক ও রাজা ঋতুপর্ণ উভয়ে উভয়ের বিদ্যার বিনিময় করিলেন।

ঋতুপর্ণ বিদর্ভে উপস্থিত হইয়া স্বয়ম্বরের কোন চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত হইলেন। মনে করিলেন, তবে কি কোন প্রতারক তাঁহাকে এইরূপে প্রতারণা করিয়াছে? সহসা তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। বুঝিলেন, দময়ন্তীর পুনঃস্বয়ম্বর হওয়া কি সম্ভব? যিনি দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া নিষধপতির গলে বরমাল্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার পুনঃস্বয়ম্বর-সংবাদে বিশ্বাস করিয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি! রাজা ঋতুপর্ণ অপ্রতিভ হইলেন। একটু চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, যখন আসিয়াছি, তখন একবার বিদর্ভরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাই। ঋতুপর্ণ বিদর্ভরাজধানীতে প্রবেশ করিলেন।

রাজা ভীম কোশলরাজ ঋতুপর্ণের আগমন সংবাদে বিস্মিত হইয়া সত্বর তাঁহার নিকট গমন করতঃ যথারীতি অভিবাদনান্তে পরম সমাদরে তাঁহাকে রাজপুরীতে লইয়া গেলেন। রাজা ভীমের আদেশে সারথি ও অশ্বগণের থাকিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা হইল।

ঋতুপর্ণ বলিলেন, “বিদর্ভরাজ, আমি একজন নিপুণ অশ্বচালক পাইয়াছি। রথে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা মনে হইল, অনেক দিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তাই মহারাজ, আজ বিনা সংবাদে আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিতেছি।”

কোশলপতি আগমন করিয়াছেন শুনিয়া, দময়ন্তীর প্রাণে এক নবীন ভাবের উদয় হইল। দময়ন্তী প্রিয়সখী কেশিনীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “কেশিনি, তুমি কোশলরাজের সারথিকে একবার দেখিয়া আইস।”

কেশিনী সেই বিরূপ ও কুব্জ সারথির নিকট গমন করতঃ সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল, “মহাশয়, আপনারা কোথা হইতে এবং কি অভিলাষে এখানে আগমন করিয়াছেন অনুগ্রহপূর্ব্বক

প্রকাশ করুন। আমার সখী দময়ন্তী ইহা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।”

বাহুক। আমার প্রভু কোশলরাজ ঋতুপর্ণ কল্য এক ব্রাহ্মণের প্রমুখাৎ বিদর্ভরাজকন্যার স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়া আগমন করিয়াছেন। আমি তাঁহার সারথি।

কেশিনী। মহাশয়, আপনাদের সঙ্গে যে সূতবেশী আর একজন রহিয়াছেন উনি কে?

বাহুক। উনি নিষধরাজ নলের ভূতপূর্ব্ব সারথি, নাম বার্ষ্ণেয়। নল অক্ষক্রীড়ায় হৃতসর্ব্বস্ব হইলে তদীয় গুণশীলা সহধর্ম্মিণী তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রকন্যাদ্বয়কে ইঁহার সহিত বিদর্ভরাজ্যে পাঠাইয়া দেন। পরে ইনি ঋতুপর্ণের সারথ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন।

কেশিনী। মহাশয়, আপনি কি জানেন, মহারাজ নল এখন কোথায় আছেন? অথবা আপনি কি আপনার সহকারী বার্ষ্ণেয়ের নিকট হইতে নিষধপতি নলসম্বন্ধে কোনও কথা শুনিয়াছেন?

বাহুক। ভদ্রে, আমি নলসম্বন্ধে কোনও সংবাদ জানি না। বোধ হয় তিনি এখন ছদ্মবেশে কোন সুগুপ্ত উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াস পাইতেছেন। আমার বন্ধু বার্ষ্ণেয়ও নলসম্বন্ধে ইহা ব্যতীত অধিক কিছু অবগত আছেন বলিয়া আমার মনে হয় না।

কেশিনী। মহাশয়, রাজকুমারী দময়ন্তী পতিবিরহে সায়ংকালীন কমলিনীর মত বিষণ্ণ হইয়া কালযাপন করিতেছেন। ভর্তৃব্যাকুলা দময়ন্তী নিরুদ্দিষ্ট মহারাজ নলের অনু-সন্ধানের জন্য এক শ্লোক লিখিয়া নানাস্থানে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই সকল দূতের মধ্যে পর্ণাদ নামক এক

ব্রাহ্মণ ঋতুপর্ণের রাজধানীতে এক সারথির নিকট হইতে এই উত্তরলিপি প্রাপ্ত হন। ইহা কি আপনারই লিখিত ?

কেশিনীর নিকট হইতে দময়ন্তীর অবস্থা অবগত হইয়া ছদ্মবেশী মহারাজ নল অত্যন্ত কাতর হইলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কেশিনী বাহুকের বিস্ময়চকিত নির্ব্বাক্‌মৌন ভাব ও বিষাদরক্ত নেত্র অশ্রুসজল দেখিয়া সবিস্ময়ে অন্তঃপুরে গমন করিল।

দময়ন্তী কেশিনীর মুখ হইতে ছদ্মবেশধারী ঋতুপর্ণসারথির কথা শুনিয়া তাঁহাকেই নল বলিয়া সংশয় করতঃ শোকাভিভূত হইলেন। পরে উচ্ছলিত শোকোচ্ছ্বাস সংবরণ করিয়া ব্যগ্র হৃদয়ে পুনরপি বলিলেন, "কেশিনি, তুমি আর একবার সেই সারথির নিকট গমন কর। তুমি তাঁহার কোন অলৌকিক কার্য্য দেখিলে তৎক্ষণাৎ আসিয়া আমার নিকট প্রকাশ করিবে। সখি, জানি না কেন, তোমার নিকট হইতে সারথির কথা শুনিয়া অবধি আমার হৃদয় কেমন অশান্ত হইতেছে। যেন আমার ছিন্নতার প্রেমবীণা নবতানে ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছে। কেশিনি, আর বিলম্ব করিও না।"

কিয়ৎক্ষণ পরে কেশিনী দ্রুতপদে প্রিয়বিরহাকুলা দময়ন্তীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া বলিল, "রাজকুমারি, সারথির অলৌকিক ব্যাপার সকল দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। আমি পূর্ব্বে আর কখনও এমন অদ্ভুতকর্ম্মা মহাপুরুষ দেখি নাই। পার্থিব সমস্ত পদার্থই যেন তাঁহার আজ্ঞাবহ। সখি, দেখিলাম তাঁহার দৃষ্টিতে শূন্যকুম্ভ জলপূর্ণ হয়, বিনা অগ্নিতে শুষ্ক তৃণকাষ্ঠিকায় অগ্নিসংযোগ হয়। অধিকন্তু রাজকুমারি, সারথির হস্তমর্দ্দিত কুসুম বিকৃত বা বিবর্ণ না হইয়া সমধিক প্রফুল্ল ও সৌরভপূর্ণ হইয়া উঠে। সখি, এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার ত কখনও দেখি নাই। ইনি কি কোন ঐন্দ্রজালিক অথবা প্রত্যক্ষ দেবতা।"

দময়ন্তী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কেশিনি, আমি সব বুঝিয়াছি; আমার সমস্ত সংশয় কাটিয়াছে—তিনি দেবতা। তিনিই আমার হৃদয়রাজ্যের রাজা। সখি, এ যে হিমপলিত ধরণীর উপরে বসন্তের আকুল স্পর্শন—এ যে রৌদ্রদগ্ধ মরুভূমির মধ্যে মন্দাকিনীর স্রোতসঞ্চার—এ যে অভিশপ্ত উপবনে কোকিলের কুহুতান।" কেশিনীর বিস্ময় আরও বাড়িয়া উঠিল।

অনন্তর দময়ন্তী মাতাপিতার অভিমতানুসারে সারথিবেশী বাহুকের পরীক্ষার্থ তাঁহাকে স্বীয় প্রকোষ্ঠে আনয়ন করিবার জন্য কেশিনীকে পাঠাইয়া দিলেন।

কেশিনী রাজকুমারীর মনোভাব বিজ্ঞাপিত করিলে সেই অশ্বপাল একখানি অর্দ্ধচ্ছিন্ন বসন ও অন্য দুইখানি বস্ত্র লইয়া কেশিনীর সঙ্গে চলিল।

অবিলম্বে বাহুক সেই রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন। মনে ভাবিলেন, হায় কি দুর্দ্দৈব! যে রাজপুরীতে একদিন চতুরঙ্গ সেনা সমভিব্যাহারে বিপুল ঐশ্বর্য্যের সহিত প্রবেশ করিয়াছিলাম, আজ বিধি-বিড়ম্বনায় এই দীন-বেশে তাহাতে প্রবেশ করিতে হইতেছে? কেশিনী বাহুককে লইয়া দময়ন্তীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল।

নল বিরহ-বেশধারিণী দময়ন্তীর বিষাদময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। দময়ন্তী যদিও এই বিবর্ণ ও কুব্জদেহ সারথিকে নলের ছদ্মবেশ মনে করিয়াছিলেন তথাপি বিগতসংশয়া হইতে পারেন নাই। এই জন্য বলিলেন "হে সূত, স্বামিসহ বনচারিণী সুষুপ্তা ধর্ম্মপত্নীকে ঘোর তমোময় বনভূমিতে একাকিনী রাখিয়া স্থানান্তরে গমন এই কি মহানুভব স্বামীর কর্ত্তব্য? যে মহাপুরুষ স্বয়ম্বরসভায় সমুপস্থিত দেবগণ হইতে সমধিক পূজিত হইয়া স্বয়ম্বরমাল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যিনি অগ্নিসাক্ষী করিয়া 'আমি তোমার হইলাম' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিনা অপরাধে স্বামিময়জীবিতা সহধর্ম্মিণীকে

অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করায় কি তাঁহার সত্যপ্রতিজ্ঞ নামের সার্থকতা বর্দ্ধিত হইয়াছে ?” এই কথা বলিতে বলিতে দময়ন্তীর নেত্রযুগল অবিরল ধারায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

নল বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, “দেবি, মানুষের ইচ্ছায় কোন কার্য্য হয় না, সকল কার্য্যের নিয়ামক ভগবান। তিনিই এই বিশাল বিশ্বযন্ত্রের চালক। সুতরাং সাধুগণ কখনই এই মঙ্গলময় জগৎ অশ্রুবর্ষণে কলুষিত করেন না। বিশেষতঃ এই রহস্যময় জগতে কার্য্যকারণের সম্বন্ধ বড়ই দুর্ব্বোধ্য। কার্য্য কি, কারণ কি, কোন্ কার্য্যের মূলে ভগবানের কি শুভ উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—পার্থিব মায়াবদ্ধ প্রাণী তাহা বুঝিতে পারে না বলিয়াই এত অশান্তি। দেবি, যেদিন মানুষের এই জ্ঞানোদয় হয়, সেই দিন তাহার মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ, সেই দিনই জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতার মহনীয় সমন্বয়—সেই দিনেই মানুষের নির্ব্বাণ-সমাধি। যেদিন বাহ্যজগতের সহিত অন্তর্জগতের অভিন্নমিলন বুঝিতে পারা যায়, সেদিন প্রাণের মধ্যে আর কোন অশান্তি থাকে না। স্বামিপদ সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে পুণ্য তীর্থ—এই বিশ্বাসেই রমণীকে ধ্রুব সত্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। স্বামীর আচরণ দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করা রমণীর সতীধর্ম্মের অন্তরায়। বিশেষতঃ সেই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যমধ্যে নিদ্রিতা প্রিয়তমাকে পরিত্যাগ করা যখন সেই পাপাত্মা কলির প্রভাবে, তখন সেই স্বামীকে তুমি অপরাধী করিতে পার না ? অভিমানিনি, অভিমান ত্যাগ কর।”

দময়ন্তী আর কথা কহিতে পারিলেন না। সারথির এতাদৃশ বচন শ্রবণগোচর করিয়া তিনি মুক্তসংশয়া হইলেন। এত দিন হৃদয়-প্রকোষ্ঠে জীবিতনাথের যে ধ্যান করিতেছিলেন, দেখিলেন আজ সেই পূজা সম্পূর্ণ হইয়াছে। দময়ন্তী সহসা বাহুকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিলেন, ইনিই ভস্মাবৃত বিভাবসুর ন্যায়, রাহুগ্রস্ত শশধরসন্নিভ কলি-

সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আজ দুটি কাতর প্রাণ মিলিত হইল।

New Artistic Press, Calcutta
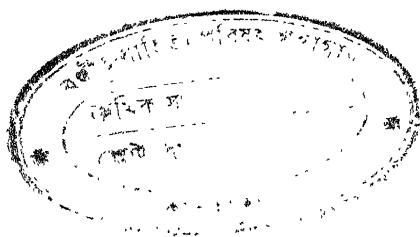
প্রপীড়িত পুণ্যশ্লোক নল। দময়ন্তী অস্থির হইয়া উঠিলেন। তখন নল বলিলেন, "মহিষি, তোমাকে পরিত্যাগের দিন হইতে মদীয় নেত্র হইতে অশ্রুজলের যে স্রোত নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা আজ তোমার নেত্রনীরে সমাধি লাভ করুক"—এই বলিয়া নল সমাদরে দময়ন্তীর অশ্রুজল মুছাইয়া দিলেন।

সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আজ দুটি কাতর প্রাণ মিলিত হইল। নল দময়ন্তীর সন্ধ্যাকমলতুল্য মলিন মুখখানি দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। দময়ন্তীও নলের এইরূপ বিকৃত রূপ দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে অশ্রুজলসম্পাতে উভয়ের বিরহতপ্ত বক্ষ শান্ত হইল।

সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের সময়ে উভয়ের মস্তকের উপর দিয়া কত ঝঞ্ঝা বহিয়াছে তাহা উভয়ে উভয়কে বিবৃত করিলেন।

তখন নল কর্কোটকপ্রদত্ত বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়া পূর্ব্বরূপ পুনঃ-প্রাপ্ত হইলেন। আজ দুরদৃষ্টরাহুকবলচ্যুত পূর্ণচন্দ্রের দর্শনে দময়ন্তীর প্রীতিনদীতে উচ্ছ্বাস উঠিতে লাগিল।

রজনীশেষের সঙ্গে সঙ্গে এই আশ্চর্য্য ঘটনা সকলের পরিজ্ঞাত হইল। বিদর্ভবাসিগণ আজ রাজজামাতা ও রাজতনয়ার পুনর্ম্মিলন দেখিয়া সানন্দে নানা উৎসবের আয়োজন করিল।

রাজা ঋতুপর্ণ নলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর নিষধাধিপতি মহারাজ নল বিদর্ভরাজগৃহে প্রাণাধিক পুত্রকন্যা ও প্রিয়তমা পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া কিয়দ্দিন সুখে বাস করতঃ নিজ রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

নল নিষধদেশে উপস্থিত হইয়াই পুষ্করকে অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। পুষ্কর উপহাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "দীর্ঘকাল দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া কি আনিয়াছ যে অক্ষক্রীড়ায় সাহসী হইতেছ?" নল বলিলেন, "তাহাই দেখাইব, আইস।"

অক্ষক্রীড়া আরব্ধ হইল। অবিলম্বে পুষ্কর সমস্ত হারিয়া গেল। কেবল পুষ্করের প্রাণমাত্র বাকি! তখন নল বলিলেন, "পুষ্কর, এখন তোমার প্রাণমাত্র অবশিষ্ট। আমি ইচ্ছা করিলে তাহাও গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু আমার তাহাতে বাসনা নাই। তুমি তোমার পূর্ব্বাধিকার প্রাপ্ত হইবে। আশা করি, তুমি অতঃপর অভিমান ও দর্প ত্যাগ করিয়া আমার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিবে।"

পুষ্কর দেবতুল্য অগ্রজের অমৃতোপম বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া চরণে ধরিয়া বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। মহারাজ নল পুষ্করের অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন।

অনন্তর মহারাজ নল পূর্ব্বের ন্যায় রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। নিষধের প্রজাগণ, ভারতের অন্যান্য রাজন্যবর্গ, মহারাজ নল ও মহারাণী দময়ন্তীর ঔদার্য্য ও নিষ্ঠার কাহিনী শ্রবণ করিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

সাধ্বী দময়ন্তী নলের জন্য যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন তাহা অবর্ণনীয়। দময়ন্তীর এতাদৃশী একাগ্রতা, এইরূপ নিষ্ঠা ও সংযম হিন্দুর পুরাণেতিহাস গৌরবান্বিত করিয়াছে। কত কাল গত হইয়াছে; এখনও সতীর সতীত্বকাহিনী ভারতের ইতিহাসে স্বুবর্ণাক্ষরে আলিখিত রহিয়াছে। যত দিন হিন্দুধর্ম্ম থাকিবে ততদিন ইহা বিলুপ্ত হইবে না।

চতুর্থ আখ্যান

শৈব্যা

চতুর্থ আখ্যান

শৈব্যা

১

আধুনিক অযোধ্যা প্রদেশ পূর্ব্বকালে কোশল নামে অভিহিত হইত। পুণ্যতোয়া সরযূর তীরে কোশল-রাজধানী অযোধ্যা নগরী অবস্থিত ছিল। অযোধ্যার সু-উচ্চ অট্টালিকাসকল সরযূর সলিল-গর্ভ হইতে উঠিয়া মেঘমণ্ডল স্পর্শ করিত। সেই ঐশ্বর্য্যময়ী অযোধ্যা নগরীতে পূর্ব্বকালে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র রাজত্ব করিতেন। সোমদত্ত-রাজকন্যা শৈব্যা তাঁহার মহিষী।

শৈব্যার রূপগুণ অবর্ণনীয়। যত কিছু সৌন্দর্য্যের সমাবেশে বিধাতা যেন সেই অনিন্দ্য ললনা-মূর্ত্তি গঠন করিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার মত রূপগুণশালিনী রমণীরত্ন লাভ করিয়া ধন্য। ফলতঃ শৈব্যার সাহচর্য্যে একদিকে যেমন মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের প্রজাপালনে অনুরাগ জন্মিয়াছিল, অন্য-দিকে হৃদয়ের সৎপ্রবৃত্তিসকলও সমধিক বিকসিত হওয়াতে তিনি এক আদর্শপুরুষরূপে প্রতিভাত হইয়া-ছিলেন। তাঁহার শৌর্য্যসূচিত বিশাল দেহ যেমন বীরত্বের আধার, হৃদয়ও তদ্রূপ কমনীয়ত্বের আগারস্বরূপ ছিল। মহারাণী শৈব্যা রাজার হৃদয়-সরোবরে ফুল্ল কমলিনীর মত শোভা পাইতেন। শৈব্যাই হরিশ্চন্দ্রের শান্তি-সুখ, শৈব্যাই তাঁহার উৎসাহ, শৈব্যাই তাঁহার সর্ব্বস্ব। দেহ ভিন্ন হইলেও সেই দুটি প্রাণ হৃদয়ের মিলনে যেন এক হইয়া গিয়াছিল।

একদিন রাজা মধ্যাহ্নভোজনের পর বিশ্রামকক্ষে পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে মন্দিরপ্রত্যাগতা শৈব্যা সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পদতলে উপবেশন করিলেন।

রাজা বলিলেন, "শৈব্যা, আজ তোমার এ অবিচার কেন ? পুষ্প-মালার আদর দেবতার গলদেশে—মণির আদর রাজার রত্নকিরীটে। অযোধ্যার রাজান্তঃপুর তোমার মত ত্রিভুবনসুন্দরী রমণী-কুসুমে সমৃদ্ধ। শাস্ত্রে বলে, সাধ্বী স্ত্রীই স্বামিহৃদয়ের দেবী। কেন তুমি আমার সে অধিকার অপহরণ করিতে চাও ? আমি ত্রিভুবন খুঁজিয়া যে রত্নটি সংগ্রহ করিয়াছি, কেন আজ সে রত্ন আমার অযথা স্থানে রক্ষিত ? শৈব্যা, তুমি যে আমার কামনার কৌস্তুভমণি, তুমি যে নিদাঘপীড়িত স্বামীর সোহাগ চন্দন।" এই বলিয়া রাজা সসম্ভ্রমে রাণীর বাহুযুগল ধারণ করিয়া তাঁহাকে বক্ষে আকর্ষণ করিলেন।

শৈব্যা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "নাথ, আপনার আদরে, সোহাগে আমি সৌভাগ্যবতী। কিন্তু নাথ, নারীর নারীত্ব স্বামীর বক্ষে মেলে না। নারীর নারীত্ব স্বামীর পাদমূলে ! এতদিন আমি আমার সাধন-ক্ষেত্র খুঁজিয়া পাই নাই—আজ দেবীমন্দিরে আচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। নাথ, স্বামীর নিকটে রমণীর এই যে শ্রেষ্ঠ অধিকার তাহা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না।

রাজা। প্রিয়ে, আজ তোমাকে যেন নূতন রূপে দেখিতেছি। তোমার সেই লীলাচঞ্চল চক্ষুতারকা আজ যেন উদার বিশ্বপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, যেন তুমি আজ দুইহস্তে কল্যাণ ও পবিত্রতা লইয়া জগতের মধ্যে এক নবজীবনের সূচনা করিতেছ। ধন্য আমি, এ-হেন রমণীরত্ন আমার হৃদয়-সিংহাসনের গৌরবময়ী দেবী।

রাণী। না মহারাজ, দাসী। রমণী স্বামিসকাশে দেবীত্বে ধন্য নয়, সে তাঁহার নিকটে দাসীত্বে সার্থক। নারীর প্রাণ স্বামীকে পূজার অর্ঘ্য দিয়া ধন্য, আর স্বামীর প্রাণ পত্নীকে স্নেহ দিয়া পবিত্র। মহারাজ, ইহাই ত প্রেম।

এই প্রেমের মধ্যে যেখানে বাসনার আগুন জ্বলে, সেখানে সুখের সংসার পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া যায়। তাহা প্রেম নয়; তাহা যৌবনের উচ্ছল আমোদ, লালসার মরীচিকা, কামের অগ্নিশিখা! মহারাজ, কামনার সোহাগচুম্বন, শান্তিদায়িনী অমৃতধারা নহে—সর্ব্বনাশের প্রতপ্ত মদিরা! প্রেমের অঙ্কুর তাহাতে চিরদিনের জন্য শুকাইয়া যায়। প্রেমে যেখানে কামনা, সে স্থান কেবল অমঙ্গলের প্রেতভূমি।

মহারাণী শৈব্যার এইরূপ গৌরবপূর্ণ বাক্যাবলি শ্রবণ করিতে করিতে সহসা হরিশ্চন্দ্রের প্রণয়পবিত্র প্রাণ সৌভাগ্যগর্ব্বে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বর্ষার মেঘকলুষিত আকাশমণ্ডল যেমন বিদ্যুদ্বিকাশে ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের প্রেমকাতর প্রাণও তেমনি শৈব্যার অতলস্পর্শ প্রেমের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিতেছিল। হরিশ্চন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "রাজ্ঞি, বুঝিয়াছি তোমার কথা। তুমি এ নিদাঘ-মধ্যাহ্নে প্রণয়কাতর স্বামীর পার্শ্বে যে-বিষয়ের প্রস্তাবনা আরম্ভ করিয়াছ, আমি তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছি।

রাণী। বুঝিয়াছ মহারাজ? বুঝিবেই ত! সৌরকর কি মেঘের অন্তরালে চিরপ্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে? তোমার যে কীর্ত্তি-কাহিনী চিরদিনের জন্য পৃথিবীতে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে, তাহা কি কখনও অন্তঃপুরেই সুগুপ্ত থাকিতে পারে? তোমাকে গৌরবের কিরীটে সুশোভিত দেখিবার জন্য আমার প্রাণ অপেক্ষা করিতেছে! মহারাজ, বাসনার নিবৃত্তি নাই, একটা পূর্ণ হইলেই আবার আর একটা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। একবার অতীত জীবন স্মরণ কর। যখন নিদাঘে তুমি রাজধানীর অগ্নিকুণ্ডসন্নিভ পাষাণপ্রাসাদ

পরিত্যাগ করিয়া তুষারকিরীট হিমাচলের শান্তশীতল শৃঙ্গে অবস্থান করিতে, তখন আবার বর্ষাগমে মর্ম্মরশৈলচুম্বিতা নর্ম্মদার সলিলে নৌবিহারের জন্য আকুল বাসনা উদিত হইত। বাসনার নিবৃত্তি কি ঐ খানে? নর্ম্মদাতীরস্থ কাশ-কুসুম যখন বর্ষার বিদায়-অভিনন্দন গান করিত, সৌরকরে পীতাভা দেখা দিত, কলকণ্ঠ হংসকুল নীল আকাশের গায় শ্বেতকমলের মালা পরাইয়া উত্তরে মানসসরোবরে গমন করিত, তখন তোমার প্রাণের মধ্যে আবার এক নবীন বাসনা জাগিয়া উঠিত। তুমি আবার আমায় লইয়া মানসসরোবরে গমন করিতে। কিন্তু বাসনার নিবৃত্তি তখনও নয়। যেদিন দেখিতে, মানসসরোবরে ফুল্ল নলিনীদল তুহিনবিন্দুরূপ অশ্রুকণা ফেলিয়া শরতের বিদায়ে শোকগাথা গান করিতেছে, তখন আবার রাজ-ধানীতে প্রত্যাগত হইতে। কিন্তু নাথ, সে সুখের সংসারেও আবার আর এক বাসনা কি এক মোহনমূর্ত্তি ধরিয়া তোমার প্রাণকে আকর্ষণ করিত। যখন দেখিতে এই হিমপলিত ধরণী ফুলে-ফুলে ফুলময় হইয়াছে, সৌরকর স্পর্শসুখকর হইয়াছে, মলয়ানিল বহিতেছে, পক্ষিকুল পুলকাবেশে কোমল সুরে নবতান তুলিতেছে, তখন তোমার প্রাণ আবার নিকুঞ্জবাসের জন্য লালায়িত হইত। মহারাজ, তখন তুমি আমায় লইয়া আবার উদ্যানবাটিকায় গমন করিতে। ভাবিয়া দেখ বাসনার নিবৃত্তি কোথায়? আমি আমার প্রেমপিপাসিত স্বামীর হৃদয়ে লালসার প্রজ্বলিত বহ্নিশিখায় ঘৃতধারা ঢালিয়া তাহাকে ক্রমশঃই বাড়াইয়া তুলিয়াছি। মহারাজ, এখন আমার সে ভ্রম ভাঙ্গিয়াছে। বুঝিয়াছি আমি, সুখ নিবৃত্তিতে—সুখ কর্ত্তব্যপালনে।
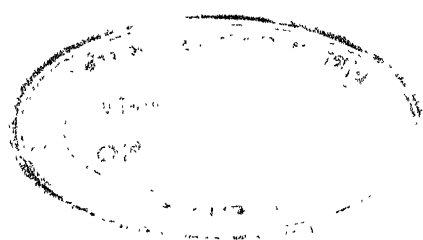
মন্দিরপথে মহারাণী শৈব্যা

রাজা মনে মনে ভাবিলেন, 'এমন প্রতিভাপ্রদীপ্তা সৌন্দর্য্য-প্রতিমার মনোহারিণী শোভা ত আমি পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। আজ শৈব্যা আমার কেবল পত্নী নয়, শৈব্যা আজ আমার প্রত্যক্ষীভূতা অদৃষ্টদেবী।' প্রকাশ্যে বলিলেন, "শৈব্যা, বুঝিতেছি, আমি অব্যক্ত উন্মাদনায় আত্মবিস্মৃত হইয়াছি; বাসনার জ্বালায় হৃদয়কে দগ্ধ মরুভূমি হইতে ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছি। কিন্তু প্রাণাধিকে, আমার সে মোহঘোর যে কাটিয়াও কাটিতেছে না!"

রাণী। নাথ, জানি আমি তুমি আমাকে কত ভালবাস। কিন্তু সেই ভালবাসাই সীমা অতিক্রম করিয়া ভীষণ হইয়াছে। তোমার যে জীবনতরণী কর্ত্তব্যসমুদ্রের উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া নবীন উন্মাদনায় ছুটিতেছিল, এখন তাহা সোণার পণ্যভার লইয়া নবীন পথে ছুটিয়াছে। সেটা বুঝিতে পারিতেছ কি?

রাজা। রাণি, যদি তোমার প্রতি আমার ভালবাসা থাকে, যদি আমি তোমাকে চিনিয়া থাকি, তবে নিশ্চিত জানিও, আমার সে তরণী অপূর্ব্ব গৌরবে কূলে প্রত্যাগত হইবে। যতই দুঃখের অন্ধকার ঘনীভূত হউক, ধ্রুবতারা তোমাকে দেখিয়াই আমি পথ নির্দ্দেশ করিব।

এইরূপ কথাবার্ত্তায় বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। শৈব্যা স্বামীর অনুমতি লইয়া দেবমন্দিরে গমন করিবার উপযুক্ত বেশ পরিধান করতঃ সহচরী ও পরিচারিকার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনতিবিলম্বে সহচরী ও পরিচারিকা তথায় উপনীত হইল। রক্তপট্টাম্বরধারিণী শৈব্যাদেবী একহস্তে স্বর্ণনির্ম্মিত পুষ্পপাত্রে বিবিধ সুরভি কুসুম এবং অপর হস্তে তীর্থোদকপূর্ণ স্বর্ণভৃঙ্গার ও অপরাপর পূজোপকরণ লইয়া জ্যোতিষ্কসমুজ্জ্বল নীহারিকাপথে বিচরণশীলা সুরাঙ্গনার মত মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

২

মন্দিরপ্রত্যাগতা শৈব্যা বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মহারাজ নিদ্রিত। তিনি স্বামীর পদতলে উপবেশন করিয়া সযত্নে স্বামিপদযুগল মস্তকে ধারণ করতঃ বলিলেন, "হে বিধাতা, এই স্বামিপদই আমার পরম তীর্থ। অবলার হৃদয়ে শক্তি দাও, যেন আমি এই পরম তীর্থসন্নিধানে বাসনা পরিত্যাগ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি।" এইরূপ বলিতে বলিতে সহসা শৈব্যার নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গলিয়া রাজার চরণে পড়িল।

এই সংসারে ক্ষুদ্র, বৃহৎ, তুচ্ছ, মহৎ, নির্দ্ধারণ বড় দুরূহ। কাহার কি কার্য্য, তাহা নিরূপণ করা বড় কঠিন। রাণী নিদ্রিত রাজার চরণযুগল কোমল করে ধারণ করিয়া মস্তকে স্থাপন করিলেন, চরণসরোজসংলগ্ন রেণুকণায় সতীর সিন্দূরপূত ললাট পবিত্র হইল, তথাপি সুষুপ্তিক্রোড়শায়িত রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। কিন্তু দুই বিন্দু অশ্রুপতনেই রাজা জাগিয়া উঠিলেন। হরিশ্চন্দ্র নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, প্রকোষ্ঠ অপূর্ব্ব বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে।

রাজা সসম্ভ্রমে শয্যায় উপবেশন করতঃ রাণীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "শৈব্যা, কেন তুমি কাঁদিতেছিলে? তোমার একবিন্দু অশ্রুজল যে আমার সমস্ত সাধনা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। আজ মধ্যাহ্নে তোমার অশ্রুসিক্ত মুখখানি দেখিয়া যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তাহা যে আমার চিরকাল মনে থাকিবে! দেখ দেবি, আজ তোমার অশ্রুজলের ঔজ্জ্বল্যে ঐ দীপশিখা যেন মলিন হইয়া গিয়াছে।

রাণী মধুরকণ্ঠে বলিলেন, "নাথ, ধন্য তুমি, আর ততোধিক ধন্যা আমি, যে তোমার মত দেবকল্প স্বামী লাভ করিয়াছি।"

রাজা প্রেমকাতর দৃষ্টিতে রাণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শৈব্যা, তুমি যে আমার কামনার অনাঘ্রাত কুসুম, তুমি যে আমার শরীরিণী

সাধনা। তোমার মত রমণীরত্নকে বক্ষে ধারণ করিয়া আমি ধন্য, তৃপ্ত।"

রাণী বলিলেন, "নাথ, দেবতার গলদেশে পুষ্পমালা শোভা পায়, তাহাতে দেবতা ধন্য, কি পুষ্পমালা ধন্য ?"

রাজা স্নেহভরে বলিলেন, "তাহাতে উভয়েই ধন্য।"

রাণী হাসিয়া বলিলেন, "না মহারাজ, ইহাতে অন্যায় বিচার চলিবে না।" এইরূপ নানা কথাবার্ত্তায় রাজারাণীর সুখের রজনী অতিবাহিত হইল।

কিছুদিন পরে রাণী শৈব্যার দোহদলক্ষণ আবির্ভূত হইল। অন্তঃপুরে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল।

যথাসময়ে রাণী এক সুকুমার পুত্র প্রসব করিলেন। কোশল-রাজ্য কুমারের শুভ জন্মোৎসবে আনন্দহিল্লোলে ভাসিতে লাগিল। রাজ-পুরোহিত কুমারের জাতসংস্কারবিধি সম্পন্ন করিলেন। শিশুর রূপজ্যোতিতে সূতিকাগৃহ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল যেন সূতিকাগারস্থ দীপাবলি সদ্যোজাত শিশুর অঙ্গশোভার নিকট হীনদ্যুতি হইয়া পড়িয়াছে। আশার মোহন বাণী শৈব্যার অন্ত-প্রদেশে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। শৈব্যা নবকুমারের মুখাবলোকন করিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

সেদিন কোশলদেশে যেন শতধারে আনন্দ ছুটিতে লাগিল। দেবমন্দিরসমূহ বিশিষ্ট উৎসবে মুখরিত হইয়া উঠিল। নগরমধ্যস্থ উচ্চ তোরণরাজিতে মঙ্গলবাদ্য নিনাদিত হইতে লাগিল। পুরবাসিনী রমণীগণ কুমারের জন্ম-উপলক্ষে প্রীতিপ্রফুল্লমনে মঙ্গলশঙ্খ নিনাদিত করিতে লাগিলেন। নবকুমারের মঙ্গল উদ্দেশ্যে রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। দীনদুঃখী, অন্ধ-আতুর, প্রচুর ধন লাভ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। ভূমিপ্রার্থী ভূমি, অন্নার্থী অন্ন প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণকাম। ব্রাহ্মণগণ সহস্র সহস্র গাভী ও প্রচুর

উপহার পাইলেন। রাজা অপূর্ব্ব আমোদে দুই হস্তে দান করিতে লাগিলেন। কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণের অপরাধ মার্জ্জিত হইল। তাহারা রাজকুমারের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে কারামুক্ত হইয়া নবকুমারের উপর আশীর্ব্বাদ ও প্রীতি বর্ষণ করিতে করিতে গৃহে গমন করিল।

রাজা হরিশ্চন্দ্র পুত্র লাভ করিয়াছেন—স্বর্গে দেবকন্যাগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। পুরবাসিনীগণ সেই রাজকুমারকে দেখিবার জন্য সূতিকা-গৃহের দ্বারে এক মহা জনতা করিয়া তুলিলেন। ব্রাহ্মণ-গণ দুই হাত তুলিয়া নবপ্রসূত রাজকুমারের উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিলেন। হরিশ্চন্দ্রের প্রিয় সামন্তরাজগণ বহুমূল্য রত্নাদি উপহার দিয়া নবকুমারের ফুল্ল অরবিন্দসদৃশ মুখখানি অবলোকন করতঃ পুলকিত হইলেন। নাগরিক প্রজাগণ রাজকুমার দেখিতে আসিয়া সেই বিশাল পুরী প্রীতিপূর্ণ কথায় মুখরিত করিয়া তুলিল। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন, প্রজাগণের সেই আনন্দপূর্ণ জয়ধ্বনিতে রাজ-গৃহানুষ্ঠিত কুমারের জন্মমহোৎসব যেন সমৃদ্ধিহীন হইয়া গেল।

শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রকলার মত নবকুমার দিন দিন বাড়িতে লাগিল। হরিশ্চন্দ্র নবকুমারের রোহিতাশ্ব নাম নির্দ্দেশ করিলেন। রাজকুমার নামকরণে কৃতসংস্কার হইয়া সমধিক সুন্দর হইয়া উঠিল। ক্রমে শিশুর সেই কমনীয় মুখে কুন্দকুসুমসন্নিভ দুই একটি দন্ত উঠিতে দেখা গেল। রাজা ও রাণী শিশুর অর্দ্ধস্ফুট কথা শুনিয়া যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। শিশুকে দেখিয়া তাঁহাদের প্রাণ যেন চন্দ্রদর্শনে সাগরের মত পুলকচঞ্চল হইয়া উঠিত।

একদিন রাজকুমার রোহিতাশ্ব জননীর সহিত উদ্যান ভ্রমণ করিতে করিতে বলিল, "মা, একটি হরিণশাবক দাও না, আমি তাহাকে পুষিব।"

রাণী শৈব্যা তৎক্ষণাৎ উদ্যানরক্ষয়িত্রীকে বলিলেন, "কুমারের জন্য একটি চিত্রাঙ্গ মৃগশিশু লইয়া আইস।"

উদ্যানপালিকা অবিলম্বে রাজ্ঞীর আদেশপালনার্থ উদ্যানের অপর পার্শ্বস্থ পশুশালার দিকে ছুটিল। গিয়া দেখিল, তথায় একটিও হরিণশাবক নাই। সে তখন সভয়ে আসিয়া রাণীকে শুষ্ক-মুখে এই সংবাদ জানাইল।

এদিকে কুমার রোহিতাশ্ব হরিণশাবকের জন্য জননীর নিকট জেদ করিতে লাগিল।

রাণী বলিলেন, "বাছা, এখানে এখন মৃগশিশু নাই। আমি মহারাজকে বলিয়া তোমার জন্য হরিণশাবক আনাইব।"

রাণী অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কুমার রোহিতাশ্বের প্রাণ কেবল মৃগশাবক চাহিতেছিল। রাণীর ইঙ্গিতে উদ্যানপালিকা একটি সুন্দর পক্ষী আনিয়া উপস্থিত করিল। রাণী সেই পাখীটি দেখাইয়া বলিলেন, "বৎস, দেখ দেখি কেমন সুন্দর পাখীটি।" কুমারের কৌতূহলাক্রান্ত প্রাণ পক্ষী হইয়া আশ্বস্ত হইল।

রাণী শৈব্যা কুমারকে বক্ষে স্থাপনপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন, "নাথ, উদ্যানভ্রমণ করিতে করিতে আজ বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম।"

হরিশ্চন্দ্র বিপদের কথা শুনিয়া কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বিপদে পড়িয়াছিলে রাণি?"

শৈব্যা সমস্ত বর্ণন করিলে হরিশ্চন্দ্র কুমারের মুখচুম্বন করিয়া সস্নেহে বলিলেন, "আচ্ছা কুমার, আমি তোমাকে চিত্রাঙ্গ হরিণশাবক আনিয়া দিব।"

৩

একদিন অমরাবতীতে দেবগণের সভা বসিয়াছে। সেই সভায় নানাবিধ আমোদপ্রমোদের সহিত অপ্সরাগণের নৃত্যগীতও আরম্ভ হইয়াছে; তিলোত্তমা, রম্ভা, উর্ব্বশী, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণ

পুলকাবেশে নৃত্য করিতেছে। কয়েকটি অনভ্যস্তা যৌবনচটুলা অপ্সরা সেই বিরাট দেবসভায় সহসা তালভঙ্গ করাতে যেন সেই সভার গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইয়া গেল। দেবরাজ ইন্দ্র এজন্য তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিলেন, "যেমন তোমরা এই দেবসভার গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিয়াছ তেমনি দুঃখময়ী পৃথিবীতে গমন করিয়া শাস্তি ভোগ কর।"

অপ্সরাগণ দেবরাজের চরণে পুনঃপুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বলিল, "হে দেবরাজ, আমরা অশিক্ষিতা, বিশেষতঃ বয়োধর্ম্মে বিলাসের মাদকতা আমাদিগকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া রাখিয়াছিল, এই নিমিত্ত আমাদের অগোচরে এতাদৃশ তালভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। কৃপা করিয়া হতভাগিনীদের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

দেবগণ ইন্দ্রের এই ভীষণ অভিশাপ ও অপ্সরাদের এইরূপ কাতরতাপূর্ণ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া মনে করিতেছিলেন, ইহাদের পক্ষে এই শাস্তিটা যেন কিছু অধিক হইয়াছে। ইন্দ্রও অপ্সরাদের কাতর ক্রন্দনে একটু শান্তচিত্ত হইয়াছিলেন। এখন, দেবগণের হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া অপ্সরাগণকে বলিলেন, "আমার কথার অন্যথা হইবে না। তোমরা ধরণীতে গিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপোবনসান্নিধ্যে বাস কর। যেদিন অযোধ্যাপতি মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে সেই দিন তোমাদিগের মুক্তি লাভ হইবে।" অপ্সরাগণ দারুণ হতাশার মধ্যে সেই আশাটিকে গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে দেবলোক ত্যাগকরতঃ বিশ্বামিত্রের আশ্রমপদে * আগমন করিল। তাহারা দেখিল, সেই তপোবনে কুসুমকুল গুচ্ছে গুচ্ছে প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে; আর সেই বিকসিত কুসুমরাশির চারিদিকে কত মধুকর গুঞ্জন করিতেছে। বৃক্ষে বৃক্ষে নানাবিধ কোমলকণ্ঠ বিহঙ্গম স্বরলহরীতে সেই তপোবন মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। তপোবন-

---

* বর্ত্তমান সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত বক্সার ষ্টেশনের নিকটস্থ চরিত্রবন নামক স্থান।

মধ্যস্থ সরসীর সলিলে কমল, কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি জলজ কুসুম বায়ুভরে কম্পিত হইয়া সেই সরসীর অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। যেন জলে স্থলে ফুলের মেলা। অপ্সরাগণ বিশ্বামিত্রের সেই তপোবন দেখিয়া স্বর্গের সুখ বিস্মৃত হইল।

বিশ্বামিত্র সকল সময়ে সেই তপোবনে অবস্থান করিতেন না। কখনও হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে ভ্রমণ করতঃ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, কখনও বা তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিয়া হৃদয়ের তৃপ্তি সম্পাদন করিতেন, কখনও বা নিভৃত গিরিগহ্বরে সমাধিস্থ হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতেন, আবার কখনও বা তপোবনে আসিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন।

অপ্সরাগণ সেই তপোবনে স্বচ্ছন্দ-সরল মৃগকুল, বিবিধ বারি-বিহঙ্গকূজিত সরসী, কুসুমিত বনলতার মোহন দৃশ্য, হরিৎশস্যসমাচ্ছন্ন বনভূমির শ্যামশোভা, এবং সারসপংক্তিখচিত নীলাকাশ দেখিয়া স্বর্গের সুখ বিস্মৃত হইল। পঞ্চসখী মনের আনন্দে তপোবনে বিচরণ করিত। ভ্রমরের গুঞ্জনে. কোকিলের কুহুস্বরে তাহারা আপনাদের কণ্ঠস্বর মিলাইয়া গান করিত। নবজলধর দর্শনে যখন শিখিকুল পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিত, তখন তাহারাও পুলকাবেশে লীলাঞ্চিত নীল নিচোলখানি উড়াইয়া মনের অনুরাগে সেই নৃত্যের অনুকরণ করিত। কখনও বা কৌতুকাকুলা পঞ্চসখী মধুপানমত্ত গুঞ্জরণশীল ভ্রমরকুলকে পুষ্প হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিত। তখন তাহাদের চরণসরোজস্পৃষ্ট নীলানূপুর মধুর শিঞ্জনে অনুরণিত হইয়া উঠিত। কখনও বা জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীতে মদবিহ্বল নেত্রে তপোবনের পুষ্পসমৃদ্ধি এবং তারকাখচিত নীলাকাশের পার্থক্য দর্শন করিত। তাহাদের হাসির ছটায় প্রকৃতির চন্দ্রিকা-শুভ্র উজ্জ্বল বসন অধিকতর মনোজ্ঞ ও বিচিত্র হইয়া উঠিত। কখনও কীচকরন্ধ্রসঞ্জাত স্বরলহরী শুনিয়া তাহাদের প্রাণে অতীত স্মৃতির

স্বপ্নময় আলেখ্য জাগিয়া উঠিত। পঞ্চসখী আকুলপ্রাণে বনদেবীর সেই মোহন সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া পড়িত।

৪

অভিশপ্তা অপ্সরাগণ বিশ্বামিত্রের তপোবনসান্নিধ্যে বাস করিতেছিল। তাহাদের স্বর্গের জীবন স্বর্গোচিত আনন্দে অভ্যস্ত। তাই তাহারা মনের সুখে গান করে, নদীতীরে বসিয়া পাঁচটি সখীতে কত গল্প করে, কখনও বা নদীর সুনির্ম্মল জলে অবতরণ করিয়া জলকেলি করে। কখনও বা নানা বর্ণের ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া এ-উহার গলায় দিয়া কত হাস্যকৌতুকে কাল কাটায়—কিন্তু এত আমোদে থাকিয়াও তাহাদের প্রাণে মধ্যে মধ্যে সেই স্বর্গীয় জীবনের সুখস্মৃতি জাগিয়া উঠিত।

এইরূপে মদবিহ্বলা পঞ্চসখীর যথেচ্ছ ভ্রমণ ও পুষ্পচয়নে সেই আশ্রমের পুষ্পশোভিত বৃক্ষলতাসকল ক্রমেই ভগ্নশাখ ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। লতাকুঞ্জসকল অপ্সরাগণের উদ্দাম ক্রীড়ারঙ্গে বিগতশ্রী হইয়া উঠিল।

একদিন উগ্রতপা বিশ্বামিত্র হিমাচল পর্য্যটন করিয়া তপোবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, তাঁহার তপোবনে প্রবেশ করিয়া কে ফুল তুলিয়া লইয়া গিয়াছে, আর বৃক্ষলতা সকল কাহাদের নির্ম্মমতায় হতশ্রী হইয়া রহিয়াছে।

সংসারপরিত্যাগী মুনিগণ আশ্রমের বৃক্ষলতাগুলিকে পুত্রকন্যার মত দেখিয়া থাকেন। সংসারিগণ যেমন সংসারে থাকিয়া পুত্রকন্যাদির প্রতিপালন করেন মুনিগণও তদ্রূপ পুষ্পবৃক্ষগুলিকে ফুলে ফলে সুশোভিত দেখিবার জন্য তাহাদের মূলদেশে আলবাল রচনা করিয়া দেন। পুষ্পলতাগুলিকে সযত্নে বৃক্ষকাণ্ডে সংলগ্ন করিয়া দেন। বিশ্বামিত্র তদীয় অনুপস্থিতি কালে কোনও দুর্বৃত্তের এই অত্যাচার

মনে করিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। পর দিন তপোবনে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই কেহ সমস্ত ফুল তুলিয়া লইয়া গিয়াছে—কুসুমলতাসকল বৃক্ষকাণ্ড হইতে স্খলিত হইয়া ধূলায় গড়াইতেছে। অধিকাংশ পুষ্পমুকুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লবসহ ভূমিতে পড়িয়া মলিন হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া বিশ্বামিত্রের ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি তপোবনের বৃক্ষলতাসমূহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অতঃপর যাহারা এখানে পুষ্পচয়নার্থ আগমন করিবে তোমরা তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিবে। আমি তাহাদের সমুচিত শাস্তি বিধান করিব।"

তপস্যার কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! তপঃপ্রভাবে মানুষ দেবতার অধিকার লাভ করে। তপোবনের তরুলতা সকল বিশ্বামিত্রের আদেশ প্রতিপালনে সচেষ্ট হইল।

পরদিন অভিশপ্তা অপ্সরাগণ মনের আনন্দে গান করিতে করিতে সেই তপোবনে প্রবেশ করিল। তাহারা তপোবনে পদার্পণ করিবামাত্র বৃক্ষলতা সকল ধীরে ধীরে কম্পিত হইতে লাগিল। মদবিহ্বলা অপ্সরাগণ বৃক্ষলতার এই কম্পন লক্ষ্য করিল না। অভিশপ্তাগণের উপর আবার অভিশাপ! পঞ্চসখী কুসুমসংগ্রহার্থ যত্নবতী হইবামাত্র এককালে লতাবন্ধনে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইল। তাহারা বন্ধন মোচনের জন্য অনেক চেষ্টা করিল, কিছুতেই সে বন্ধন উন্মোচন করিতে পারিল না। ঋষির অভিশাপের নিকট অপ্সরাগণের শারীরিক বল পরাজিত হইল। তখন তাহারা অনন্যোপায় হইয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রের নাম করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

৫

রাজা হরিশ্চন্দ্র, মন্ত্রী, প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ও বহু সৈন্যসহ শিকারার্থ বনে আসিয়াছেন। চিত্রাঙ্গ মৃগের অনুসন্ধানে চারিদিকে সৈন্য সকল কোলাহল করিতেছে, কিন্তু বহু চেষ্টাতেও কোথাও চিত্রাঙ্গ হরিণ

দেখিতে পাওয়া গেল না। 'এ স্থান প্রচুর হরিণের বাসভূমি, কিন্তু আজ কি দুর্দ্দৈব, একটাও হরিণ দেখিতে পাইলাম না—' রাজা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় একটি সুন্দর চিত্রাঙ্গ মৃগ রাজার পার্শ্ব দিয়া দৌড়িয়া পলায়ন করিতেছে দেখিয়া, তিনি তৎপ্রতি শরসন্ধান করিলেন। নানা নরকণ্ঠ-কোলাহলে ভীত মৃগশিশু যেন রাজার নিক্ষিপ্ত শরকে ব্যঙ্গ করিয়া দূরে চলিয়া গেল। অব্যর্থ শরপ্রয়োগপটু রাজা হরিশ্চন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, 'এ কি হইল? আমার লক্ষ্য ব্যর্থ হইল কেন? জানি না, আজ আমার অদৃষ্টে কি আছে?'

সহসা শুনিতে পাইলেন, কে যেন এই বনে তাঁহার নাম লইয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছে। পরার্থপর রাজার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে রোদনধ্বনি অনুসরণ করিয়া দ্রুতপদে ধাবমান হইলেন। গিয়া দেখিলেন, পাঁচটি অলোকসামান্যরূপবতী রমণী লতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া উদ্ধারার্থ তাঁহাকে ডাকিতেছে। তাহাদের সেই নৈরাশ্যব্যঞ্জক বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া হরিশ্চন্দ্র সেই বন্ধন মোচন করিতে চেষ্টা করিলেন। রাজার শারীরিক বল বিশ্বামিত্রের মানসী শক্তির নিকট এই প্রথম পরাভূত হইল। রাজা সহস্র চেষ্টাতেও সেই বন্ধন মোচন করিতে অসমর্থ হইয়া তরবারি দ্বারা লতাবন্ধন ছিন্ন করিয়া অপ্সরাগণের উদ্ধার করিলেন! লতাবন্ধনমুক্ত অপ্সরাগণ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, "হে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, আপনি বিস্মিত হইবেন না—আমরা অপ্সরা। দেবরাজ ইন্দ্রকর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়া এই পৃথিবীতে অভিশাপের ফলভোগ করিতেছিলাম। আজ আপনার দর্শনে আমাদের মুক্তি হইল। আমরা আশীর্ব্বাদ করি, আপনার মঙ্গল হউক। মহারাজ, ধর্ম্মই সকলের সহায়। সুখে দুঃখে ধর্ম্ম ও সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। আজ বিদায়ের পবিত্র মুহূর্ত্তে আমাদের প্রার্থনা, যেন আপনার যশের প্রভায় ধরণী

উজ্জ্বল হইয়া উঠে। মহারাজ, অবিলম্বেই আমরা অমরাবতীতে গমন করিব। ঐ দেখুন দেববালা-পরিচালিত রথ আকাশপ্রান্ত হইতে অবতীর্ণ হইতেছে।"

বিস্ময়মৌন রাজা হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন সহসা সেই স্থানে দেবরথ উপস্থিত হইল। অভিশাপমুক্তা পঞ্চসখী অম্লান পারিজাতের মালা রাজা হরিশ্চন্দ্রের কণ্ঠদেশে প্রদান করিয়া বলিয়া গেলেন, "এই পারিজাতের সৌরভের মত আপনার যশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হউক।"

রাজা এই ব্যাপারে একেবারে বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িলেন। পরে ভাবিতে ভাবিতে সহচরগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

৬

রাজা হরিশ্চন্দ্র সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, এমন সময়ে মূর্ত্তিমান্ ক্রোধের মত বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা, মন্ত্রী ও অন্যান্য অনুচরগণ মহর্ষির চরণে প্রণত হইলেন, তথাপি মহর্ষির ক্রোধের শান্তি হইল না। বিশ্বামিত্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ক্রোধভরে বলিলেন, "হরিশ্চন্দ্র, তুমি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া আমার অভিশাপ ব্যর্থ করিয়াছ, এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার?"

রাজা হরিশ্চন্দ্র সবিনয়ে বলিলেন, "মহর্ষে, আমি না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।"

মহর্ষি বলিলেন, "তোমার এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়। তপোবনে মৃগশিকার এই কি রাজার কর্ত্তব্য? অধিকন্তু যাহারা অন্যায়ের জন্য আমার নিকট শাস্তি ভোগ করিতেছিল, তাহাদের কাতর ক্রন্দনে তুমি আমার অভিশাপ ব্যর্থ করিয়াছ—আমার স্বযত্নপালিত কুসুমলতা ছিন্ন করিয়াছ—এত বড় ক্ষমতা তোমার?"

এই বলিয়া মহর্ষি অভিশাপ প্রদানের জন্য জলগণ্ডূষ ধারণ করিলেন। বিশ্বামিত্রের ক্রোধ দেখিয়া যেন ধরণী ঘন ঘন কম্পিতা হইতে লাগিল—দিক্‌প্রান্ত মলিন হইয়া গেল। হরিশ্চন্দ্র প্রমাদ গণিয়া মহর্ষির চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাজার কাতরতা দেখিয়া বিশ্বামিত্রের একটু দয়ার সঞ্চার হইল। তাঁহার ক্রোধকুঞ্চিত ভ্রূ যেন স্বাভাবিক আকার ধারণ করিল। মহর্ষি বলিলেন, "রাজন্, তবে তোমার এই অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে আমায় কিছু দান কর।"

রাজা। মহাভাগ, আপনার অনুকম্পায় আমি কৃতার্থ হইলাম। আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহা পালন করিতে প্রস্তুত।

মহর্ষি। দেখিও মহারাজ, সত্যের নিকট পশ্চাৎপদ হইও না। অমি কি চাই শোন। অমি একটি যজ্ঞানুষ্ঠান করিব ইচ্ছা করিয়াছি। আমাকে সেই যজ্ঞ সমাধানের উপযুক্ত অর্থ প্রদান কর।

রাজা। দেব, যজ্ঞার্থ দান—সে-ত রাজার কর্ত্তব্য। সুতরাং ইহা আমার অপরাধের শাস্তি নয়।

মহর্ষি। তবে তুমি তোমার এই সসাগরা ধরণী আমাকে দান কর।

এই কথা শুনিয়া রাজার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "মহর্ষে, আমি আপনার কথামত সমস্ত পৃথিবী দান করিলাম।"

বিশ্বামিত্র প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন, "রাজন্, দান ত করিলে, কিন্তু বোধ হয় জান, দক্ষিণা ব্যতীত দানকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। অতএব তোমার এই দানের দক্ষিণা স্বরূপ আমাকে সহস্র সুবর্ণমুদ্রা প্রদান কর।"

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, "আমি দক্ষিণাস্বরূপে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করিলাম।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "মহারাজ, তুমি আমাকে ইতঃপূর্ব্বে সমগ্র পৃথিবী দান করিয়াছ। মনে থাকে যেন—তোমার রাজ্য, রাজধানী, রাজপ্রাসাদ, রাজকোষ এখন সমস্তই আমার।"

রাজার চমক ভাঙ্গিল। ভাবিলেন, তবে কি আমি একা! আমার প্রাণাধিকা শৈব্যা, প্রাণপ্রতিম রোহিতাশ্ব কি তবে আর আমার নয়?

মহর্ষি বলিলেন, "মহারাজ, মনে রাখিও—আজ হইতে রাণী ও রাজকুমার এই দুইটিতে মাত্র তোমার অধিকার। এতদ্ভিন্ন যদি আরও কিছু তুমি আপনার বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, দত্তস্বত্ব প্রত্যাহরণ জন্য তোমার মহাপাতক হইবে।"

রাজা বলিলেন, "মহর্ষে, আমি পক্ষান্তে আপনাকে এই দক্ষিণার মুদ্রা দিব। কৃপা করিয়া দাসের প্রার্থনা পূর্ণ করুন।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "তাহাই হইবে। কিন্তু মহারাজ, আর একটি কথা। অদ্য হইতে সমস্ত পৃথিবীতে আমার অধিকার। দত্তধনে অধিকার রাখা ন্যায়ানুমোদিত নহে। তুমি অদ্য রজনীশেষের পূর্ব্বেই এই পৃথিবী হইতে স্থানান্তরে গমন করিও। পক্ষান্তে তোমার সঙ্গে দেখা করিব। আমার দক্ষিণার মুদ্রা সেই সময়ে যেন তোমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হই।" এই বলিয়া মহর্ষি ত্বরিতপদে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

রাজা ভাবিতে লাগিলেন, 'এ-কি হইল! কিরূপে আমি এক পক্ষের মধ্যে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করিব।'

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি অন্তঃপুরে মহিষীর নিকট আগমন করিলেন। মহিষী শৈব্যাদেবী রাজার শুষ্ক মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কাতরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাথ, আজ তোমার এইরূপ বৈকল্যের কারণ কি? তোমার ঐ সহাসসুন্দর মুখে হাসি নাই, পদ্মপলাশসন্নিভ অক্ষিযুগল বাষ্পসমাচ্ছন্ন—যেন কি দুর্দ্দৈব আসিয়া তোমার ঐ চিরপ্রফুল্ল মুখখানিকে বিমলিন করিয়া রাখিয়াছে।

নাথ, কেন তোমার আজ এমন বিষাদ-মলিন ভাব? তোমার এই বিষাদপূর্ণ মূর্ত্তিখানি দেখিয়া আমি ভবিষ্যৎ বিপৎকল্পনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি। অতএব দয়া করিয়া শীঘ্র ইহার কারণ বলিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর কর।"

হরিশ্চন্দ্র পত্নীর প্রেমপূত বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "রাণি, আজ আমার জীবনের নবীন দিন। কোশলের এই রাজ-সিংহাসন, কোশলের ধনাগার, কোশলের প্রজা আজ হইতে আর আমার নয়। অধিক কি, মা বসুমতীর আজ আমি ত্যক্তপুত্র। যে গৃহহীন, তাহার আশ্রয় বৃক্ষতলে; কিন্তু রাণি, আজ এই হতভাগ্য হরিশ্চন্দ্রের শোককাতর দেহভার বৃক্ষতলেও স্থান প্রাপ্ত হইবে না।"

রাণী শুনিয়া ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "নাথ, তুমি এ কি বলিতেছ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! তুমি যে কোশলের একচ্ছত্রী সম্রাট্—তোমার পতাকামূলে পৃথিবীর সমগ্র রাজা যে নিরস্ত্রে দণ্ডায়মান। আজ তোমার মুখে এ কি কথা শুনিতেছি? অথবা তুমি কি প্রকৃতিস্থ নও? নচেৎ যে-তুমি আমার নিকট আসিয়া কত প্রেমপূর্ণ কথায় জগতের সংবাদ বলিতে, রহস্যপুলকিত প্রাণে কত সোহাগগুঞ্জন করিতে করিতে যাহার প্রাণ এক স্বর্গীয় উন্মাদনায় অভিভূত হইয়া পড়িত, সেই আমার জীবিতনাথের মুখে এমন ঔদাস্যপূর্ণ অর্থহীন কথা কেন? মহারাজ, দাসীকে আর উদ্বেগের মধ্যে ফেলিয়া রাখিও না। কি এক অনিশ্চিত বিপৎকল্পনায় আমি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি, সত্বর বল কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছে? তুমি নিশ্চয়ই জানিও, যতই কেন বিপদ্ আসুক না, আমাদের এ প্রেমের মিলন ভাঙ্গিবে না। প্রেম ত পৃথিবীর জিনিষ নয়। সে যে পৃথিবীর বাহিরের কোনও গৌরবপূর্ণ স্থানের। অন্যোন্যনির্ভর দম্পতীর হৃদয়েই যে তাহার সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা। মহারাজ, এই অপূর্ব্ব প্রেম-জগতের রাজা তুমি—আর রাণী—আমি। সুতরাং পার্থিব সহস্র দুঃখ-দুর্দ্দশা

আমাদের প্রাণে ব্যথা দিতে পারিবে না। কেন তুমি তবে এত শুষ্ক মুখে আমার নিকট আসিয়াছ? তোমার ঐ প্রেম-পবিত্র মুখে যে হাসির আলোই ভালবাসি। নাথ, আজ কি দুরদৃষ্টক্রমে আমাকে ঐ মুখখানি অশ্রুকলঙ্কিত দেখিতে হইল? স্বামিন্, দয়া কর, সত্বর বল— কেন তুমি এত বিষন্ন হইয়াছ?"

হরিশ্চন্দ্র শুষ্কমুখে বিশ্বামিত্র-আশ্রমের তাবৎ ঘটনা বিবৃত করিলেন।

রাণী শৈব্যা শুনিয়া সহর্ষে বলিলেন, "মহারাজ, এজন্য এত চিন্তা ও বিষাদ কেন? রাজা তুমি, দান যে রাজার প্রাণ। তোমার এই অমানুষিক দানে যে কোশলের ছত্রদণ্ড গৌরবান্বিত হইয়াছে। নাথ, পার্থিব সুখ কত দিনের? তাহার জন্য প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন না করিয়া যে প্রকৃত দানবীরের মত দান করিয়াছ, এ ত কোশলরাজের উপযুক্ত কার্য্য। নরনাথ, এজন্য এত বিষাদ? কোশলেশ, দুঃখ ত্যাগ কর। দেখ, এই ধরণীতে সত্য সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। তুমি সত্য রক্ষা করিয়া যে রত্নকিরীট লাভ করিয়াছে—তাহা অমূল্য। ইহার জ্যোতিতে কোশলের রাজসিংহাসন চিরোজ্জ্বল থাকিবে। পার্থিব দারিদ্র্যের মধ্যেই যে শিবসুন্দরের বিকাশ। হে জ্ঞানবীর, কেন আজ তুমি এ কথা ভুলিতেছ?"

হরিশ্চন্দ্র নয়নের অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া বলিলেন, "শৈব্যা, এত জ্ঞান তোমার? অন্ধকারে পতিত স্বামীর পার্শ্বে আলোকবর্ত্তিকা লইয়া সহাসসুন্দর আননে যে শোভা বিকীর্ণ করিতেছে, দেবি, আমি এত দিন তাহা দেখিতে পাই নাই। হৃদয়কে শুদ্ধ কামনার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে পরিণত করিয়া বসিয়া ছিলাম। আজ মহিমময়ী তুমি তাহার অবরোধ ভাঙ্গিয়া দিয়া উন্মুক্ত আকাশের বিশালতার সহিত তাহাকে মিলিত করিয়া দিয়াছ। দেবি, আজ পৃথিবীর বাহিরে আসিয়া যে নবীন শিক্ষা পাইলাম, ইহা আমার চিরজীবন স্মরণ

থাকিবে। রাণি, আর আমি রাজ্য দান করিয়া দুঃখিত নই। আমি এখন বেশ বুঝিয়াছি, ক্ষুদ্র পৃথিবী দান করিয়া অপ্রমেয় বিশ্বরূপের বিশাল বিশ্ব পাইয়াছি। রাণি, আমি আর দরিদ্র নহি। আজ বিশ্বরাজের রত্নকোষ আমার করতলগত।"

রাণী বলিলেন, "সত্যই ত মহারাজ, তুমি যে দাতা, তুমি ত গৃহীতা নও। ভগবানের দান অনন্ত হওয়াতেই তিনি পূর্ণরূপ। নাথ, অল্পবুদ্ধি নারী আমি। তোমাকে আমি কি বুঝাইব? ত্যাগেই মানুষ ধন্য। এই মায়ার পৃথিবীতে মানুষ যেদিন কর্ত্তব্যের নিকট আত্মবিলোপ করিয়া দিতে পারে সেই দিনেই সে সার্থক। নাথ, তুমি আজ সেই জন্যই ধন্য হইয়াছ। দুঃখ পরিত্যাগ কর। একবার দেখ, চিন্ময়ী বিশ্বজননীব স্নেহক্রোড় তোমার জন্যই শূন্য রহিয়াছে।"

রাজার বিষাদকাতর মুখখানি সৌভাগ্যগর্ব্বে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

রাজা বলিলেন, "শৈব্যা, আমি মহর্ষিকে পৃথিবী দান করিয়াছি। সুতরাং এ পৃথিবীতে থাকিতে আর আমার অধিকার নাই। আমি এই পৃথিবীর বাহিরে যাইব। আমার ইচ্ছা, তুমি রোহিতাশ্বকে লইয়া তোমার পিতৃগৃহে গমন কর।"

শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রের কথা শুনিয়া ব্যগ্রহৃদয়ে বলিলেন, "নাথ. আমাকে এইরূপ অন্যায় আদেশ করিও না। প্রাচীন মুনিগণ স্ত্রীর অন্যতম নাম 'সহধর্ম্মিণী' নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুখ বা দুঃখে মানুষ যে অবস্থায় পতিত হউক, স্ত্রী সেই অবস্থাতেই স্বামীর সহচারিণী। নাথ, স্বামীর সহিত স্ত্রীর ইহাই বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট পবিত্র সম্বন্ধ। তুমি রাজা ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া কেন তবে স্ত্রীর উপর এরূপ অন্যায় আদেশ করিতেছ। তুমি আমাকে পিতৃগৃহে যাইবার জন্য বলিতেছ, কিন্তু তাহা রক্ষা করা আমার উচিত নহে। তোমার সঙ্গে ছায়ার মত গমন করাই আমার কর্ত্তব্য। সুতরাং তুমি যেখানে যাইবে আমিও

তোমার পার্শ্বচারিণী হইয়া তথায় যাইব। ইহা স্ত্রীর কর্ত্তব্য, অতএব তোমার কোন কথাই আমাকে এই কর্ত্তব্যের পথ হইতে বিচ্যুত করিতে সমর্থ হইবে না।"

তখন হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, "শৈব্যা, আর আমি তোমাকে পিতৃগৃহে যাইবার জন্য বলিব না। আমি পৃথিবী দান করিয়া তোমাকে পাইয়াছি। এত দিন ঐশ্বর্য্যে বিলাসকলার মধ্যে আমি তোমাকে লালসার ক্রীড়নক বলিয়া ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু আজ এই দীনতার মধ্যে তোমার নির্ব্বাণগাম্ভীর্য্যময়ী পবিত্রমূর্ত্তি দেখিয়া আমি আশ্বস্ত হইয়াছি। দেবি, দেখিতেছি, হতভাগ্য আশ্রয়হীনের পার্শ্বে মমতাময়ী মূর্ত্তিতে তুমি অমঙ্গল দূর করিতে স্নেহহস্ত প্রসারিত করিয়া আছ।"

রাণী বলিলেন, "মহারাজ, ঠিক বলিয়াছ। স্ত্রী স্বামীর বিলাসের জন্য নয়। স্ত্রী স্বামীর জীবনতরণীর দিগ্‌দর্শন-শলাকা। স্ত্রীই পথহারা স্বামীর ধ্রুবতারা। আবার স্ত্রী বিপৎপতিত স্বামীর পক্ষে মূর্ত্তিমতী সান্ত্বনা। তোমার বিপদকে বক্ষ পাতিয়া গ্রহণ করিতে আমি এই তোমার অগ্রবর্ত্তিনী হইলাম।"

এই বলিয়া শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রের হস্ত ধারণ করিলেন। রাজা বলিলেন, "আমি অদ্যই রাজধানী ত্যাগ করিব। সুতরাং প্রস্তুত হও। রাণি, তোমাকে আর একটি কথা এখনও বলি নাই। আমি মহর্ষিকে দক্ষিণাস্বরূপে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি কিন্তু তৎপূর্ব্বেই আমি আমার সর্ব্বস্ব ও সসাগরা ধরণী তাঁহাকে দান করিয়াছিলাম; সুতরাং রাজকোষসংগৃহীত অর্থদ্বারা সেই দক্ষিণা দান করিতে আমার অধিকার ছিল না। এই জন্য আমি মহর্ষির নিকট একপক্ষ সময় লইয়াছি। রাণি, পক্ষান্তে আমি কিরূপে মহর্ষির সেই দক্ষিণার অর্থ দান করিব ভাবিয়া পাইতেছি না!"

রাণী বলিলেন, "মহারাজ, এখন সে চিন্তার আর সময় নাই। চল আমরা অদ্যই রাজধানী ত্যাগ করিব।"

রাজা বলিলেন, "দেবি, অদ্য আমরা বারাণসী যাত্রা করিব। বারাণসী শিবের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত সুতরাং তাহা পৃথিবীর অন্তর্গত নয়। চল রাণি, আমরা তথায় গিয়া বাবা বিশ্বেশ্বর ও মা অন্নপূর্ণার চরণে ভক্তিপূত পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া কৃতার্থ হইব।"

এদিকে অযোধ্যার প্রজাগণ রাজার এই পৃথিবী দানের সংবাদ শ্রবণে অতীব দুঃখিত হইয়া উঠিল। মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিগণের সমক্ষে মূর্ত্তিমান্ ক্রোধের মত বিশ্বামিত্র ঋষি রাজার প্রতি যেরূপ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সসাগরা ধরণীর একচ্ছত্রী সম্রাট্ কিরূপ বিনয়পূর্ণ বাক্যে মহর্ষির কৃপাভিক্ষা করিয়াছিলেন, অযোধ্যাবাসীর এখন তাহাই আলোচ্য হইল। সকলেই স্থির করিল, রাজার সহিত তাহারাও অযোধ্যা ত্যাগ করিবে।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সূর্য্যদেব কুলপ্রদীপ হরিশ্চন্দ্রকে আজ বিশ্বামিত্রকর্ত্তৃক নির্য্যাতিত দেখিয়া যেন রোষে রক্তবর্ণ হইয়া চক্রবাল-প্রান্তে বিলীন হইলেন। পক্ষিকুল যেন রাজার দুঃখে কলরব করিতে লাগিল। দেবমন্দিরে সান্ধ্য আরতির বাদ্যরব যেন বিষাদপূর্ণ বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। রাজা ও রাণী ভগ্নহৃদয়ে দেবতার চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া আসিলেন।

৭

নীরব নিস্তব্ধ নিশীথিনী। প্রাণিকুল নিরাতঙ্কে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে। আকাশমণ্ডলে অল্প অল্প মেঘের সঞ্চার হওয়াতে রজনীর অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। মনে হইতেছিল—নিশারাণী যেন রাজা ও রাণীর দুঃখে কৃষ্ণবস্ত্রে আপনার মুখ ঢাকিয়াছেন। সমস্ত পৃথিবী স্থির। খণ্ডমেঘাবৃত নৈশ গগনে দুই একটি নক্ষত্রের ক্ষীণ কিরণ দেখা যাইতেছে। বিনিদ্র রাজা এমন সময় রাণী ও কুমার

রোহিতাশ্বকে লইয়া রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মন্ত্রী, অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী ও অযোধ্যার বহু প্রজা রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সকলে রাজপুরী অতিক্রম করিয়া প্রান্তরে আসিয়া পড়িলেন। রাজা হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস দমন করিয়া রোরুদ্যমান প্রজাগণকে বলিলেন, "তোমরা এবার গৃহে গমন কর। আর আমার সঙ্গে আসিও না। এই শোককরুণ পবিত্র দৃশ্য হয়ত মহর্ষির অসহ্য হইবে। আমি তোমাদের ভবিষ্যৎ ও অযোধ্যার রাজসিংহাসনের অবস্থা ভাবিয়া অস্থির হইয়াছি। মন্ত্রিন্, শান্ত হও। আমার সঙ্গে আসিতে তোমাদের আর অধিকার নাই। তুমি কোশলরাজসিংহাসনের দক্ষিণ স্তম্ভ। আশা করি, ইহা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিবে।"

মন্ত্রী ও অযোধ্যার প্রজাগণ কাঁদিয়া আকুল। সকলেই বলিয়া উঠিল—"যে-রাজ্যে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র নাই—সে-রাজ্য শ্মশানসদৃশ। মহারাজ, তোমার মত রাজা ছাড়িয়া আমরা কিরূপে তথায় থাকিব? কোশলের রাজসিংহাসন তোমার মত আদর্শ রাজার পুণ্য চরণরেণু-সম্পাতে পবিত্র হইয়াছে।"

রাজা অনেক বুঝাইয়া মন্ত্রী ও প্রজাগণকে বিদায় দান করিলেন। এমন সময়ে আকাশে মেঘ ঘনাইয়া আসিল। ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রকৃতিসুন্দরী যেন রাজার দুঃখে নেত্রসলিল বর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্ত আকাশ যেন বজ্ররবে নিষ্ঠুর বিশ্বামিত্রের সর্ব্বনাশ কামনা করিতে লাগিল।

হরিশ্চন্দ্র কুমার রোহিতাশ্বকে বক্ষে স্থাপন করিয়া রাণীর সহিত সেই ভয়ানক বৃষ্টিতে এক বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইলেন। হায়, যে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের শিরোদেশ শত শত রাজন্যপরিধৃত রাজচ্ছত্রে সুশোভিত থাকিত, তিনি আজ প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ বৃক্ষতলে নগ্নপদে বৃষ্টিতে অভিষিক্ত হইতেছেন! যে রাজরাণী রাজপুরীতে শত

দাসদাসীপরিবৃতা থাকিয়া ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের মধ্যে সদ্যপ্রস্ফুটিত কমলিনীর ন্যায় শোভা পাইতেন, তিনি আজ প্রান্তরমধ্যস্থ বৃক্ষতলে সিক্তবসনে কম্পিতা! যে রাজকুমার রাজারাণীর আদরের ধন, সূর্য্যবংশের গৌরবচূড়া, তিনি আজ মাতাপিতার পরিহিত বস্ত্রাংশে বৃষ্টি হইতে দেহরক্ষা করিতেছেন! চিরপবিত্র অযোধ্যার রাজসিংহাসন যে এই মহনীয় অবদানেই চিরগৌরবান্বিত।

ক্রমে বৃষ্টি বন্ধ হইল। আকাশের গায় দুই একটা নক্ষত্রের সহিত শুক্রতারা দেখা দিল। রাজা-রাণী পূর্ব্বাকাশে চাহিয়া দেখিলেন, ঊষার কনক কিরণ পৃথিবীর অন্ধকার দূর করিবার জন্য আসিতেছে কিন্তু তাঁহার সম্মুখে যে ভীষণ তিমিরময় রাজ্য! রাজা ও রাণী প্রাণাধিক রোহিতাশ্বকে ক্রোড়ে করিয়া বৃক্ষতল হইতে প্রান্তরমধ্যস্থ পথ অবলম্বন করিলেন।

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন অনবরত চলিয়া তাঁহারা বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। বরণা ও অসি নাম্নী দুই নদীর সঙ্গমস্থলে হিন্দুর প্রধান তীর্থ বারাণসী অবস্থিত। হরিশ্চন্দ্র বরণার তীরে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, তীরস্থ মন্দির ও বিপুলকায় সৌধরাজির ছায়া বরণার জলে পতিত হইয়া তরঙ্গের তালে তালে নাচিতেছে। কত মুমুক্ষু যোগী, ঋষি, গৃহী পাষাণ-সোপানে বসিয়া বরণার লহরীলীলা দেখিতেছেন। হরিশ্চন্দ্র বরণাতীরের মাধুর্য্য ও শস্পসমাচ্ছন্ন শ্যামল প্রান্তরের শোভা দেখিয়া পুলকিত হইলেন। বরণার শীকরসম্পৃক্ত বায়ু তাঁহাদের ক্লান্তি দূর করিতে লাগিল।

হরিশ্চন্দ্র, রাণী শৈব্যা, বারাণসীর অপূর্ব্ব শোভা, জনবহুল রাজপথ ও মুমুক্ষু নরনারীর ভক্তিপূত পবিত্রমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইলেন। আর রাজকুমার রোহিতাশ্ব মাতাপিতার ক্রোড়দেশে শায়িত হইয়া নবীন প্রদেশের নবীন দৃশ্যে কৌতূহলী হইয়া রহিলেন।

ক্রমে তাঁহারা মণিকর্ণিকার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানটি তাঁহাদের বড় মনোরম বোধ হইল। রাজা হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, "শৈব্যা, দেখ বরণার কি সুন্দর লহরীলীলা! মণিকর্ণিকায় কত লোক-সমাগম! কি সুন্দর প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাট। আমার ইচ্ছা, আমাদিগকে আর যে কয় দিন পৃথিবীতে থাকিতে হইবে, সে কয় দিন এই মণিকর্ণিকা ঘাটের এক প্রান্তেই অবস্থান করি। দেখ শৈব্যা, এই ঘাটে কত সন্ন্যাসী বাস করিতেছেন। এস, আমরাও একাংশে স্থান করিয়া লই।"

রাণী সেই সন্ন্যাসিসঙ্কুল মণিকর্ণিকা ঘাটের এক প্রান্তের ধূলিকঙ্কর নিজের বস্ত্রপ্রান্ত দিয়া পরিষ্কার করতঃ রাজা ও রাজপুত্রকে বসাইলেন। আপনিও অদূরে বসিয়া জনকোলাহলের ভিতর আপনাদের ভবিষ্যৎ ভাবিতে লাগিলেন। সেই নির্ব্বান্ধব অপরিচিত স্থলে অতীত জীবনের যত কথা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলেন, কোথায় অযোধ্যার রাজসিংহাসন, আর কোথায় আজ মণিকর্ণিকার ভূশয়ন! হায়রে দগ্ধ বিধি, তোমার মনে কি এই ছিল? রাণী শোকে আত্মহারা। তিনি আজ জগৎ অন্ধকার দেখিতেছেন। নেত্রসম্মুখে দুরদৃষ্টের অন্ধকার এমন ঘনীভূত হইয়াছে যে, তিনি স্নানার্থী অগণ্য নরনারীকে দেখিতে পাইতেছেন না। হায়, চিন্তাপরায়ণা যোগিনী সেই জনবহুল মণিকর্ণিকা ঘাটে ভাবিতেছেন—যেন এই পৃথিবীতে আর জনপ্রাণী নাই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শৈব্যার নেত্রপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল।

হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার নেত্রনীর দেখিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "শৈব্যা, তুমি কাঁদিতেছ?" শৈব্যা বলিলেন, "না কাঁদি নাই—কিন্তু নাথ, অশ্রুজলই যে এখন আমাদের একমাত্র সহায়! মহারাজ, অযোধ্যার রাজসিংহাসনে উপবেশন করিতে তোমার কত কষ্ট বোধ হইত, সে-ই তুমি আজ ধূলিশয়নে! যে রাজকুমারের

অন্তঃপুরে কুসুমকোমল শয়নে নিদ্রা হইত না, সেই রাজকুমার আজ উন্মুক্ত জনকোলাহলমুখরিত পাষাণ-ঘাটে শায়িত! মহারাজ, আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, এ-দৃশ্য আর আমি দেখিতে পারি না।”

তখন হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, “রাণি, দুঃখ পরিত্যাগ কর। এই জগতে সুখ বা দুঃখ বলিয়া কিছু নাই। যাহাকে আমরা সুখ বলিয়া মনে করি, হয়ত তাহা সুখ নয়—আর আমরা যাহাকে দুঃখ মনে করিয়া আতঙ্কিত হই, হয়ত তাহাই সুখ। লীলাময়ের রাজ্যে এই প্রহেলিকা সকলে বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না। রাণি, সুখ দুঃখ উভয়ের মধ্যেই ভগবানের সত্যশুভ আজ্ঞা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। পৃথিবীতে মানুষ যে-দিন এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে—

কার্য্যগত সুখ-দুঃখ ভ্রমেও না মনে লয়
প্রাপ্তফল ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছা সমুদয়,
আত্মগত বিশ্বরূপ বিশ্বময় প্রেমাভাস
যে-দিন দেখিবে দেবি, পূর্ণ হবে মন-আশ।

প্রিয়তমে, ভ্রমান্ধ-তিমিরে আমরা ইহা দেখিতে পাই না বলিয়াই ত অন্ধকারের ভীষণতা উপলব্ধি করি। যে-দিন হৃদয়ের মধ্যে আত্ম-জ্ঞান জাগিয়া উঠিবে, যে-দিন আত্মজ্ঞান বিশ্বজ্ঞানে পরিণত হইবে, দেখিবে, সে-দিন আর কোন জ্বালা নাই—এ-সংসারে চারিদিকে কেবল সুখ-শান্তির খেলা—চারিদিকেই আমোদ ও প্রমোদের মেলা। রাণি, দুঃখ পরিত্যাগ কর। সকল অবস্থাতেই কর্ত্তব্যকে মনে রাখিবে। অবস্থার নিয়ামক মানুষ নয়—ভগবান্, এই ভাবটি মনে দৃঢ় রাখিবে। আমাদের এই যে রক্তমাংসের শরীর, ইহার পরি-চর্য্যায় আত্মার তৃপ্তি নাই; আত্মার তৃপ্তি কর্ত্তব্যের পথে। যে ভাগ্য-বান্ সেই পথে চলিতে পারিয়াছেন, তিনিই এই সংসারে প্রকৃত পথ

চিনিয়াছেন,—তাঁহাকে বিপথে পড়িয়া আর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। চল রাণি, তোমাকে এই কথাটি একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিই।"

এই বলিয়া রাজা মণিকর্ণিকার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ শ্মশানঘাটের দিকে অগ্রসর হইলেন। শৈব্যা নিদ্রিত রোহিতাশ্বকে বক্ষে স্থাপন করিয়া রাজার পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন।

ক্রমে তাঁহারা শ্মশানঘাটের অনতিদূরে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য শ্মশানশিবের মন্দিরচত্বরে উপবেশন করিলেন। রাজা প্রজ্বলিত চিতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "রাণি, পার্থিব দেহের পরিণাম দেখিতেছ ত? ঐ প্রজ্বলিতচিতাগ্নিগর্ভস্থ দেহ পার্থিব মায়ায় সামান্য যন্ত্রণায় আকুল হইয়া উঠিত, কিন্তু আজ চিতানলের মধ্যেও যেন শান্তি পাইয়াছে।" রাণী ভাবিলেন, আহা শ্মশান কি পবিত্র স্থান! ইহা যে পৃথিবীর কোলাহল হইতে শান্তিমন্দিরের প্রবেশপথ। রাণী শৈব্যা শ্মশানভূমিশায়িত ও চিতাগ্নিমধ্যস্থ মৃতদেহ দেখিয়া সংসারের অনিত্যতা, মায়ার বন্ধন, মানবের বৃথা অহঙ্কার সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। রাজা বলিলেন, "রাণি, অদূরে যে শবগুলি দেখিতেছে, ইহাদের পার্থিব জীবন কত বিড়ম্বনায় কাটিয়াছে। সামান্য দুঃখে তাহারা কত অভিভূত হইয়া উঠিত, কিন্তু আজ দেখ, ধূলিশয়নে ইহারা কেমন নির্ব্বিকার! না আছে দুঃখ—না আছে বিষাদ—না আছে কর্ম্মের চাঞ্চল্য! শান্তিময়ের ক্রোড়ে অনন্ত নিদ্রায় তাহারা সমস্ত দুঃখ ভুলিয়াছে। দেবি, এই সংসারে মানুষকে এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝিয়া চলিতে হইবে। ভ্রমান্ধ, আমরা ইহা বুঝিতে পারি না বলিয়াই যন্ত্রণায় আকুল হই।" রাণী বলিলেন, "নাথ, বুঝিয়াছি আমি, জীবনের পরিণাম। চল আমরা ভগবান্ বিশ্বেশ্বর ও ভগবতী অন্নপূর্ণা দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আসি।"

এইরূপে রাজারাণী দিবাভাগে নানা দেবমন্দির দর্শন করিয়া এবং রজনীযোগে মণিকর্ণিকার ঘাটে বসিয়া বিনিদ্র নয়নে আপনাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দশ দিবস অতিক্রান্ত হইল।

৮

পক্ষান্তের শেষ দিন! রাজা হরিশ্চন্দ্র মণিকর্ণিকার ঘাটে বসিয়া স্বীয় প্রতিশ্রুতির কথা ভাবিতেছেন। রজনীশেষের সঙ্গে সঙ্গে ঋষির কোপে অযোধ্যার রাজবংশের পরিণাম কি হইবে তাহাই তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। এইরূপ চিন্তায় তিনি আকুল হইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, পূর্ব্বাকাশ লোহিত বর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। রাজা মনে করিলেন যেন ঋষিবরের রুদ্ধ রোষ তাঁহাকে এবং তৎসহ অযোধ্যার রাজবংশকে ভস্মীভূত করিবার জন্যই আসিতেছে। রাজা এইরূপ চিন্তায় আকুল—এমন সময়ে শৈব্যা রাজার বিষাদকাতর ভাব অনুভব করিয়া বলিলেন, "নাথ, মঙ্গলময়ের রাজ্যে সত্যের পরাজয় হইবে না। তুমি যে সত্যের পথে চিরবিচরণশীল। মা জগজ্জননী সত্যপথাশ্রয়ীকে স্নেহক্রোড়ে ধারণ করিয়া আছেন। নাথ, তুমি সকলই বোঝ, তবে কেন এত কাতর হইতেছ? দুঃখ পরিত্যাগ কর। কে বলিবে, তোমার তাদৃশ অবদানে কল্যাণের বীজ আরোপিত নাই।"

রাজা ভগ্নস্বরে বলিলেন, "দেবি, জানি আমি সব, কিন্তু আজ যে আমি ভবিষ্যৎ বিপদ্ কল্পনায় স্থির থাকিতে পারিতেছি না। কোথায় অযোধ্যার রাজ-সিংহাসন আর কোথায় মণিকর্ণিকার ধূলিশয়ন; কোথায় রাজৈশ্বর্য্য, আর কোথায় অনশনের যন্ত্রণা; কোথায় শত দাসদাসীর ব্যস্ত পরিচর্য্যা, আর কোথায় নির্ব্বান্ধবতার অশান্ত অভ্যর্থনা; কোথায় বিপন্ন প্রজার দুঃখ দূরীকরণের জন্য রাজকোষের

নির্ম্মুক্ততা, আর কোথায় এ হতভাগ্যের ঋণ-ভার ! শৈব্যা, এ সংসারে ঋণদায় কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক। ঋণী যে, তার ভিতরে দারুণ অশান্তি, বাহিরে অসহ্য লোকগঞ্জনা। আজ এই পথপার্শ্বে সুপ্ত, চিন্তালেশশূন্য ভারবাহককে দেখিয়া আমা হইতে উহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইতেছে। রাণি, আজ আবার রজনীশেষের সঙ্গে সঙ্গে দারুণ ঋষি-কোপ মনে উদয় হইতেছে। যখন সেই ভ্রুকুটিভীষণ ঋষির অগ্নিমূর্ত্তি মনে পড়ে তখন যে আমার আর ধৈর্য্যের বাঁধ থাকে না।”

হরিশ্চন্দ্র বিকল হইলেন। শৈব্যা স্বামীর অশ্রুজলে নিজের অশ্রুজল মিশাইয়া দিলেন—বরণার পাষাণসোপানে যেন অশ্রু-জলের উৎস উথলিয়া উঠিল।

ক্রমে রজনীশেষের লক্ষণ দেখা গেল। ঊষার আলোকে পৃথিবীতে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। পক্ষিকুল বৃক্ষশাখায় বসিয়া গান করিতে লাগিল। সুস্নিগ্ধ প্রভাত-সমীর সুষুপ্ত প্রাণীর শরীরে নূতন বলের সঞ্চার করিয়া দিল। পূর্ব্বাকাশ অরুণচ্ছবি ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে পৃথিবীতে কর্ম্মের গান শুনাইতে লাগিল। শৈব্যা ঊষার শীতলতায় একটু নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র কত কথা ভাবিতেছেন—সহসা পূর্ব্বাকাশে নবোদিত অরুণমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া আকুল হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন, “ভগবান্ সবিতৃদেব, হতভাগ্য সন্তানের প্রণাম গ্রহণ কর। আজ তুমি এরূপ রক্তনেত্র কেন ? তুমি পৃথিবীতে আনন্দের কিরণ লইয়া আইস, তোমার পবিত্রসুন্দর মোহনমূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণিগণ যুগ্মকরে তোমার মধুর স্তোত্র পাঠ করে ; কিন্তু দেব, আজ তোমাকে এইরূপ বীভৎসমূর্ত্তিতে দেখিতেছি কেন ? তুমিও কি হতভাগ্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া এরূপ রক্তনেত্র হইয়াছ ? তা হবেই ত। হতভাগ্যের উপর জগতে কে কখন্ সন্তুষ্ট থাকে ?” এইরূপ চিন্তায় মুহ্যমান হইয়া হরিশ্চন্দ্র পাষাণের উপর পড়িয়া গেলেন। বিনিদ্র রজনীর শ্লেষে

ঊষার স্নিগ্ধ স্পর্শে হরিশ্চন্দ্রের শোকতপ্ত প্রাণ যেন অধিকতর অবসন্ন হইয়া পড়িল। হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন, ঋষির ক্রোধাগ্নিতে যেন সমস্ত বিশ্বসংসার পুড়িয়া গিয়াছে, চারিদিকেই আগুন! কোথাও পলাইবার উপায় নাই। প্রাণপুত্তলি রোহিতাশ্ব, প্রাণাধিকা শৈব্যা সব ভস্মসাৎ হইয়াছে—যেন তিনি আজ একা নিজের কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য সেই বিশ্বগ্রাসী অগ্নিরাশির মধ্যে দগ্ধ হইতেছেন। এইরূপ যন্ত্রণায় তিনি বিভ্রান্তমস্তিষ্ক হইয়া সহসা জাগিয়া দেখিলেন—বিশ্বামিত্র ঋষি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিতেছেন, "দাও মহারাজ, আমার দক্ষিণা। রজনীশেষের সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রার্থিত এক পক্ষ সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। আজ ষোড়শ দিবস।"

হরিশ্চন্দ্র কাতরহৃদয়ে মহর্ষির চরণে প্রণাম করিলেন। রাণী শৈব্যা সচেতন হইয়া মহর্ষিকে অভিবাদন করতঃ ঋষির পদ-ধূলি গ্রহণ করিয়া নিদ্রিত কুমারের মস্তকে স্পর্শ করাইলেন।

বিশ্বামিত্র রাজার মৌনভাব দেখিয়া বলিলেন, "হরিশ্চন্দ্র আমার দক্ষিণা দাও! এখনও বিলম্ব করিতেছ কেন?" হরিশ্চন্দ্র তথাপি নিরুত্তর। তখন বিশ্বামিত্র সরোষে বলিয়া উঠিলেন, "রাজন্, এই কি তোমার কর্ত্তব্য? আমার সঙ্গে চাতুরী করিতেছ? যদি দক্ষিণার মুদ্রা প্রদান করা তোমার অনভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বে বলিলেই হইত! কেন তুমি এতদিন ধরিয়া আমাকে বিড়ম্বিত করিতেছ? যাহা হউক এখন আমি জানিতে চাই, তুমি আজ আমাকে দক্ষিণার মুদ্রা দিবে কি না?" হরিশ্চন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "ভগবন্, আমি দক্ষিণার মুদ্রার এখনও কোন উপায় করিতে পারি নাই। অনুগ্রহপূর্ব্বক আর এক পক্ষ অপেক্ষা করুন।" বিশ্বামিত্র এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "না, আর একদিনও সময় না। আজ আমার মুদ্রা চাই-ই। আজ যদি দক্ষিণার মুদ্রা না দাও, তবে জানিবে, অদ্য সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্রোধাগ্নিতে সূর্য্যবংশের অস্তিত্ব

পর্য্যন্ত থাকিবে না। রাজন্, আবার বলি, আজ আমার দক্ষিণা চাই-ই।”

হরিশ্চন্দ্র ঋষিবরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার ক্রোধরক্ত দেহ কম্পিত ও অগ্নিবর্ষী নেত্রদ্বয় বিঘূর্ণিত হইতেছে। হরিশ্চন্দ্র অস্থির হইয়া বলিলেন, “ঋষিবর, আমি যে নিঃসম্বল। দক্ষিণার মুদ্রা প্রদান করি আমার এমন কোনও সঙ্গতি নাই। ভিক্ষা—সে ত ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নয়। কোথাও চাকরী স্বীকার করি—কিন্তু এই বারাণসীতে ত তাহার সুবিধা নাই।” শুনিয়া বিশ্বামিত্র বলিয়া উঠিলেন, “তাহা হইলে বুঝিতেছি, দক্ষিণার মুদ্রা প্রদান করা তোমার সাধ্যাতীত। তবে তুমি কেন আমাকে এতদিন অপেক্ষা করিতে বলিলে? কেন তুমি আমাকে আশা দিয়া এই সুদীর্ঘ সময় আমার তপঃ-সাধনায় বাধা দিয়াছ? আমি চলিলাম।” এই বলিয়া বিশ্বামিত্র ঋষি তথা হইতে কয়েক পদ অগ্রসর হইলে রাণী শৈব্যা কুপিত ঋষির চরণদ্বয় ধরিয়া পড়িলেন। শৈব্যা বলিলেন, “দেব, অভাবে মতির স্থিরতা থাকে না—ইহা জীবের ধর্ম্ম, বিশ্বরাজ্যে ইহা মানুষের চিত্তের সহিত যেন মিশিয়া গিয়াছে। আপনারা অন্তর্য্যামী। কৃপাপূর্ব্বক মহারাজের হৃদয়ের অবস্থা অনুভব করিয়া স্থিরচিত্ত হউন। উপায়ান্তরহীন হইয়া ইনি দক্ষিণার মুদ্রা প্রদান করিতে পারেন নাই। দয়া করিয়া আপনি দক্ষিণার মুদ্রা প্রদানের উপায় বলিয়া দিন্।”

বিশ্বামিত্র, রাণী শৈব্যার এই বিনয়পূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “কি করিব! দক্ষিণার মুদ্রা না পাইলে আমার সঙ্কল্পিত বাসনা পূর্ণ হইবে না। তজ্জন্যই এত দিন অপেক্ষা করিয়া আছি। দেখ, মানুষ এই পৃথিবীতে নিঃসম্বল কখনই নয়। সদাচার, পরোপকার প্রভৃতি মানবের আত্মার সম্বল। আর এই পার্থিব জীবনের সম্বল তাহার দেহ। এখন তোমাদের স্বীকৃত দক্ষিণার মুদ্রা প্রদানের উপায় বুঝিয়াছ?”

শৈব্যা ভাবিলেন—তাই ত এতদিন আমরা ইহা বুঝিতে পারি নাই। ইহা ভাবিয়া শৈব্যা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মহারাজ, বুঝিয়াছ দক্ষিণার মুদ্রা প্রদানের উপায়? তুমি আমাকে বিক্রয় করিয়া মহর্ষির দক্ষিণা প্রদান কর।"

হরিশ্চন্দ্র পত্নীর মুখে এই কথা শুনিয়া আকুল প্রাণে বলিলেন, "রাণি, তুমি এ কি কথা বলিতেছ? যদি ঋষির কোপে ভস্মসাৎ হইতে হয়—সে-ও আমার পক্ষে মঙ্গল। তথাপি আমি এই ঘৃণ্য কার্য্য করিতে সমর্থ হইব না।" শুনিয়া বিশ্বামিত্রের ক্রোধাগ্নিশিখা যেন আরও বাড়িয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র সিংহগর্জ্জনে বলিলেন, "রাজন্, এই কি তোমার ভদ্রতা? দক্ষিণার মুদ্রা প্রদান করিব বলিয়া এখন প্রকারান্তরে তাহার প্রত্যাহার করিতেছ? আচ্ছা, আর আমি তোমার নিকট মুদ্রা চাহিব না।" এই বলিয়া ঋষি অভিশাপ দিবার জন্য জলগণ্ডূষ ধারণ করিলেন।

শৈব্যা বিশ্বামিত্রের ক্রোধ ও জলগণ্ডূষধারণ দেখিয়া ছিন্নলতার ন্যায় ঋষিবরের চরণে নিপতিত হইয়া করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র শৈব্যার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "তোমার বিনয়ব্যবহার ও দীনতা মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের অশিষ্টতা উপশমিত করিয়া আমাকে প্রীত করিয়াছে। যাহাই হউক যদি তুমি হরিশ্চন্দ্রের সহধর্ম্মিণী ও অর্দ্ধাঙ্গিনী হও, তাহা হইলে স্বামীর বিপদে তুমি তোমার ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য রক্ষা কর।"

শৈব্যা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। ঋষির কথায় তাঁহার জ্ঞান হইল। ভাবিলেন; আমি যে মহারাজের সহধর্ম্মিণী—অর্দ্ধাঙ্গিনী, সুতরাং মহারাজের দক্ষিণা প্রদানের অঙ্গীকার, আমারও প্রতিশ্রুতি। এই ভাবিয়া শৈব্যা তাঁহাকে বিক্রয় করিয়া ঋষির দক্ষিণার মুদ্রা প্রদানের জন্য রাজা হরিশ্চন্দ্রকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার সেই মর্ম্মভেদিনী কথা শুনিয়া ও ঋষিবরের ক্রোধ

দেখিয়া ভাবিতে ভাবিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শৈব্যা উচ্চৈঃ-স্বরে রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "ঋষিবর, আমার জীবনদেবতা যে আমাকে অনাথা করিয়া চলিয়া গেলেন, আর আমার এ ঘৃণ্য প্রাণে প্রয়োজন কি? আমি আপনার পুণ্য চরণ দর্শন করিতে করিতে বরণার জলে আত্মবিসর্জ্জন করি। আমার প্রাণের রোহিতকে আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিতেছি। দয়া করিয়া দীনা তনয়ার অন্তিম প্রার্থনা পূর্ণ করুন।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "শৈব্যা, সকল বিষয়ে অদৃষ্টই বলবান্। দুঃখ ত্যাগ কর। তোমার স্বামী মূর্চ্ছিতমাত্র। ক্ষণপরেই মূর্চ্ছা অপগত হইবে, তোমার কর্ত্তব্য সাধনের এই উপযুক্ত অবসর।"

স্বামী মূর্চ্ছিত অবগত হইয়া শৈব্যা অপেক্ষাকৃত শান্ত হইলেন, এবং মহর্ষির চরণে প্রণিপাত করিয়া নিকটস্থ দাসবিক্রয়স্থানে গিয়া উপবেশন করিলেন।

সেই দাস-বিক্রয়স্থানে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দাসী ক্রয় করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। শৈব্যা তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "হে মহাশয়, আপনার কি দাসীর প্রয়োজন আছে?" বৃদ্ধ বলিল, "হাঁ গো, আমি একটি দাসীর অনুসন্ধান করিতেছি।" শৈব্যা বলিলেন, "অনুগ্রহ করিয়া তবে আমাকে ক্রয় করুন।" বৃদ্ধ বলিল, "তোমার বিক্রেতা কে?" শৈব্যা বলিলেন, "আমার স্বামী সহস্র মুদ্রার ঋণী। দয়া করিয়া সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে আমাকে ক্রয় করুন। বৃদ্ধ বলিল, "তত মুদ্রা আমার নাই। আমি পাঁচ শত মুদ্রা দিতে পারি। যদি স্বীকৃতা হও তাহা হইলে এই পাঁচ শত মুদ্রা গ্রহণ কর।"

রাণী শৈব্যা সেই পাঁচ শত মুদ্রা বিশ্বামিত্রকে প্রদান করিয়া বলিলেন, "ঋষিবর, আমি আত্মবিক্রয় দ্বারা এই পাঁচ শত মুদ্রা সংগ্রহ করিলাম, গ্রহণ করুন।" বিশ্বামিত্র সেই মুদ্রা গ্রহণ করিলে শৈব্যা বলিলেন, "মুনিবর, দাসীত্ব গ্রহণের পূর্ব্বে আমি একবার

মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিতে চাই।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "হরিশ্চন্দ্রের এখনও মূর্চ্ছার শান্তি হয় নাই। তুমি ব্রাহ্মণের গৃহে গমন কর। তাঁহার মূর্চ্ছাপগত হইলে আমি এস্থান ত্যাগ করিব।"

শৈব্যা ঋষির চরণে প্রণাম করিয়া মূর্চ্ছিত স্বামীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করতঃ ব্রাহ্মণের অনুবর্ত্তিনী হইলেন। এই সময়ে কুমার রোহিতাশ্ব শৈব্যার অঞ্চল ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন দেখিয়া বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, তোমার ক্রীতা এই দাসীর সন্তানটিকেও তুমি গৃহে লইয়া যাও। এজন্য তোমাকে কোন পণ দিতে হইবে না।" ব্রাহ্মণ একটু ভাবিয়া তাহা স্বীকার করিল। রাণী রোহিতাশ্বকে ক্রোড়ে করিয়া ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "হরিশ্চন্দ্র ওঠ!" এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই হরিশ্চন্দ্র সচেতন হইয়া নিকটে রাণী ও রাজকুমারকে দেখিতে না পাইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ভগবন্, আমার শৈব্যা ও কুমার রোহিতাশ্ব কোথায়? তাহাদের অদর্শনে যে আমি চারিদিক শূন্য বোধ করিতেছি। সত্বর বলুন, তাহারা কোথায়?"

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "তোমার পত্নী আত্মবিক্রয় দ্বারা তোমার ঋণের অর্দ্ধাংশ পরিশোধ করিয়া কুমার রোহিতাশ্বের সহিত ক্রেতা ব্রাহ্মণের গৃহে গমন করিয়াছেন—"

হরিশ্চন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ক্রন্দনে দিগঙ্গনাগণ কাঁদিয়া উঠিল।

বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন, "হরিশ্চন্দ্র, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য আর আক্ষেপ কেন?" হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, "ঋষিবর, আমার শৈব্যা দাসী! শত দাসদাসী যাঁহার আদেশ প্রতিপালনের

জন্য সর্ব্বদা সন্ত্রস্তভাবে কালযাপন করিত, অযোধ্যার রাজান্তঃপুরে যিনি গৌরবে বিচরণ করিতেন, সেই আমার প্রাণাধিকা শৈব্যা দাসী! মুনিবর, হতভাগ্যের সহিত আর এরূপ পরিহাস করিবেন না। সত্য বলুন, আমার শৈব্যা ও প্রাণাধিক কুমার রোহিতাশ্ব কোথায়?"

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "হরিশ্চন্দ্র, আমি কি মিথ্যা কথা বলিতেছি?" এই বলিয়া উত্তরীয় প্রান্তে বদ্ধ শৈব্যাপ্রদত্ত পঞ্চশত মুদ্রা দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখ হরিশ্চন্দ্র, তোমার সাধ্বী পত্নী তোমার স্বীকৃত দক্ষিণার মুদ্রার অর্দ্ধেক পরিশোধ করিয়াছেন। এখন অবশিষ্ট পাঁচ শত মুদ্রা আমাকে সত্বর প্রদান কর।" হরিশ্চন্দ্র কি বলিবেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। উদ্ভ্রান্তের ন্যায় কত কি ভাবিতে লাগিলেন। পরিশেষে বলিলেন, "মুনিবর, মহারাণী শৈব্যা দাসী! আর আমি এখানে কর্ম্মক্ষেত্রের ভীষণ চত্বরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি? আমি আর এ প্রেতভূমিতে থাকিতে চাই না। অহো দুর্ভাগ্য! দুরন্ত আহবে যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলাম, যিনি দারুণ বিপদসাগরে ভাসমান আমার আশ্রয়তরণী ছিলেন— তিনি আজ হতভাগ্য আমার জন্য আত্মবিক্রীতা দাসী! যাক্, সব যাক্—সত্য, তুমি যাও,—ধর্ম্ম, তুমি যাও। এই পাপাত্মার দেহে আর তোমাদের থাকিবার অধিকার নাই। আমার এই দেহে এখন প্রেতের অধিকার। আমি যে প্রকারে পারি প্রিয়ার উদ্ধারসাধন করিব। আমার এই বিশাল ভুজ অরাতিনিকরের সম্মুখে যমদণ্ডরূপে শোভা পাইতেছে, আজ আমি এই ভুজবল আশ্রয় করিয়া ক্ষত্রধর্ম্ম অবলম্বন করতঃ দাসত্ব গ্রহণ করিব এবং সেই দাসত্বলব্ধ পণের বিনিময়ে আমার শৈব্যার পুনরুদ্ধার করিব। যদি না পারি, তাহা হইলে এই বরণার জলে জীবন বিসর্জ্জন করিব।" এই বলিয়া হরিশ্চন্দ্র সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্য যেন চঞ্চল হইলেন।

বিশ্বামিত্র ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "হরিশ্চন্দ্র, তুমি এ-কি কথা বলিতেছ? আমার ঋণ পরিশোধ না করিয়া তুমি আত্মহত্যা করিবে? কিন্তু জান, আত্মহত্যা মহাপাপ! আমার ঋণ পরিশোধ না করিয়া পাপ করিতেছ—তাহার উপর আত্মহত্যা করিয়া কেন পাপের ভার বৃদ্ধি করিবে? হরিশ্চন্দ্র, শোন, যদি অদ্য তুমি আমার দক্ষিণার মুদ্রা না দাও—তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, আমার এই রুদ্ধরোষ সর্ব্বনাশের প্রলয়ঙ্করী শিখা বিস্তার করিবে। সমুদ্রে বাড়বানল, অরণ্যে দাবানলের কথা শুনিয়াছ; আজ তোমার অপরাধে আমার রোষানল তোমার বংশকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবে। হরিশ্চন্দ্র, এখনও তোমার এত অভিমান! তুমি এখন দুই পথেব সন্ধিস্থলে আসিয়া উপনীত হইয়াছ। এক পথে তোমার প্রতিজ্ঞা—অন্য পথে অনন্ত নরক। তুমি কোন্ পথে অগ্রসর হইবে, চিন্তা কর!"

হরিশ্চন্দ্র কাতর হইয়া বলিলেন, "নরকের পথে! আর আমার চিন্তা নাই। পত্নীবিরহিত হইয়া আমি মৃত্যুযাতনা ভোগ করিতেছি। পৃথিবী এখন আমার নিকট নরককুণ্ডের মত বোধ হইতেছে। ঋষিবর, আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হোক, আমি যখন পত্নীপুত্ররক্ষণে অপারগ তখন আর আমার নরকবাসের বাকি কি?"

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "হরিশ্চন্দ্র, তোমার পাপে বংশের সর্ব্বনাশ সাধন, এই কি রাজনীতি?" হরিশ্চন্দ্র ব্যগ্র হৃদয়ে বলিলেন, "তাহা হইলে আপনার অভিমত কি?" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "হরিশ্চন্দ্র, তোমার সাধ্বী পত্নীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া মহাপাপ করিও না, বংশে কলঙ্ক অর্পণ করিও না। অযোধ্যার রাজবংশ পবিত্রতার কিরণে চিরভাস্বর। অদৃষ্ট মানুষের দাস নয়, মানুষই অদৃষ্টের দাস। মানুষ এই পৃথিবীতে কর্ম্মফল ভোগ করে। তুমিও তোমার পূর্ব্ব জীবনের কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছ—বংশ নাশ করিতে আইস নাই, সে অধিকার তোমার নাই।"

হরিশ্চন্দ্র ঋষিবরের এই কথা শুনিয়া অবসন্ন হৃদয়ে বলিলেন, "মুনিবর, আপনি আর একটু অপেক্ষা করুন। আমিও পত্নীর মত আত্মবিক্রয় দ্বারা আপনাকে আমার স্বীকৃত মুদ্রা প্রদান করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি নিকটস্থ দাসবিক্রয়স্থানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হে কাশীবাসী ব্রাহ্মণগণ, যদি আপনাদের কাহারও দাসের প্রয়োজন থাকে—তবে পঞ্চশত মুদ্রার বিনিময়ে এই কর্ম্মঠ স্বাস্থ্যসম্পন্ন দাসকে ক্রয় করুন।" কেহ অগ্রসর হইল না দেখিয়া হরিশ্চন্দ্র আবার বলিলেন, "হে কাশীবাসী ক্ষত্রিয়গণ, যদি আপনাদের মধ্যে কাহারও দাসের প্রয়োজন থাকে—তবে পঞ্চশত মুদ্রার বিনিময়ে যুদ্ধনিপুণ রণদুর্ম্মদ এই দাসকে ক্রয় করুন।" এবারেও কেহ আসিল না দেখিয়া হরিশ্চন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, তাহা হইলে কি আমাকে কোন অন্ত্যজ জাতির দাসত্ব স্বীকার করিতে হইবে? আবার চিন্তা করিলেন, যখন দাসত্ব স্বীকার করিতেছি তখন আর মান অভিমান কেন? এই ভাবিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে আর একবার বলিলেন, "হে কাশীবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডালগণ, যদি আপনাদের কাহারও দাসের প্রয়োজন থাকে—তবে পাঁচশত মুদ্রার বিনিময়ে আমাকে ক্রয় করুন।"

হরিশ্চন্দ্রের এই কথা শুনিয়া এক বীভৎসরূপধারী শ্মশানচণ্ডাল তথায় উপনীত হইয়া বলিল, "এখানে কে আছ? আমি দাস চাই।" হরিশ্চন্দ্র শ্মশানচণ্ডালের সেই ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবিলেন, ইহার নিকট আমাকে বিক্রীত হইতে হইবে; আমার অদৃষ্টে এত নির্যাতন ছিল! যাহাই হউক আর ত বিলম্ব করিতে পারিতেছি না। এস্থলে ত অন্য ক্রেতাও আর কেহ নাই। সুতরাং আমাকে ইহার নিকটেই বিক্রীত হইতে হইবে। রাজা চণ্ডালের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "চণ্ডাল, তুমি আমাকে কিনিবে? তবে পাঁচশত মুদ্রা আমায় দাও।"

চণ্ডালের নিকট হইতে পাঁচশত মুদ্রা পাইয়া হরিশ্চন্দ্র তাহা বিশ্বামিত্রের হস্তে প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন, "হরিশ্চন্দ্র আমি তোমার স্বীকৃত দক্ষিণার সহস্র মুদ্রা পাইলাম। এখন আমি চলিলাম—যথাসময়ে আবার আমার দেখা পাইবে।" হরিশ্চন্দ্র প্রণাম করিলেন।

বিশ্বামিত্র তথা হইতে অন্তর্হিত হইলে হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহাকে কি কাজ করিতে হইবে। চণ্ডাল বলিল, "আমি শ্মশানঘাটে শবদাহের কর আদায় করি। তোমাকেও তাহাই করিতে হইবে।" তখন সেই চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্রকে বলিল, "তোমার নাম কি হে, আমি যে কাজ বলিলাম তাহা পারিবে ত?" হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, "আমার নাম হরিশ্চন্দ্র, আমি তোমার কাজ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব। ধর্ম্মরক্ষার জন্য যখন তোমার দাসত্ব স্বীকার করিলাম, তখন তুমি নিশ্চয় জানিও, আমার দ্বারা তোমার কোনও ক্ষতি হইবে না।" তখন চণ্ডাল বলিল, "দেখ বাপু, তোমার নামটা কেমন বিটকাল বলিয়া মনে হইতেছে। আমরা তোমাকে 'হরিয়া' বলিয়া ডাকিব।" হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, "তাহাই বলিও বন্ধু।" হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার করিয়া শ্মশানঘাটে মৃতদেহদাহের কর আদায় ও শূকরচারণ প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

৯

শৈব্যা রাজকুমার রোহিতাশ্বকে বুকে করিয়া ব্রাহ্মণ-গৃহে উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মণের পত্নী দেখিল বৃদ্ধ এক দেবীকে দাসীরূপে আনিয়াছেন। দাসীর সহিত এক কুমারকল্প শিশু—এই কি তবে দাসীপুত্র! মানবে এত রূপ কি সম্ভব! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণী রোষকষায়িত লোচনে দাসীকে নিরীক্ষণ করিয়া একান্তে ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ বলিল, "এই কি দাসী? তোমার

এই তুষারশুভ্র কেশে আবার যৌবনের মাধুরী লাগিয়াছে নাকি ?” ব্রাহ্মণ, পত্নীর মুখ হইতে এতাদৃশ তীব্র পরিহাস শ্রবণ করিয়া অতীব দুঃখের সহিত বলিলেন, “ব্রাহ্মণি, তুমি এ-কি কথা বলিতেছ ? রমণীতেই বিশ্বেশ্বরের অনন্ত করুণার পূর্ণ অভিব্যক্তি, রমণী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে বিশ্বরাজের শুভ আজ্ঞা পালন করিতেছেন, রমণীই মাতৃ-মূর্ত্তিতে দুই হস্তে স্নেহ ও সুধা লইয়া এই জগৎকে ক্রোড়ে করিয়া রহিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তুমি নারী হইয়া নারীর মর্য্যাদা বুঝিতে পার না।”

ব্রাহ্মণ দাসীর কথা সমস্তই ব্রাহ্মণীকে বলিলেন। ব্রাহ্মণী শুনিয়া ভাবিল, কে এ অলোকসামান্য রূপবতী রমণী ! স্বামীর সত্যরক্ষার জন্য রমণীর এই অপূর্ব্ব আত্মদান ইহা ত আর কখনও শুনি নাই। ইহা ভাবিয়া ব্রাহ্মণী দাসীর প্রতি বিরুদ্ধ ভাবনা ত্যাগ করিব বলিয়া মনে করিলেও অজ্ঞাতসারে তাহার হৃদয়ের মধ্যে কি এক কুচিন্তা উদিত হইত। দাসীর সেই কুমারবিনিন্দিত শিশুটিকে দেখিয়া ব্রাহ্মণীর প্রাণে অনেক সময়ে বাৎসল্যের সঞ্চার হইত। ব্রাহ্মণী ভাবিত, শক্তিপুত্রকে দেখিয়া কৃত্তিকার স্তনক্ষীর নিঃসৃত হইয়াছিল। এই দাসীপুত্রকে দেখিয়া পুত্রহীনা আমারও প্রাণে বাৎসল্যের ধারা প্রবাহিত হইতেছে, তবে কি এই দাসীপুত্র কোন দেবশিশু ! এইরূপে অব্যবস্থিতচিত্তা ব্রাহ্মণী নবাগতা দাসী ও দাসীপুত্রের প্রতি কখনও সদ্ব্যবহার, কখনও অসদ্ব্যবহার করিতে লাগিল।

রাজেন্দ্রাণী শৈব্যা ব্রাহ্মণের গৃহে দাসীরূপে অতিকষ্টে পরাধীনতার অন্নে কালযাপন করিতেছেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যের মধ্যে পূর্ব্ব-জীবনের সুখময়ী স্মৃতি জাগিয়া থাকিত। সেই স্মৃতির আকুল উত্তেজনায় তিনি একএকবার মুহ্যমানা হইতেন ; আর ভাবিতেন, বৃথা চিন্তা করিয়া কি হইবে—ইহা যে বিধাতার আদেশ। শৈব্যা এইরূপে অন্তরের ব্যথা চাপা দিয়া কোনরূপে দিনপাত করিতেন।

আর রোহিতাশ্ব জননীর অনন্ত দুঃখের মধ্যে এক মাত্র আশ্বাসের মত থাকিতেন।

ব্রাহ্মণ দাসীর উচ্চমন, দেবতার প্রতি ভক্তি ও সদাচারের পরিচয় পাইয়া বড়ই সুখী হইলেন। ব্রাহ্মণীর প্রাণেও সময়ে সময়ে দাসীর জন্য সহানুভূতি জাগিয়া উঠিত, কিন্তু প্রবল স্বার্থচিন্তা সেই সহানুভূতিকে প্রকাশিত হইতে দিত না। এইরূপে কিছু দিন গত হইলে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী পরামর্শ করিলেন দাসীর পুত্রটিকে পুষ্পচয়নের ভার দেওয়া যাউক। তজ্জন্য পারিশ্রমিক স্বরূপ তাহাকে তাহার আহারীয় দেওয়া হইবে। শৈব্যা ব্রাহ্মণীর এই কথা শুনিয়া পুত্রকে ব্রাহ্মণের পূজার নিমিত্ত পুষ্পচয়নে সম্মতি দিলেন। রোহিতাশ্ব ব্রাহ্মণের জন্য কুসুমচয়ন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

একদিন কুমার রোহিতাশ্ব পুষ্পচয়নার্থ বনে প্রবেশ করিয়াছেন এমন সময়ে এক বিষধর সর্প তাঁহাকে দংশন করিল। বালক রোহিতাশ্ব বিষের জ্বালায় "মা, কোথায় আছ মা",—বলিতে বলিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

ক্রমে এই নিদারুণ সংবাদ শৈব্যার কর্ণগোচর হইল। শৈব্যা রুদ্ধনিশ্বাসে বনে প্রবেশ করিয়া মৃতপুত্রকে বক্ষে ধারণ করতঃ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শৈব্যার ক্রন্দনে যেন বনের বৃক্ষরাজি শ্রীহীন হইয়া গেল। কুসুমলতা সকল যেন সতীর দুঃখে তাহাদের কুসুম-ভূষণগুলি ফেলিয়া দিতে লাগিল। বন্য পশু-পক্ষী সকল পুত্র-শোকাতুরার আকুল ধ্বনিতে যেন স্থিরনেত্রে সতীর চারিদিকে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রমে বেলা শেষ হইয়া আসিল। দাসী এখনও বাড়ীতে প্রত্যাগত হইল না দেখিয়া ব্রাহ্মণ চিন্তিত হইয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দাসী মৃতপুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতেছে! আহা, এই বিজন বনে তাঁহাকে প্রবোধ দিবার কেহ

নাই! ব্রাহ্মণ অদূরে পুত্রশোকাতুরার পাগলিনীমূর্ত্তি দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। অতিকষ্টে দাসীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে প্রবোধ দান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের সান্ত্বনার কথা শুনিয়া শৈব্যার শোকাশ্রুধারা যেন উথলিয়া উঠিল।

ব্রাহ্মণ দাসীর শোকোচ্ছ্বাস দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দাসীর দুঃখে তিনিও অশ্রুপাত করিতে করিতে বলিলেন, "মা, স্থির হও, শোক পরিত্যাগ কর। এই পৃথিবীতে সকলকেই এই পথে যাইতে হইবে! আমরা ইহা বুঝিতে পারি না বলিয়াই ত এত বিড়ম্বনা ভোগ করি। মা, দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া মৃত তনয়ের সৎকার কর।"

সৎকারের নাম শুনিয়া সতীর শোকোচ্ছ্বাস শতগুণ বাড়িয়া উঠিল। সতী আকুলকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, মা হইয়া সন্তানের সৎকার করিব! হায় রে দগ্ধ বিধি, তোমার মনে এত ছিল! আর যে সহ্য হয় না নাথ!"

শৈব্যা মৃতপুত্রকে বক্ষে লইয়া ধীরে ধীরে শ্মশানঘাটের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। নক্ষত্রখচিত নীলাকাশ যেন শৈব্যার দুঃখে বিষাদবারিদপুঞ্জে তারকা-চক্ষু আবৃত করিল।

১০

বরুণা-তীরস্থ কাশীর শ্মশানঘাটে কয়েকটি চিতা জ্বলিতেছে। অদূরে এক শ্মশান-চণ্ডাল এক বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান থাকিয়া পূর্ব্বজীবনের কত কথা ভাবিতেছে। চণ্ডাল ভাবিতেছে—সত্যই কি আমি কোন সময়ে রাজা ছিলাম? আমার কি রাণী এবং একটি শিশু পুত্র ছিল? শত শত দাস-দাসী—অনন্ত ঐশ্বর্য্য—এ-সব নাকি শতরূপে আমার পরিচর্য্যা করিয়াছে—এ-সব কি সত্য? বোধ হয়, না। কোন দিন হয়ত নিদ্রার ঘোরে একটা স্বপ্ন দেখিয়া থাকিব! নচেৎ কোথায়

রাজ্যপাট, আর কোথায় এই কাশীর শ্মশানঘাট! এ-ও কি সম্ভব? ও কি? আকাশের কোলে অন্ধকারের মধ্যে একটি ঋষিমূর্ত্তি নয়? ঐ মূর্ত্তিটিকে যেন চিনি চিনি বোধ হইতেছে! হাঁ, ও যে বিশ্বামিত্র ঋষি! আমি না ঐ ঋষিকে পৃথিবী দান করিয়াছি? হায় রে, শ্মশানচণ্ডাল পৃথিবী দান করিয়াছে! এ-ও কি সম্ভব? এ-সব বিকৃতমস্তিষ্কের প্রলাপমাত্র। হৃদয়, কেন অশান্ত হও। তুমি যে শ্মশানচণ্ডাল—তুমি যে চণ্ডালসর্দ্দার কালুর দাস—হরিয়া চণ্ডাল।

পূর্ব্ব হইতেই আকাশে মেঘের সঞ্চার হইয়াছিল। ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঘন ঘন বিদ্যুতের স্ফুরণে ও বজ্ররবে বুঝি প্রলয়কাল উপস্থিত!

এমন সময়ে এক রমণী মৃতপুত্র বক্ষে করিয়া সেই শ্মশানঘাটে উপস্থিত হইল। ভয়ানক অন্ধকার—কিছুই দেখা যাইতেছে না। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদ্বিকাশে অন্ধকারের ভীষণতা বাড়িয়া উঠিতেছে। শ্মশান-চণ্ডাল ভাবিল, দেখিতেছি কাহার কপাল পুড়িয়াছে! এই কালরাত্রিতে ঐ যে কে একজন আসিতেছে! উহার বক্ষে ওটা কি? একটি শিশুর মৃতদেহ নয়?

রমণীমূর্ত্তি সহসা স্থির হইল। অন্ধকারে পথ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দারুণ ঝড়বৃষ্টির মধ্যে এখানে কি কোন মানুষ আছে? কে তাহাকে পথ দেখাইয়া দিবে—ভাবিতে ভাবিতে রমণী কাতর হইয়া পড়িলেন। সহসা বিদ্যুতের দীপ্তিতে রমণী দেখিলেন, কে একজন সম্মুখে দাঁড়াইয়া! রমণী ব্যগ্রহৃদয়ে বলিলেন, "এ অন্ধকারে কে তুমি?"

অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, "আমি চণ্ডাল। এই শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করাই আমার কার্য্য। এস, সত্বর তোমার কার্য্যসাধন কর। কেন বৃথা শোকাকুল হইতেছ? জগতের রীতিই এই! এক যায়—আর আসে! কালচক্রের মধ্যে জীবের এই মহাঘূর্ণন অনন্ত রহস্যপূর্ণ।

বিশ্বেশ্বরের এই সার্ব্বজনীন উদ্দেশ্য মায়াবদ্ধ মানবের পক্ষে সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য—আমি এই শ্মশানে তাহার বেশ পরিচয় পাইতেছি। তাই বলি, কেন তুমি এত কাতরা হইতেছ?"

রমণী অপরিচিতের সহানুভূতিপূর্ণ কথাগুলি শ্রবণ করিয়া একটু আশ্বস্ত হইলেন। দারুণ বিপদে সান্ত্বনা অশ্রুজল বৃদ্ধি করে মাত্র। রমণীর অশ্রুধারা উথলিয়া উঠিল। তিনি কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "চণ্ডাল, তুমি নিশ্চয়ই মানুষ নও,—কোন দেবতা—নচেৎ এত কোমল হৃদয়, এত সহানুভূতি, এত উচ্চ জ্ঞান তোমার? দেবতা, আমার হারানিধিকে খুঁজিয়া দাও—হতভাগিনীর একমাত্র আশ্রয়টিকে অমৃত বর্ষণে পুনর্জ্জীবিত কর।"

চণ্ডাল বলিল, "কল্যাণি, আমি মিথ্যা কথা কহিতেছি না। আমি তোমারই মত জীবধর্ম্মী মানুষ—অথবা মানুষের অধম—মৃত-দেহদাহকারী শ্মশানচণ্ডাল। কেন তুমি সন্দেহ করিতেছ? আর বিলম্ব করিও না। তোমার মৃত পুত্রের সৎকারের জন্য পাঁচ কাহণ কড়ি দাও। আমি সৎকারের ব্যবস্থা করিতেছি।"

পাঁচ কাহণ কড়ির কথা শুনিয়া শৈব্যার প্রাণ শুকাইয়া গেল। তিনি এত কড়ি কোথায় পাইবেন? গভীর দুঃখের সময়ে মানুষের অতীত জীবনের সুখস্মৃতি প্রাণকে আকুল করে। শৈব্যার হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, কড়ির কোন উপায় না দেখিয়া তাঁহার চক্ষে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

চণ্ডাল বলিল, "কেন বৃথা শোক করিতেছ? সত্বর পাঁচ কাহণ কড়ি দাও। দেখিতেছ না আকাশ একটু পরিষ্কার হইয়াছে, বৃষ্টিও বন্ধ হইয়াছে। আবার ঝড় উঠিলে বা বৃষ্টি আরম্ভ হইলে এই শ্মশানভূমি আরও ভীষণ হইয়া উঠিবে—অতএব আর বিলম্ব করিও না।"

রমণী বলিলেন, "চণ্ডাল, কড়ি আমি কোথায় পাইব? আমি যে ক্রীতদাসী! তোমার পায়ে পড়ি চণ্ডাল, আমার বিপদে তুমি সাহায্য

কর।” ক্ষণপরে হৃদয়ের আবেগ দমন করিয়া বলিলেন, “হায় নাথ, কোথায় রহিয়াছ, দেখিতেছ না, পাঁচ কাহণ কড়ির জন্য তোমার পুত্রের সৎকার হইতেছে না।”

চণ্ডাল বলিল, “ভদ্রে, তোমার নিষ্ঠুর স্বামী কি এখনও জীবিত?”

রমণী সোদ্বেগে বলিলেন, “চণ্ডাল, তুমি কাহার নিন্দা করিতেছ? আমার স্বামী নিষ্ঠুর? আমার স্বামী যে রাজরাজেশ্বর—আমার স্বামী যে দানবীর—আমার স্বামী যে বিপন্নশরণ, প্রজাবৎসল, স্নেহময় নরদেবতা। চণ্ডাল, না জানিয়া কেন তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলিতেছ?”

চণ্ডাল সচকিতে জিজ্ঞাসা করিল, “তবে কেন তোমার এরূপ অবস্থা! কেন তুমি এমন অসহায় অবস্থায় একাকিনী শ্মশানক্ষেত্রে আসিয়াছ?”

রমণী কাতরকণ্ঠে বলিলেন, “সে অনেক কথা! হায় হায়, অদৃষ্টে এতও ছিল? মা হইয়া পুত্রকে শ্মশানে আনিতে হইল! হায় নাথ, কোথায় রহিয়াছ? দেখিলে না, তোমার সোনার রোহিতাশ্ব আজ যে চিরনিদ্রায় শ্মশানশয়নে।”

ও কি? চণ্ডালের এরূপ ভাব কেন? চণ্ডাল ভাবিতে লাগিল—আমার পুত্রের নাম রোহিতাশ্ব ছিল নয়? ঐ রমণীর মুখে রোহিতাশ্ব নাম শুনিলাম যে,—তবে কি ঐ রমণী আমার শৈব্যা? এই ভাবিয়া চণ্ডাল সত্বরে রাণীর নিকট আগমন করিয়া ব্যগ্রহৃদয়ে বলিলেন, “বল বল রমণি, তুমি কি অযোধ্যার রাজা হরিশ্চন্দ্রের মহিষী শৈব্যা—এই মৃত বালকটি কি কুমার রোহিতাশ্ব?”

সহসা বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। বিদ্যুতের আলোকে উভয়েই উভয়কে চিনিতে পারিলেন। হরিশ্চন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “মহারাণী শৈব্যা—প্রাণের রোহিতাশ্ব—এই তোমাদের অবস্থা।” এই বলিয়া মৃতপুত্রের বক্ষের উপর পড়িয়া হরিশ্চন্দ্র হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।”

বিদ্যুতের আলোকে উভয়েই উভয়কে চিনিতে পারিলেন।

New Artistic Press, Calcutta
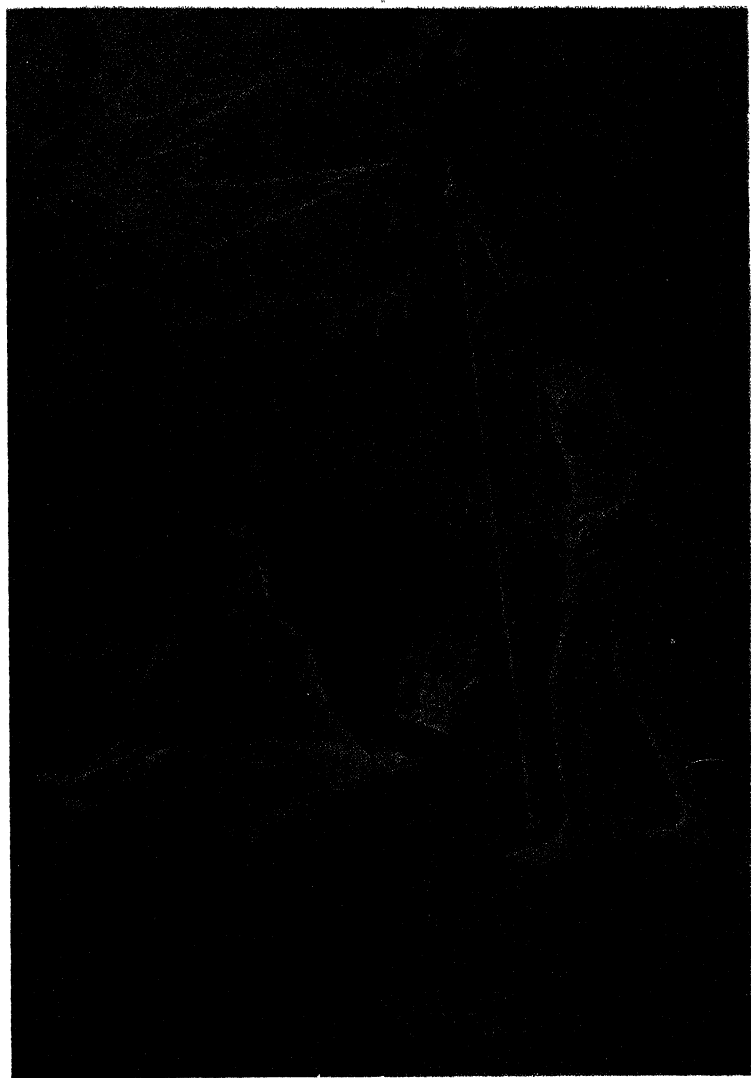
শৈব্যা কাতরপ্রাণে বলিলেন—"মহারাজ, এ বেশ তোমার !" রাজা-রাণীর আকুল ক্রন্দনে কাশীর শ্মশানঘাট যেন কাঁদিয়া উঠিল। বহুক্ষণ বিলাপের পর হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, "রাণি, আর কেন ?—জীবনের সব সাধ ফুরাইয়া গিয়াছে—চল মৃতপুত্রকে বক্ষে করিয়া ঐ প্রজ্বলিত চিতাগর্ভে প্রবেশ করি। আমাদের এই ঘৃণ্য প্রাণে আর প্রয়োজন কি ?"

"আছে হরিশ্চন্দ্র, আছে, তোমাদের মত আদর্শ দম্পতীকে বক্ষে ধারণ করিয়া ধরিত্রী আজ ধন্যা হইয়াছেন"—এই কথা বলিতে বলিতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তথায় আসিয়া হরিশ্চন্দ্রের হস্তধারণ করিলেন।

রাজা ও রাণী গলদশ্রুলোচনে ঋষিবরের চরণে পতিত হইলেন। বিশ্বামিত্র পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, "বৎস হরিশ্চন্দ্র, মা শৈব্যা, দুঃখ পরিত্যাগ কর। দেখ রজনীশেষের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের দুঃখনিশারও অবসান হইয়াছে।"

এই বলিয়া বিশ্বামিত্র মৃত রোহিতাশ্বের দেহে স্বীয় কমণ্ডলুস্থিত সঞ্জীবনী-সলিল সেচন করিলেন। অমনি রোহিতাশ্ব জীবনীশক্তি লাভ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মা, কোথায় তুমি।" শৈব্যা রোহিতাশ্বকে কোলে লইয়া মুনিবরের চরণরেণু তাহার সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিলেন।

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, "মহর্ষে, দুঃখের পরীক্ষায় আপনি আমাকে অনন্ত সুখের অধিকারী করিলেন ; আপনার এ ঋণ আমার অপরিশোধ্য।" হরিশ্চন্দ্রের এই কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন, "হরিশ্চন্দ্র, জগতে কর্ম্মী কেহ নাই, সকলের মূল বিধাতা। মহারাজ, ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং 'ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং।' কর্ম্মেই জগতের প্রতিষ্ঠা। তোমরা কর্ম্মের সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছ। ধর্ম্ম তোমাদের চিরসহায়। যদিও তুমি নানা দুঃখদুর্দ্দশার মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইতেছিলে, কিন্তু দেখিতেছ কি এই সংগ্রামে জয়ী কে ?

তুমি রাজ্য হারাইয়াছিলে বটে, কিন্তু তোমার এই কীর্ত্তিকাহিনীতে যে ভুবন ভরিয়া গিয়াছে। আর আমি, রাজ্য লাভ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছি—ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বিসর্জ্জন দিয়া দেখ কতদূর অধঃপতিত হইয়াছি। হরিশ্চন্দ্র, একদিন রাজ্যদান করিয়া ভিখারী হইয়াছিলে—আজ সেই রাজ্য গ্রহণ করিয়া মহিমার রত্নকিরীটে সুশোভিত হও। আমার ব্রহ্মসাধনার পথ পরিষ্কৃত হউক।"

বিশ্বামিত্র অযোধ্যার রাজসিংহাসনে হরিশ্চন্দ্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাজ্যে আনন্দ শতধারে বহিতে লাগিল।

পঞ্চম আখ্যান

চিন্তা

পঞ্চম আখ্যান

চিন্তা

১

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে চিত্রসেন নামে এক প্রবলপ্রতাপ দানবীর পরমধার্ম্মিক রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি সুশাসনে সাক্ষাৎ ইন্দ্র-তুল্য, ন্যায়বিচারে মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম, শাস্ত্রজ্ঞানে প্রত্যক্ষ বৃহস্পতির তুল্য ছিলেন। এই সকল রাজোচিত গুণাবলির সমাবেশে রাজা চিত্রসেন প্রজাগণের হৃদয়ে দেবতারূপে বিরাজিত থাকিতেন।

রাজার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। আকাশস্পর্শী সপ্তমহল রাজ-অট্টালিকা। বিবিধরত্নসম্ভারপূর্ণ কারুকার্য্যসম্পন্ন সেই রাজপ্রাসাদ ইন্দ্রের বৈজয়ন্ত অপেক্ষাও সমৃদ্ধিসম্পন্ন বোধ হইত। অসংখ্য দাস-দাসী রাজাদেশ পালন করিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত। ফলতঃ রাজপুরী সুখ, শান্তি ও শৃঙ্খলায় সংসারে আনন্দ-নিকেতনস্বরূপ সকলের লোভনীয় হইয়া শোভা পাইত।

রাজা চিত্রসেনের একমাত্র তনয়ার নাম চিন্তা। চিন্তা লোক-ব্যথাদায়িনী চিন্তা নয়, সংসারের মনোমোহিনী চিন্তা। যিনি দেখিতেন, তিনিই চিন্তার কমনীয় দেহে এক অপার্থিব লাবণ্য ও সুষমা দেখিয়া ভাবিতেন, আহা, কি রূপমাধুরী! যেন বিধাতা এই অনিত্য পৃথিবীতে সৌন্দর্য্য পবিত্রতার মূর্ত্তি দেখাইবার জন্যই চিন্তার সৃষ্টি করিয়াছেন। চিন্তার অঙ্গকান্তিতে জ্বালা নাই—আছে মনো-মোহিনী শান্তি। চিন্তাকে দেখিলে অগ্নিময়ী লালসা আসে না—আসে কেবল তৃপ্তি। চিন্তাকে দেখিলে হতাশাতাপদগ্ধ হতভাগ্যেরও প্রাণে আনন্দের বাতাস খেলা করে। চিন্তা যেন বিধাতার সৃষ্ট একখানি নিখুঁৎ সুন্দর ছবি।

চিন্তার সেই মমতাময়ী মূর্ত্তিতে যেন বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টিরহস্য নিহিত রহিয়াছে, নচেৎ মানবীতে কি এত রূপ সম্ভব! সকলেই দেখিত, চিন্তার অনুপম কান্তিতে চারিদিক যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। নারীর নারীত্ব যেন চিন্তার মুখে চোখে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। চিন্তা যেন সুখসাগরে প্রস্ফুটিত কমলিনী, মধুর মারুত-হিল্লোলে চিরদিন সুখে আন্দোলিত হইতেছে।

পিতার আদরে, মাতার বক্ষঃভরা স্নেহে, চিন্তার সুখময় শৈশব-জীবন অতিবাহিত হইল। চিন্তা এখন মাতৃক্রোড় ত্যাগ করিয়া একটু স্বাধীনভাবে চলিতে শিখিয়াছে, তাহার অনেক শৈশবসঙ্গিনী জুটিয়াছে। চিন্তা তাহাদের সহিত খেলা করে। রাজান্তঃপুরস্থ ক্রীড়া-কাননে সঙ্গিনীসহ প্রবেশ করিয়া পুষ্পচয়ন ও মাল্যরচনা করে। সঙ্গিনীগণের অনেকেই হাস্যমুখরা ও রহস্যপ্রিয়া। কিন্তু সখীগণের মত চিন্তার তেমন উচ্চ হাসি বা রহস্যপ্রিয়তা ছিল না। চিন্তা হাসি ও খেলার মধ্যে সংসারে 'আরও কিছুর' সন্ধান পাইবার জন্য চেষ্টা করিত। বালিকা উদ্যানে প্রস্ফুট কুসুমের মনোহর শোভা দেখিয়া ভাবিত—আহা, ফুলটি কি সুন্দর! কিন্তু যাঁহার কৃপায় এই ফুল ফুটিয়াছে, না জানি তিনি কত সুন্দর। পাখীর গানে মন মুগ্ধ হইলে ভাবিত, পাখীরা এই সুমিষ্ট স্বরে যাঁহার বন্দনাগীতি গাহিতেছে, না জানি, তিনি কত মহান্; নির্ঝরের তীরে বসিয়া ভাবিত, জগৎস্রষ্টার কি অনন্ত করুণা! প্রাতঃসমীরণের শীতলতায় পুলকিত হইয়া ভাবিত, আহা বিধাতার দান কত অনন্ত! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাজতনয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া পড়িত। বিধাতার পবিত্র আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া বালিকা আবার নবীন উৎসাহ লাভ করিত।

সুখের সংসারে জন্মিলে শিশুগণ একটু অধিক বিলাসী ও ক্রীড়া-শীল হইয়া থাকে। কিন্তু রাজকুমারী চিন্তা মাতাপিতার একমাত্র কন্যা হইয়াও ব্রতনিয়মে আত্মত্যাগিনী যোগিনীর মত হইয়া উঠিয়া-

ছিল। তাহার এই অলৌকিক বাল্যজীবন তাহাকে ভবিষ্যতের পথে চালাইবার জন্য প্রস্তুত করিতেছিল। চিন্তা ভাবিত, সুখ বা দুঃখ জগতে কিছুই নাই। ভ্রমান্ধ ব্যক্তিগণ সুখে আত্মহারা এবং দুঃখে কাতর হইয়া কর্ত্তব্যপথচ্যুত হয়। রাজকন্যা আমি, শত দাসদাসী আমার আদেশ পালনে সচেষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু আমি কি নিজে কিছু করিতে পারি না? কার্য্যেই ত প্রকৃত গৌরব। অলস হইয়া কেহ বড় হইতে পারে না। মানুষকে বড় হইতে হইলে আত্মনির্ভরতা শিখিতে হইবে। দুঃখে বা কষ্টে পড়িলে তাহাকে ভগবানের দান বলিয়া বুঝিতে হইবে—আত্মনির্ভরতার অদম্য শক্তি আশ্রয় করিয়া দুঃখের পাশ হইতে মুক্ত হইতে হইবে। সুতরাং আমি নিজের কাজ নিজে করিব। এই ভাবিয়া চিন্তা নিজের সমস্ত কাজ নিজেই করিত। রাণী বালিকার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া কিছু বলিলে চিন্তা উত্তর করিত, "মা, কর্ম্মভূমি এই ধরণীতে মানুষ কর্ম্মেই ধন্য হয়। মা, আমি যে কাজ ভালবাসি।"

রাণী তনয়ার মুখ হইতে এইরূপ কথা শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইতেন, কিন্তু বালিকার কার্য্যসাধনের আয়াসজাত ঘর্ম্মবিন্দু দেখিলে তাঁহার মুখখানি মলিন হইয়া যাইত।

কর্ম্মপ্রিয়া চিন্তা সর্ব্বদা কর্ম্ম লইয়াই আছে। দরিদ্রের কষ্ট মোচন, আতুরের পরিচর্য্যা করিতে পারিলেই সে সুখী হইত। কাহারও দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিলে তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিত।

২

একদিন বসন্তের মধুর প্রভাতে রাজকুমারী চিন্তা রাজান্তঃপুরস্থ ক্রীড়াকাননের একাংশে উপবেশন করিয়া একটি প্রস্ফুটিত কুসুমের শোভা দেখিতেছিল। গভীর একাগ্রতায় বালিকাকে যেন এক খানি

চিত্রাঙ্কিতবৎ মনে হইতেছিল। তাহার সেই ভ্রমরকৃষ্ণ আকুঞ্চিত কুন্তলরাজি আলুলায়িত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে ; অলকদাম ললাটদেশ স্পর্শ করিয়া প্রাভাতিক বায়ুভরে ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। বালিকার দৃষ্টি সেই কুসুমটির দিকে। কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, যদিও তাহার দৃষ্টি কুসুমের দিকে নিবদ্ধ তথাপি চিত্ত এই নশ্বর মর্ত্ত্যকুসুমকে পরিত্যাগ করিয়া যেন অমরাবতীর প্রফুল্ল ভাবকুসুমে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। চিন্তার মুখখানি ব্রতোজ্জ্বল, গম্ভীর ও প্রসন্ন। হৃদয়ের পবিত্রতা যেন তাহার মুখখানিকে অপূর্ব্ব ভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে। তাহার উপর প্রভাতসূর্য্যের স্বর্ণকিরণ পতিত হইয়া সেই নিকুঞ্জবাসিনী বালিকাকে স্নিগ্ধোজ্জ্বল ঊষারাণীর মত দেখাইতেছিল। চিন্তার হৃদয় চিন্তাদেবীর অক্লান্ত পক্ষে আরোহণ করিয়া দৃষ্টি ও কল্পনার বহির্ভূত কোন্ ভাবরাজ্যে উধাও হইয়া চলিয়াছে।

এমন সময়ে রাজা চিত্রসেন উদ্যান ভ্রমণে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রাণাধিকা তনয়া লতাবিতানের পার্শ্বে বসিয়া ভাবনিমগ্না। রাজা, চিন্তার সেই গভীর ভাবাবেশ দেখিয়া মনে করিলেন, মা আমার যেন স্বর্ণকিরণে শান্তোজ্জ্বল ঊষারাণীর মত, অথবা কোনও দ্যুলোকবাসিনী দেবী তাঁহার তনয়ারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বজীবনের সুখস্মৃতি অনুভব করিতেছেন।

রাজা ধীরে ধীরে তনয়ের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন ; বালিকার কিন্তু জ্ঞান নাই। রাজা স্নেহজড়িতকণ্ঠে বলিলেন, "মা চিন্তা, আজ একাকিনী এ মধুর প্রভাতে তোমার এরূপ চিন্তার কারণ কি ?"

বালিকা সপ্রতিভ হইয়া বলিল, "বাবা, আমি একদৃষ্টে ঐ প্রস্ফুটিত কুসুমটি দেখিতেছিলাম। সে যেন আমাকে বলিতেছিল— রমণী সেই দিনই সার্থক, যে-দিন কর্ত্তব্যের আলোকে তাহাকে মহিমামণ্ডিত করিয়া তুলে। বাবা, কুসুমের সেই মৌন উপদেশ

আমার প্রাণে বড়ই লাগিয়াছে। সে যেন বলিতেছিল—জগতে অন্যের প্রশংসা-নিন্দার অন্তরালে কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত থাকিবে। জাগতিক বাধা কর্ত্তব্যসাধনের দৃঢ়প্রতিজ্ঞার নিকটে প্রথমে বলপ্রকাশ করিলেও শেষে সিদ্ধির পথ দেখাইয়া দিয়া হৃদয়কে বলীয়ান্ করিবে। পিতা, ভ্রমান্ধ আমরা এই পৃথিবীতে নিজের কর্ত্তব্যের পথ ছাড়িয়া দিই, মানুষের সৃষ্টি ভগবানের অবদান—ইহা আমরা ভুলিয়া যাই।"

রাজা চিত্রসেন আজ তনয়ার এইরূপ ভূমাজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া অতীব প্রীত হইলেন। তাঁহার চক্ষু প্রেমাশ্রুবর্ষণে হৃদয়ের আনন্দ জ্ঞাপন করিল। রাজা ভাবিলেন, আমি ধন্য। আমার এই বালিকা তনয়া যেন শাস্ত্রজ্ঞানে মূর্ত্তিমতী সরস্বতী

অপূর্ব্ব শ্রীশালিনী চিন্তার রূপ ও লাবণ্যে হৃদয়ের পবিত্রতা মিশ্রিত হইয়া কত মনোজ্ঞ হইয়াছে। বালিকা চিন্তা শৈশবের খেলা ভুলিয়া এখন ভগবানের মধুরভাবে বিভোর। রাজা তনয়ার এই ভাব দেখিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উদ্যান ভ্রমণ করতঃ তনয়া সহ রাজপুরীতে প্রত্যাগত হইলেন।

৬

চিন্তা আর বালিকা নাই। চিন্তার বিবাহ দিবার জন্য নানা-দেশে ভাট প্রেরিত হইল। রাজা ও রাণী ভাবিতে লাগিলেন, চিন্তা যেমন সুশীলা ও ভগবদ্ভক্তিসম্পন্না, তাহার উপযুক্ত পাত্র কোথায় পাওয়া যাইবে!

চিত্রসেন-নিয়োজিত ভাটগণ নানা দেশে চিন্তার উপযুক্ত রাজ-পুত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু কোথাও চিন্তার উপযুক্ত পাত্র খুঁজিয়া পাইল না। পরিশেষে এক দূত প্রাগ্‌দেশে* চিত্ররথ রাজার রাজ্যে উপনীত হইল। দেখিল, সু-উচ্চ নগরতোরণ রাজ্যের

* ব্রহ্মপুত্র ও ভাগীরথী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান।

সমৃদ্ধি ঘোষণা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রাজার সুশাসনে প্রাগ্‌দেশ নিয়মশৃঙ্খলার বিহারভূমি বলিয়া তাহার মনে হইল। দূত প্রাগ্‌রাজকুমারের শৌর্য্য, বীর্য্য, বিদ্যাবত্তা প্রভৃতির কথা শুনিয়া মনে করিল, ইনিই চিত্রসেন-দুহিতা চিন্তার স্বামী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

দূত রাজসভায় উপনীত হইয়া যথাবিধি অভিবাদনান্তে রাজা চিত্ররথকে বলিল, "মহারাজ, নরনাথ চিত্রসেন তাঁহার অপরূপরূপ-লাবণ্যবতী তনয়া চিন্তার উপযুক্ত পাত্রের অন্বেষণ করিতেছেন। আপনার পুত্র যুবরাজ শ্রীবৎস প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছেন। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক চিত্রসেন-দুহিতার সহিত রাজকুমার শ্রীবৎসকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করুন।"

রাজা চিত্ররথ তাঁহার উপযুক্ত পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য রূপগুণ-শালিনী পাত্রীর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। আজ দূতের নিকট চিন্তার সংবাদ শ্রবণ করতঃ অত্যন্ত প্রীতি প্রকাশ করিয়া তদ্বিষয়ে সম্মতি দিলেন। দূত পরম হর্ষে চিত্রসেন রাজার রাজ্যে প্রত্যাগত হইল।

প্রত্যাগত দূতের মুখে প্রাগ্‌দেশপতির পুত্র শ্রীবৎসের কথা শুনিয়া চিত্রসেন অত্যন্ত পুলকিত হইলেন এবং পরিণয়ের উপযুক্ত আয়োজন করিবার জন্য মন্ত্রীকে আদেশ প্রদান করিলেন।

রাজার আদেশে নগর-তোরণ সুসজ্জিত হইল। বায়ুকম্পিত পতাকাকুলের পত-পত শব্দে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। রাজ-পথের দুই পার্শ্বে আম্রপল্লবের মালা প্রলম্বিত হইল। স্থানে স্থানে নবনির্ম্মিত তোরণদ্বারে মঙ্গলঘট স্থাপিত হইল। সমস্ত রাজ্য শ্রুতিসুখকর নানা বাদিত্রনিঃস্বনে যেন ঐশ্বর্য্যময়ী গন্ধর্ব্বপুরীর মত বোধ হইতে লাগিল।

ক্রমে বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইলে রাজা চিত্ররথ বিপুল আড়ম্বরে চিত্রসেন রাজার রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিলেন। প্রাগ্‌রাজের

ঐশ্বর্য্য অবর্ণনীয়। বরানুগ শোভাযাত্রার সমৃদ্ধি বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। শোভাযাত্রার সম্মুখে সহস্র সহস্র বিপুলকায় হস্তী নানাবিধ রত্নখচিত আস্তরণ-শোভিত হইয়া মন্থর গতিতে চলিয়াছে ; তৎপশ্চাতে অসংখ্য সুসজ্জ অশ্বের পৃষ্ঠদেশে এক এক যোদ্ধৃপুরুষ আরোহণ করিয়া গমন করিতেছে। সঙ্গে নানাবিধ মনোহর বাদ্য নিনাদিত হইতেছে। ক্রমে এই বিপুলবাহিনী রাজা চিত্রসেনের রাজ্যে প্রবেশ করিল। চিত্রসেন বরানুগামিগণের সমুচিত আবাসস্থান ও পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

শুভক্ষণে চিত্রসেন শ্রীবৎসের করে তাঁহার অপরূপরূপলাবণ্যবতী তনয়া চিন্তাকে সমর্পণ করিলেন। রাজকুমার শ্রীবৎস শুভদৃষ্টির পবিত্রক্ষণে চিন্তার অনুপম রূপমাধুরী দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিলেন। বিধাতৃনিয়মে নবদম্পতীর প্রাণ সেই পবিত্র মুহূর্ত্তেই একে অন্যের পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। শ্রীবৎস বুঝিলেন, সংসারে মূর্ত্তিমতী করুণা, কর্ম্মে ভালবাসার মত চিন্তা তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

রাজকুমারী চিন্তা বক্ষঃভরা প্রেম দিয়া শ্রীবৎসের অভ্যর্থনা করিলেন। রাজকুমার শ্রীবৎস উৎফুল্ল হৃদয়ে চিন্তার সেই প্রেমপূজা গ্রহণ করিলেন। দুটি প্রাণ এক হইল। এ মিলন রূপজ মোহ-জনিত নয়—এযে হৃদয়ের মিলন—এযে আত্মার আত্মসমর্পণ—এযে ইহ-পরকালের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন।

চিত্রসেন রাজার আতিথ্যে ও ভদ্রতায় চিত্ররথ অতীব প্রীত হইলেন। অবশেষে প্রাগ্‌পতি রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য বৈবাহিকের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। চিত্রসেন যথোচিত বিনয় প্রকাশ করিয়া চিত্ররথকে আরও কিছু দিন তথায় সদলে অবস্থিতি করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কঠিন রাজকার্য্যের গুরুত্ব ভাবিয়া চিত্ররথ আর তথায় বিলম্ব করিতে পারিলেন না।

চিন্তা শ্বশুর-গৃহে আসিয়া ভক্তিভরে শ্বশ্রূদেবীর চরণে প্রণাম করিলেন। শ্রীবৎস-জননী রূপগুণশালিনী পুত্রবধূকে সাদরে বরণ করিয়া লইলেন। চিন্তার ভক্তি ও সেবায় রাজা-রাণী উভয়েই মুগ্ধ, স্নেহ ও মমতায় দাসদাসীগণ পরিতৃপ্ত, করুণা ও আদরে অন্ধ আতুর আশ্বস্ত, আর রাজকুমার শ্রীবৎস চিন্তার প্রেমপূজায় সুপ্রসন্ন।

রাজকুমারী চিন্তা প্রাণপণে শ্রীবৎসকে সুখী করিতে যত্নবতী হইলেন। আর তাঁহার খেলা নাই। সখীদের সঙ্গে আর হাস্য-পরিহাস নাই; তাঁহার সকল কার্য্যের মধ্যে প্রধান লক্ষ্য, স্বামীকে কিসে সুখী করিবেন। ফলতঃ রাজকুমার শ্রীবৎস অল্পদিনেই চিন্তার সেবাশুশ্রূষায় পরম পরিতৃপ্ত হইলেন।

এই ভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হইল। সমহিষী রাজা চিত্ররথ উপযুক্ত পুত্র শ্রীবৎসকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন।

৪

শ্রীবৎস এখন প্রাগ্‌দেশের রাজা। মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের মত, শ্রীবৎস প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। প্রজারাও রাজাকে অনুরাগ দিয়া বরণ করিয়া লইল। রাজ্যে কোথাও বিষাদ বা কোলাহল নাই—সুখে শান্তিতে প্রাগ্‌রাজ্য পূর্ণ। চিন্তা সেই সুখশান্তিপূর্ণ রাজ্যে আদর্শ রাণী, আদর্শ জননী হইয়া উঠিলেন। তিনি স্নেহ ও মমতার পরিচয়ে প্রজাকুলের চক্ষে দেবীরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।

একদা বাসন্তরজনীতে শ্রীবৎস চিন্তার সহিত অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে অবস্থান করিতেছেন। নিকটে কেহ নাই। চিন্তা প্রিয় দয়িতের দেহে নিজ দেহভার বিন্যস্ত করিয়া বসিয়া আছেন। রাজা অনিমিষ-নয়নে চিন্তার হাস্যমাখা লজ্জাজড়িত মুখখানি দেখিয়া কত তৃপ্ত হইতেছেন। সুনীল গগনে পূর্ণচন্দ্র রাজা ও রাণীর এই মধুর

মিলনদৃশ্য দেখিয়া পৃথিবীতে হাসির আলো ছড়াইয়া দিতেছে,—এমন সময়ে চিন্তা বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, এই পৃথিবীতে সুখ কোথায়? আমি যাহাকে সুখ মনে করি, হয়ত অন্যে তাহাতে অসুখী হয়। আমার মনে হয়, কর্ম্মভূমি এই পৃথিবীতে মানুষ কর্ম্মেই সুখী। নাথ, দয়া করিয়া সুখদুঃখ ও মানবজীবনের কর্ত্তব্য কি আমাকে বুঝাইয়া দাও।"

শ্রীবৎস, চিন্তার এই চিন্তাপূর্ণ কথায় অতীব প্রীতিলাভ করিয়া বলিলেন, "চিন্তা, তুমি আজীবন বিলাসের ক্রোড়েই প্রতিপালিত হইয়াছ—এ গুরুগম্ভীর চিন্তা তোমার হৃদয়ে কিরূপে প্রবেশ করিল?" চিন্তা নীরব হইয়া রহিলেন। শ্রীবৎস বলিলেন, "চিন্তা, তুমি যথার্থই চিন্তা। তুমি পৃথিবীতে মনতায় এক নবীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছ। তুমি মদবিহ্বল স্বামীকে চিন্তা করিতে শিক্ষা দিয়াছ। তুমি ধন্য, আর ততোধিক ধন্য আমি, তোমার মত দেবী-প্রতিমার স্বামিত্ব লাভ করিয়া। চিন্তা, এই জগতে বিশ্বপতির বিচিত্র রচনাকৌশল দেখা যায়। তাঁহার এক ভূমা শক্তি সর্ব্বত্র সঞ্চারিত। জগতের তাবৎ বস্তুই তাঁহার সেই অপার করুণা ও অপূর্ব্ব মহিমা বিঘোষিত করিতেছে। সংসারের আবর্ত্তে ঘূর্ণ্যমান আমরা প্রকৃতিদেবীর সে মহাসঙ্গীত শুনিতে পাই না। বিহঙ্গের কলগীতি, বৃক্ষপত্রের শর্ শর্ শব্দ, বনদেবীর বনবীণার মধুর রব, সমস্তই সেই মহাসঙ্গীতের ঝঙ্কারমাত্র। আমরা তাহার মাধুরী বুঝিতে পারি না। যাঁহারা ভগবানকে চিনিয়াছেন, তাঁহারা সামান্য রেণুকণা হইতে ক্ষুদ্র বিশাল তাবৎ বস্তুতেই সেই মহিমময়ের অনন্ত মহিমা দেখিতে পান। আজ এই জ্যোৎস্নাপুলকিত মধুর বাসন্তী নিশায় তোমার পার্শ্বে বসিয়া যে জ্ঞান লাভ করিলাম তাহা অনন্ত ও অপূর্ব্ব। দেবি, সংসারী যাহারা, তাহারা মনে করে পৃথিবীতে সুখ নাই। কিন্তু ভগবানের এই সুখময় রাজ্যে সুখেরই ত খেলা—

চারিদিকে আনন্দ এবং তৃপ্তি। কিন্তু মানব নিজের কর্ম্মের দোষে সুখী হইতে পারে না এবং পৃথিবীকেও দুঃখময় দেখিয়া অশ্রুজল বর্ষণ করে। প্রিয়ে, কর্ম্মভূমি পৃথিবীতে কর্ত্তব্যপালনেই সুখ। যিনি নিজের কর্ত্তব্য সাধন করেন, সেই ভাগ্যবানের জন্য পার্থিব যত কিছু আনন্দ অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে, হতাশা অথবা অন্য কোন বাধা তাঁহা হইতে ক্রমে দূরে গমন করিতেছে। আমরা এইটি বুঝিতে পারি না বলিয়াই এত যাতনা ভোগ করি। ভগবানে প্রীতি, আত্মজ্ঞানের বিকাশ সাধন, জীবে দয়া ইহাই মানবের প্রধান কর্ত্তব্য। এই শান্তশীতল রজনীতে তুমি আমাকে যে শিক্ষা দিয়াছ, তাহাতে আমি এক মধুর ভাবে নিমগ্ন হইয়াছি। আমার প্রার্থনা, তুমি ভগবানের অপার কৃপার অধিকারিণী এবং আর্য্যরমণীর গৌরব-পূর্ণ আদর্শস্থল হও।"

চিন্তা স্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়া একটু মুখ নত করিলেন। ক্ষণপরে বলিলেন, "নাথ, আমি অশিক্ষিতা, পিতৃগৃহে বিপুল ঐশ্বর্য্য ও মমতার মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া উপযুক্ত শিক্ষা পাই নাই। তুমি দেবতা, আমার অজ্ঞানতা দূর করিয়া দাও। হৃদয়ে এমন বল দাও, যাহাতে দুঃখ কষ্ট আসিয়া আমাকে কাতর করিতে না পারে,—নারী হইয়া যাহাতে নারীত্ব বজায় রাখিতে পারি। নাথ, শৈশবে পিতৃ-গৃহে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি কত পুণ্যশীলা মহিলার জীবন-কাহিনী শুনিয়াছিলাম। দারুণ দুঃখের মধ্যে নিপতিত হইয়াও হৃদয়ের অদম্য শক্তিতে তাঁহারা কিরূপে দুঃখের গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া শান্তির ক্রোড় আশ্রয় করিয়াছিলেন—কিরূপে একনিষ্ঠার বলে তাঁহারা সতীত্বের আদর্শস্থানীয়া হইয়া রহিয়াছেন—তাহা আমি জানি; কিন্তু এই পৃথিবীতে আমি কিরূপে অগ্রসর হইব? শাস্ত্রে বলে, 'স্বামীই নারীজাতির সর্ব্বস্ব, স্বামীই প্রেমের প্রত্যক্ষ দেবতা, স্বামীই শিক্ষাদীক্ষার গুরু।' হে জীবনসর্ব্বস্ব, দয়া করিয়া আর্য্য-

রমণীর গৌরবময় পথে অগ্রসর হইবার উপযুক্ত শিক্ষা আমায় দান কর।”

চিন্তার এই কথা শুনিয়া রাজা শ্রীবৎস অত্যন্ত সুখী হইলেন। তাঁহার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ভাবিলেন, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বেও যে সুখ নাই, তাহা আমার রাজ-সংসারে বর্ত্তমান। নারীই মূর্ত্তিমতী দেবী। আমার রাজ্য পবিত্রতাময়ী রমণীর স্নেহকোমল মধুরভাবে পূর্ণ। ধন্য আমি—এরূপ পতিপ্রাণা পত্নী লাভ করিয়াছি। এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা চিন্তাকে বলিলেন, “রাজ্ঞি, তুমি অশিক্ষিতা কিসে? পুস্তক পাঠেই শিক্ষা হয় না। হৃদয়ের উন্নতিই প্রকৃত শিক্ষা। তুমি বাল্যকালে তোমার মাতাপিতার নিকট যে শিক্ষা পাইয়াছ তাহা অতীব উচ্চ। তোমার হৃদয় যে অনন্ত জ্ঞানে পূর্ণ। তোমাকে আমার শিক্ষা দিবার কিছুই নাই। কঠিন বিচারকার্যে তোমারই যুক্তি আমি অবলম্বন করি।”

এইরূপ কথোপকথনে ক্রমশঃ প্রভাত-লক্ষণ দেখা গেল। পূর্ব্বাকাশ ঈষৎ রক্তিমাভা ধারণ করিল, বিহঙ্গকুল কুলায় ত্যাগ করিয়া প্রেমভরে ভগবানের বন্দনাগীতি গাহিতে লাগিল। দূর দেবালয় হইতে প্রাভাতিক আরতির শব্দ আসিতে লাগিল। রাজা ও রাণী সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিবার জন্য পূজাগৃহে গমন করিলেন।

৫

একদিন স্বর্গে শনির সহিত লক্ষ্মীর বিবাদ বাধিয়া উঠিল। উভয়ের মধ্যে ‘কে বড়’ ইহা লইয়া বিবাদ। শনি বলেন, ‘আমি বড়’, লক্ষ্মী বলেন, ‘আমি বড়’। দেবসভায় আর ইহার মীমাংসা হইল না দেখিয়া শনি বলিলেন, “চল প্রাগ্‌দেশে শ্রীবৎস নামে এক পরমধার্ম্মিক ন্যায়পরায়ণ রাজা আছেন, তাঁহার নিকট এ-বিষয়ের মীমাংসা করিয়া আসি।” লক্ষ্মী ভাবিলেন, ‘শ্রীবৎস—যিনি ন্যায়ের

প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি, যিনি ধর্ম্মৈকাশ্রয়, তাঁহাকেও আবার শনির দর্শন লাভ করিতে হইবে।' কিন্তু আত্মমর্য্যাদার মোহে তিনি সেই পবিত্রপ্রাণ রাজার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিলেন না। ভাবিলেন, 'বিধিলিপি যে মানবের অখণ্ডনীয়।'

রাজা শ্রীবৎস রাজসভায় বিচারকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। সভাসদ্‌গণ সকলেই রাজার গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও ন্যায়বিচার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, এমন সময় লক্ষ্মী ও শনি রাজসভায় উপস্থিত হইলেন।

সহসা দ্যুলোকবাসিনী ইন্দিরা ও সূর্য্যপুত্র শনৈশ্চরকে সভায় আগমন করিতে দেখিয়া রাজা যথোচিত সৎকার করতঃ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা স্বর্গধাম পরিত্যাগ করিয়া কিহেতু এই ধরণীতে আগমন করিয়াছেন?" শনি বলিলেন, "শ্রীবৎস, 'কে বড়' ইহা লইয়া আমাদের মধ্যে একটা বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে। তোমার নিকট ইহার মীমাংসা হইবে জানিয়া আমরা এখানে আসিয়াছি। তুমি ইহার সমুচিত মীমাংসা করিয়া দাও।"

শ্রীবৎস বলিলেন, "দেব, দেবতার বিচার মানবে করিবে? এ যে অসম্ভব কথা!"

শনি। রাজন্, শক্তিমান্ মানব দেবতা হইতে কম কিসে? তোমার সে শক্তি আছে। সুতরাং তুমি আমাদের এই মীমাংসা করিয়া দিতে সমর্থ হইবে, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রীবৎস। দেব, আমি এ প্রহেলিকা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। দেবতার বিবাদের মীমাংসা মানবে করিবে কিরূপে? ক্ষুদ্রজ্ঞান মানব কিরূপে দেবতার দেবত্ব উপলব্ধি করিবে?

শনি। শ্রীবৎস, চিন্তিত হইও না। তুমি পরম ভাগ্যবান্। জ্ঞানময়ী, শক্তিময়ী নারী তোমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী

দেবীরূপে শোভা পাইতেছেন। তুমি এমন পতিপ্রাণার স্বামী হইয়া এক নবীন জগতের রাজা হইয়াছ। তুমি দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ—শক্তিময়ী নারীর সতীত্ব-প্রভাবে তুমি দেবতার সমকক্ষ হইয়াছ।

শনির কথা শুনিয়া রাজা শ্রীবৎস অতীব বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "দেব, সহসা এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিতে আমি অসমর্থ। আজ ভাল করিয়া চিন্তা করিতে আমায় অবসর দান করুন। দয়া করিয়া আজ আপনারা দীনের কুটীরে অপেক্ষা করুন। কল্য আমি এ বিষয়ের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।"

শনি। তাই হউক, কিন্তু এখন আমরা স্বর্গে গমন করিতেছি। বিশেষ কারণে আজ আমরা তোমার আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

শ্রীবৎস। হে ছায়ানন্দন, অয়ি সিন্ধুতনয়ে, দেবতার নিবাস এই দুঃখসঙ্কুল পৃথিবী নহে, জানি। কিন্তু দেবতাগণের নিকট সদসৎ, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ জ্ঞান নাই। ভক্তের দ্বারাই তাঁহাদের মর্য্যাদা বাড়ে। ভক্তের প্রদত্ত তুচ্ছ পুষ্পাঞ্জলিও স্বর্গীয় অম্লান কুসুমের পার্শ্বে দেবতার চরণে স্থানপ্রাপ্ত হয়।

শনি। শ্রীবৎস, তোমার এই দীনতা ও শালীনতা দর্শনে আমি অতীব প্রীত হইয়াছি। কিন্তু মীমাংসকের নিকটে বিচারপ্রার্থীর আতিথ্য গ্রহণ ন্যায়বিগর্হিত। যেহেতু সংসর্গ ও পরিচয়ে পক্ষপাতিত্ব আসিয়া পড়ে। সুতরাং তোমার আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারিলাম না বলিয়া কিছু মনে করিও না।

তখন কমলা বলিলেন, "শ্রীবৎস, তোমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলাম বলিয়া দুঃখিত হইও না। সূর্য্যনন্দন যাহা বলিলেন,

তাহা অতি সত্য। আমরা এখন নিজ নিজ লোকে প্রস্থান করি। আগামী কল্য প্রাতে আবার তোমার নিকট উপস্থিত হইব।"

রাজা শ্রীবৎস বড়ই বিপন্ন! দেবতায় দেবতায় বিবাদ, আর সামান্য মানুষ সেই বিবাদের মীমাংসক—বড়ই গুরুতর কথা। ভাবিতে ভাবিতে রাজা সভাভঙ্গের আদেশ দিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

৬

চিন্তা রাজার মুখমণ্ডল এক অন্তর্ভেদিনী চিন্তার কালিমায় মলিন দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাথ, আজ তোমাকে এত বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন? তুমি অন্তঃপুরে আগমন করিয়া সহর্ষে কথা কহিতেছ না। ললাটে যেন কি এক গভীর চিন্তার রেখা পড়িয়াছে, কামধনুনিন্দিত ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, নীলোৎপলগঞ্জিত চক্ষুর দৃষ্টি ঔদাস্যপূর্ণ। নাথ, কেন এ অনর্থসূচনা? তোমার প্রজাগণ ত কোন আধিব্যাধিতে পীড়িত নহে? রাজ্য ত কোন শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হয় নাই?"

শ্রীবৎস বলিলেন, "দেবি, যদিও এখন তেমন কোনও গুরুতর অনিষ্ট উপস্থিত হয় নাই, তথাপি দারুণ দুরদৃষ্ট যেন আমার সোনার রাজ্যকে, তৎসহ আমাকে এবং তোমাকে গ্রাস করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। দেবি, আমি ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেছি না।"

এই বলিয়া শ্রীবৎস চিন্তাদেবীকে সকল কথা বিবৃত করিলেন। চিন্তা রাজার নিকট হইতে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত অবগত হইয়া বলিলেন, "নাথ, এই সামান্য বিষয়ের মীমাংসার জন্য তুমি কেন এত চিন্তাকুল হইয়াছ? ভাবনা ত্যাগ কর, আমি ইহার সমাধান করিয়া দিব।"

রাজা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "দেবি, বল কি? আমার মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রী যে কঠিন ব্যাপারের নিষ্পত্তির পথ খুঁজিয়া পান

নাই, শত শত সভাসদ্ যে গুরুতর বিষয়ে মাথায় হাত দিয়া ভাবিয়াছেন, এমন কি আমি এতক্ষণ চিন্তা করিয়াও যাহার মীমাংসা খুঁজিয়া পাই নাই, এমন গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা অন্তঃপুরিকা তোমার দ্বারা সমাহিত হইবে ?”

চিন্তা বলিলেন, “নাথ, এ ত সামান্য কথা, ইহার নিষ্পত্তি অতীব সহজ। বেলা বেশি হইয়াছে। স্নানাহার সমাধা কর। তুমি নিশ্চয় জানিও আমি ইহার মীমাংসা করিয়া দিব।” ইহা শুনিয়া রাজার বক্ষ হইতে একটা গুরুভার অপনীত হইল।

রাজা স্নানাহার সমাপন করিয়া পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন। চিন্তাদেবী চরণোপান্তে বসিয়া ব্যজনী হস্তে ব্যজন করিতেছেন। এমন সময়ে রাজা সহসা বলিয়া উঠিলেন, “চিন্তা, তুমি কিরূপে এতাদৃশ কঠিন সমস্যার নিষ্পত্তি করিবে আমি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। আমার সকল অবসরের মধ্যে ঐ এক ভাবনা উত্থিত হইতেছে। তুমি এখন সেই কথা বলিয়া আমার বেদনাতুর প্রাণকে শান্ত কর।”

চিন্তা বলিলেন, “নাথ, কেন এত ভাবিতেছ ? তোমাকে একটি কথাও কহিতে হইবে না। দেবতার বিচার দেবতারা নিজেই করিবেন। কাল শনি ও লক্ষ্মীর আগমনের পূর্ব্বে তোমার সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে একখানি স্বর্ণনির্ম্মিত ও বামপার্শ্বে একখানি রজতময় সিংহাসন রাখিয়া দিও। শনি ও লক্ষ্মী রাজসভায় উপস্থিত হইলে তাঁহাদের মধ্যে যিনি বড়, তিনিই গৌরবজনক আসনে উপবেশন করিবেন। তোমাকে কোন কথা কহিতে হইবে না—কারণ সম্মান সকলকেই নিজের আসন দেখাইয়া দেয়, বিশেষতঃ তাঁহারা দেবতা।”

রাজা চিন্তার এই চতুরতাপূর্ণ বাক্যাবলি শ্রবণগোচর করিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইয়া বলিলেন, “দেবি, আমার হৃদয়রাজ্যের রাণি, তুমি কি মূর্ত্তিমতী মীমাংসা অথবা আমার পূর্ব্বজন্মের মূর্ত্তিমতী

সুকৃতি! আজ তুমি মানবীরূপে স্নেহহস্তে আমার সঙ্কট মোচন করিয়া আমাকে প্রেমপূর্ণ নবীন জগতের রাজা করিয়াছ।”

চিন্তা একটু হাসিয়া বলিলেন, “এখন ও পাণ্ডিত্য রাখ। ইহাতে অনেক ভাবিবার কথা আছে। তুমি সহজে ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। আত্মপ্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী দেবদেবী স্বয়ং এই বিবাদের মীমাংসা করিলেও যিনি লোকসমক্ষে লজ্জাপ্রাপ্ত হইবেন, নিশ্চয়ই তাঁহার গভীর রোষ তোমারই উপর পড়িবে। সর্ব্বনাশ যেন আজ দেবদেবীর মূর্ত্তি ধরিয়া তোমার পুরোভাগে ক্রীড়াশীল! কিন্তু সে জন্য এখন ভাবিয়া কাজ নাই।”

রাজা এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তিত লইয়া উঠিলেন। সেই দুগ্ধফেননিভ শয্যা তাঁহার নিকট কণ্টকসঙ্কুল বোধ হইতে লাগিল। করুণারূপিণী চিন্তাদেবীর হস্তসঞ্চালিত তালবৃন্তের মৃদু বাতাস যেন অনলতপ্ত বোধ হইতে লাগিল। তিনি লজ্জিত দেবতার আসন্ন রোষ কল্পনা করিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন।

প্রেমকুশলা চিন্তাদেবী রাজার কাতরতা অনুভব করিয়া বলিলেন, “রাজন্, খেদ পরিত্যাগ কর। বিপদে অধীর হওয়া কখনই তোমার ন্যায় স্থিরধী পুরুষের উপযুক্ত নহে। বিপদে অভিভূত হইয়া পড়িলে সেই বিপদ আরও জড়াইয়া ধরে। এই দুঃখদগ্ধ ধরণীতে ধৈর্য্যের অস্ত্র ধারণ করিয়া মানুষকে বিপদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। তুমি রাজা, প্রজার প্রত্যক্ষ দেবতা, দেশের কল্যাণ, সাধুর আদর্শ। ভবিষ্যৎ কল্পনায় অধীর হওয়া তোমার উচিত নহে। বিধাতা অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইবেই। ভবিষ্যতের সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি মানুষের নাই। যেহেতু মানুষ কর্ম্মফলের দাস। প্রত্যেক কার্য্যই মানুষের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলের সূচনা করে মাত্র।”

রাজা চিন্তাদেবীর মঙ্গলপূর্ণ কথাগুলি শুনিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইয়া বলিলেন, “চিন্তা, তুমি মানবী নও? তুমি যেন সাক্ষাৎ

দেবীপ্রতিমা। তুমি এই মায়াকলুষিত পৃথিবীতে তত্ত্বজ্ঞানের অপূর্ব্ব মাধুরী লইয়া শোভা পাইয়াছ। আমার বহু পুণ্য ছিল, সেই পুণ্যফলে তোমার মত জ্ঞানময়ী সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছি।”

ক্রমে বেলা শেষ হইল। বিশ্বপতি প্রকৃতির ললাটে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের সিন্দূরবিন্দু পরাইয়া দিলেন। কুসুমকুল সৌরভের উৎস খুলিয়া দিল। বিহঙ্গগণ সান্ধ্য বন্দনা আরম্ভ করিল। দেবালয়ে আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠিল। রাজা সন্ধ্যাবন্দনার জন্য পূজাগৃহে গমন করিলেন।

৭

শ্রীবৎস শয্যা পরিত্যাগ করিয়া রজনীশেষের প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভার মধ্যেও যেন কি এক অভাব দেখিতে পাইলেন। প্রকৃতির এই নবীন রঙ্গমঞ্চে যেন সমস্তই তাঁহাব নিকট ‘সুরহীন’ বোধ হইতে লাগিল।

ক্রমে বেলা হইল। শ্রীবৎস রাজবেশ পরিধান করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। রাজসিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে একখানি স্বর্ণময় ও বামপার্শ্বে একখানি রজতময় সিংহাসন স্থাপিত হইল। মধ্যস্থলে সমহিষী রাজা শ্রীবৎস উপবেশন করিয়া রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

এমন সময়ে শনি ও লক্ষ্মী তথায় উপস্থিত হইলে মহিষীর সহিত রাজা শ্রীবৎস সিংহাসন ছাড়িয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং সবিনয়ে উভয়ের চরণে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। শনি যদৃচ্ছাক্রমে রাজসিংহাসনের বামপার্শ্বস্থ রজতময় সিংহাসনে ও লক্ষ্মী দক্ষিণপার্শ্বস্থ স্বর্ণময় সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। রাজা ও রাণী যথাক্রমে শনি ও লক্ষ্মীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

বহুবিধ কথাবার্ত্তার পর শনি বলিলেন, "মহারাজ, তোমার অভ্যর্থনায় সবিশেষ তৃপ্ত হইয়াছি। বোধ হয়, অতঃপর তুমি আমাদের বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া দিবে।"

শ্রীবৎসের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। দারুণ বিপৎপাত উপলব্ধি করিয়া তাঁহার মুখ হইতে আর বাক্য নিঃসরণ হইল না। তখন শনি আবার বলিয়া উঠিলেন, "কই মহারাজ, তোমার নিকট হইতে এ বিষয়ের কোনও সদুত্তর পাইতেছি না কেন? তুমি কল্য বলিয়াছিলে, অদ্য তাহার মীমাংসা করিবে, এখন তোমার সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর।"

রাজা বুঝিলেন সর্ব্বনাশ ঘনাইয়া আসিয়াছে, সুখের সংসারে আগুন লাগিয়াছে, আর চিন্তার অবসর নাই! এইরূপ ভাবিয়া শুষ্কমুখে বলিলেন, "দেব, মানুষ হইয়া দেবতার বিচার কি করিবে? মানুষের সে ক্ষমতা কোথায়? যাহা হউক যখন আপনারা আমাকে সে ক্ষমতা দিয়াছেন, তখন আমার মতে আপনারাই বিচার করুন, আপনাদের মধ্যে কে বড়।"

শনি বলিলেন, "মহারাজ, চতুরতায় কার্য্যসিদ্ধি হয় না। তোমার বাক্‌পটুতার পরীক্ষার জন্য আমি এস্থলে আসি নাই। যদি ইহার সমাধান তোমার অসাধ্য হয়, তাহা হইলে প্রথমে বলিলেই আমরা সুখী হইতাম। কল্য হইতে তবে কেন এত বাক্যজাল বিস্তার করিতেছ?"

শনির কথা শুনিয়া শ্রীবৎসের চমক ভাঙ্গিল। বুঝিলেন, তাঁহার এই দীনতায় আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী শনৈশ্চরের সন্তুষ্টিলাভের সম্ভাবনা নাই। এই ভাবিয়া রাজা সবিনয়ে বলিলেন, "সূর্য্যনন্দন, এই বিশাল জগৎ এক অজ্ঞেয় প্রীতির আকর্ষণে চলিতেছে। এখানে প্রীতির আকর্ষণ শাসনের ভ্রূকুটি হইতে অধিকতর শক্তিমান্। এ জগতে যিনি প্রীতিদান করিতে পারেন তিনিই বড়। শাসনে

মানুষকে বশ করা যায় না, স্নেহের ছায়াতেই মানুষ ধন্য হয়। এখন আপনিই বিচার করুন, আপনাদের মধ্যে কে বড়।"

শ্রীবৎসের এই কথায় শনির ক্রোধ আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল! তিনি অধিকতর কর্কশস্বরে বলিলেন, "মহারাজ, আমরা তোমার নিকট ন্যায়ের বিচার করিতে আসি নাই। পরিষ্কার করিয়া বল— শনি বড়, কি লক্ষ্মী বড়!"

শ্রীবৎস। দেব, এ বিষয়ের মীমাংসা আপনারা নিজেই করিয়াছেন। আপনারা যদি এখন নিজের আসনের দিকে লক্ষ্য করেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, আপনাদের মধ্যে কে বড়।

শনি। মহারাজ, আমরা তোমার অতিথিরূপে রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছি। তোমার প্রদত্ত আসনে আমরা যদৃচ্ছাক্রমে উপবেশন করিয়াছি, ইহাতে কে বড়, কে ছোট ইহার মীমাংসা হইতেই পারে না। তুমি পরিষ্কার করিয়া আমাদিগকে বল।

শ্রীবৎস। দেব, সাধারণতঃ অবস্থান ও আসন ভেদে বড় ছোটর বিচার হয়। যিনি বড়, তাঁহার আসন মূল্যবান্ ও দক্ষিণপার্শ্বে সংস্থাপিত হয়। আপনি কমলাকে স্বর্ণময় আসনে ও আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান দান করিয়াছেন, সুতরাং ইহার বিচার আর আমি কি করিব? সৌরে, জগতের ধর্ম্মই এই যে, উচ্চতমের নিকট সকলেই অবনত-মস্তক। তুষারকিরীট হিমাচল সে-ও অনন্ত মহিমময়ের নিকট প্রণিপাতচ্ছলে অবনতশিরে রহিয়াছে। সুউচ্চ বনস্পতি, সে-ও প্রকাণ্ড মহীধরের নিকট নম্রশির।

শনি শ্রীবৎসের এই বিনয়পূর্ণ কথাতেও সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। সিংহগর্জ্জনে বলিয়া উঠিলেন, "বুঝিয়াছি মহারাজ, তোমার

চতুরতাপূর্ণ মীমাংসা। প্রকারান্তরে আমার অবমাননাই তোমার এইরূপ চাতুরী বিস্তারের মুখ্য উদ্দেশ্য। দেখা যাউক, তুমি কি প্রকারে নিজত্ব রক্ষা কর। জান মহারাজ, আমার ইচ্ছায় সুখের মন্দিরে হাহাকার উঠে, বিলাসের কেলিকানন প্রেতের তাণ্ডব-নৃত্যে ভীষণ হয়। তুমি আমাকে যেরূপ অপমানিত করিলে আমিও তোমার সহিত তেমনি ব্যবহার করিব। মহারাজ, নিশ্চয় জানিও, আমার দৃষ্টি তোমার উপর পূর্ণমাত্রায় নিপতিত হইবে।"

তখন কমলা মৃদুমধুরস্বরে বলিলেন, "শ্রীবৎস, চিন্তিত হইও না। আমি তোমার জীবনে চিরসঙ্গিনী রহিলাম। সুখে, দুঃখে, কর্ত্তব্যে লক্ষ্য স্থির রাখিও। দেখিবে, অশান্তি তোমার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিবে না।" এই বলিয়া তিনি সস্নেহে রাণী চিন্তার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "মা চিন্তা, ধন্যা তুমি। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার ব্রত পূর্ণ হউক। স্বামীর জীবনকে মঙ্গলের পথে লইয়া যাইতে তোমার চেষ্টা ফলবতী হউক। আজ তোমরা আমাকে যে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছ, তাহা কিছুতেই ছিন্ন হইবে না।"

তখন চিন্তা বলিলেন, "মা, বিপৎসঙ্কুল পৃথিবীতে মানুষ মায়া-মোহের আবর্ত্তে চিরঘূর্ণ্যমান। সহায় একমাত্র দেবতার পুণ্যাশিস্। আশীর্ব্বাদ কর, যেন দেবতার চরণে বিশ্বাস রাখিয়া চলিতে পারি। সুখ ও দুঃখ ত কিছুই নয়। সে কেবল বুঝিবার ভ্রমমাত্র। প্রাণ যেন সুখে আত্মহারা বা দুঃখে অশান্ত না হয়। এই প্রার্থনা, সংসার-সাগরে দুর্দ্দশার অন্ধকার যখন লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে প্রয়াস পাইবে, তখন তোমার পুণ্যাচরণ যেন ধ্রুবতারার মত আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করে।"

লক্ষ্মী বলিলেন, "মা চিন্তা, বৎস শ্রীবৎস, দুঃখ ত্যাগ কর। কর্ম্ম-ভূমিতে কর্ম্মের সাধনাই গৌরবলাভের প্রধানতম উপায়। ইহাই তোমাদের জীবনের মূলমন্ত্র হউক।" এই বলিয়া তিনি সহসা অন্তর্হিত হইলেন।

লক্ষ্মী ও শনি বিদায় গ্রহণ করিলে রাজসভা কিছুকালের জন্য গম্ভীর হইয়া উঠিল। জনবহুল রাজসভায় যেন সামান্য সূচীপতনের শব্দ শুনা যায়। সহসা সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া রাজা প্রধান মন্ত্রীকে বলিলেন, "মন্ত্রিবর, দেখিলেন দেবতার লীলা, এখন কর্ত্তব্য কি বলুন ?"

মন্ত্রী বলিলেন, "রাজন্, সকল বিষয়ে দৈবই বলবান্। অদৃষ্টের সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি মানুষের নাই। আপনার নিয়তিতে যদি শনির ভোগ থাকে, তবে তাহা ভোগ করিতেই হইবে। সে জন্য আর চিন্তা করিয়া কি হইবে ?"

সভার তাবৎ লোক রাণী চিন্তার বুদ্ধির প্রাখর্য্য এবং শনি ও কমলার উক্তি ভাবিতে ভাবিতে গৃহে গমন করিল।

এত বড় যে অনর্থপাত হইল, রাণীর তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই। তিনি ভাবিলেন, কিসের দুঃখ! মানুষের অদৃষ্টে বিধিলিপি যে অখণ্ডনীয়। বিধাতা অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন তাহা ভোগ করিতে হইবেই! তজ্জন্য আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতে হইবে। এজন্য চিন্তা নয়—আয়োজন করিতে হইবে—হৃদয়কে বলীয়ান্ করিতে হইবে; কর্ত্তব্যজ্ঞানকে মাথায় করিয়া পৃথিবীর সমস্ত অভাব-অভিযোগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াই প্রকৃত বীরত্ব।

রাজা চিন্তার এইরূপ স্থৈর্য্য ও আত্মবিশ্বাস দেখিয়া অতীব প্রীত হইলেন। ভাবিলেন, যখন এই মহিমময়ী সতী আমার পার্শ্বে, তখন জাগতিক অনন্ত যন্ত্রণাকে আমি অবিকৃত মুখে আলিঙ্গন করিতে সাহস করি।

৮

সে বৎসর দেশে শস্য জন্মিল না। প্রজাকুল অনশনে মরিতে লাগিল। রাজভাণ্ডারস্থ শস্য নিরন্ন প্রজাকুলের মধ্যে বিতরিত হইল, কিন্তু পর বৎসরেও সেইরূপ অবস্থা। তখন রাজা অজস্র অর্থব্যয়ে

বিভিন্ন রাজ্য হইতে খাদ্যদ্রব্য আনাইয়া নিরন্ন প্রজাকুলের মধ্যে বিতরণ করিলেন। তাহাতে প্রজাগণের কষ্টের অনেক লাঘব হইতে লাগিল বটে, কিন্তু উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর অনাবৃষ্টি ও শস্যহীনতার জন্য দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। দস্যুতস্করের দল গঠিত হইল; প্রাণরক্ষার্থ সকলে ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হইয়া অপরের দ্রব্যাদি অপহরণ করিতে সঙ্কুচিত হইল না। রাজার কোষাগার অর্থশূন্য হইল—এবার প্রজাকুল অনশনে মরিতে লাগিল। দেশে রক্তবৃষ্টি আরম্ভ হইল, চারিদিকেই দুর্লক্ষণ, দেশ মরুভূমি। কোথাও একটু ছায়া বা শীতলতা নাই, চারিদিক খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। ক্ষুধার যন্ত্রণায় লোকে যা-তা আহার করিয়া পীড়িত হইতে লাগিল। দেশে মড়ক উপস্থিত হইল। অসংখ্য প্রজা অকালে মানবলীলা সংবরণ করিতে লাগিল।

দেশের এই অবস্থা দেখিয়া রাজারাণীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। রাজা বলিলেন, "রাণি, এ দৃশ্য আর দেখিতে পারি না। পুত্রসম প্রজাকুলের এই মর্ম্মভেদী চীৎকার, দেশের এই করাল দৃশ্য আমার অন্তস্তল বিদ্ধ করিতেছে। দেবি, সর্ব্বোপায়ে এ স্থান পরিত্যাগ করা উচিত।"

রাণী বলিলেন, "মহারাজ, আমিও এ শ্মশানদৃশ্য আর দেখিতে পারি না। তবে কোথায় যাইবার পরামর্শ করিতেছ বল?"

রাজা বলিলেন, "রাণি, আমার ইচ্ছা, তুমি এখন কিছুদিনের জন্য পিত্রালয়ে যাও। আর আমি, যেখানে শান্তি পাইব—নদীতীরে, প্রান্তরে, নিবিড় অরণ্যানীতে যেখানে শান্তি পাইব তথায় গমন করিব। শনির দৃষ্টি দ্বাদশ বৎসর থাকে। দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইলে আমার আবার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে—তখন দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইব। তুমি তত দিন পিতৃগৃহে অবস্থান কর। কেন এ অদৃষ্টতাড়িত নিরুদ্দেশগতি হতভাগ্যের পার্শ্বচারিণী হইয়া কষ্ট পাইবে?"

রাণী শুনিয়া কাতর হইয়া বলিলেন, "না মহারাজ, তাহা হইবে না। স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর অন্য আশ্রয় নাই। আমি তোমার সহিত বনে ভ্রমণ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করিব না। হতাশা বা অবসাদেব মধ্যে একে অন্যের আশ্রয়রূপে থাকিয়া হৃদয়ে বল পাইব। মহারাজ, আমাকে সে আদেশ করিও না।"

রাজা। রাণি, বনভূমি অতি দুর্গম, বন্ধুর ও কঙ্করময়। তুমি সে-পথে চলিতে পারিবে না।

রাণী। না মহারাজ, তাহাতে আমার কোন কষ্টই হইবে না। বরং যদি তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন কর, তাহা হইলে আমি সমধিক যন্ত্রণা পাইব। আরও মহারাজ, তুমি কি আমাকে কেবল সুখের কপোতী তুল্য মনে কর? তোমার সুখেই আমার সুখ, আর তোমার দুঃখ সে-ও ত আমারই। তজ্জন্য সুখকে বরণ করিয়া তৃপ্ত হইব, আর দুঃখকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ঘোর অধর্ম্ম সঞ্চয় করিব এই কি স্ত্রীর কর্ত্তব্য? রাজন্, তুমি কি আমাকে এতই হীন মনে করিতেছ? জানি মহারাজ, তুমি পরমধার্ম্মিক ও বিবেকী, কিন্তু রাজ্যের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তোমার মানসিক ভাবেরও কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে? নচেৎ এমন স্নেহময় প্রাণে অনাদর ও কর্কশতার ছায়া কেন? তুমি যাহাকে এত ভালবাস, কেন আজ তাহার এত অনাদর? মহারাজ, অল্পবুদ্ধি নারী আমি, যদি ভ্রমক্রমে তোমার উপর কোন অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি ক্ষমা কর। নাথ, মৎস্যকে জল হইতে তুলিয়া সুকোমল রাজসিংহাসনে স্থাপিত করিলে কি তাহার প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করা হয়? তুমি জ্ঞানগুরু বৃহস্পাতি সদৃশ। তোমার নিকট কোন কথা বলি, আমার এমন কোন শক্তি নাই।

তথাপি বলি যে, আমাকে পিতৃগৃহে যাইবার আদেশ করিও না। স্বামীর সঙ্গে ছায়ার মত থাকাই স্ত্রীর সৌভাগ্য; স্বামীর ক্লেশের ঘর্ম্ম অঞ্চলের বাতাসে দূর করাই স্ত্রীর কর্ত্তব্য। দয়া করিয়া আমার সেই সৌভাগ্য ও কর্ত্তব্যের অধিকার অপহরণ করিও না।

রাজা আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। বলিলেন, "চিন্তা —আমার জীবনাধিক চিন্তা, চল তুমি আমার সঙ্গে। আমার কার্য্যে সাধনা, হতাশায় আশ্বাস, জীবনে অনুরাগ, চল দেবি, চল তুমি আমার সঙ্গে! আমি তোমাকে আর কোন কথা বলিব না। বুঝিলাম, শক্তি-অংশসমুদ্ভূতা নারী সুখ-সরোবরে প্রস্ফুটিতা কমলিনী—আবার দুঃখসাগরে একমাত্র আশ্রয়রূপিণী তরণী।"

রাণীর কল্পিতবিরহমলিন আননে আবার হাসির আলোক ফুটিয়া উঠিল।

রাজা বলিলেন, "রাণি, এ শোক-দৃশ্য আর দেখিতে পারিতেছি না। চল, অদ্যই আমরা এই স্থান পরিত্যাগ করি। কিছু ধনরত্ন সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে, সঙ্গে কিছু অর্থ থাকিলে কষ্ট লাঘব হইবার সম্ভাবনা।"

৯

অন্ধকারময়ী রজনী! পৃথিবী নিদ্রাদেবীর কোলে সুষুপ্তা। চারিদিক নিস্তব্ধ, মধ্যে মধ্যে দুই একটা রাত্রিচর পক্ষীর পক্ষতাড়ন শব্দ ও সুদূর নগরপ্রান্তে শৃগালের চীৎকারধ্বনি সেই স্থিরা রজনীর নীরবতা ভঙ্গ করিতেছে। রাজা ও রাণী এমন সময়ে রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া নগরের প্রান্তদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। কোথায় যাইবেন স্থিরতা নাই—তথাপি চলিয়াছেন। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে রাজার মাথায় ধনরত্নের একটি পুঁটলী। আর রাণী চিন্তা স্বামীর

হস্ত ধারণ করিয়া চলিতেছেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। রাজার প্রাণে বিস্ময়—রাণীর প্রাণে আশঙ্কা, জানি না আজ অদৃষ্টে কি আছে!

রাজা ও রাণী সহসা শুনিলেন, এক মধুর নূপুর-শিঞ্জন। সেই বনপথে এই গভীর অন্ধকারময়ী রজনীতে এই প্রান্তরে কার এ নূপুরশিঞ্জন! রাজা ও রাণী দেখিলেন একটি বালিকা স্বর্গীয় কিরণে পথ আলো করিয়া তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছে।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে মা তুমি, এই অন্ধকার রজনীতে আমাদের অবলম্বিত পথ আলো করিয়া চলিয়াছ?"

বীণাবিনিন্দিত স্বরে উত্তর হইল "শ্রীবৎস, আমি লক্ষ্মী। আমি চিরদিন তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছি। এই অন্ধকারে তোমরা পথহারা হইয়া কষ্ট পাইতেছিলে, তাই আমি তোমাদিগকে পথ দেখাইবার জন্য আসিয়াছি।"

শ্রীবৎস বলিলেন, "মা, সত্যই আমি পথহারা, এ জীবনের পথ কি আমার চিরদিনের জন্য হারাইয়াছে মা?"

লক্ষ্মী বলিলেন, "না বৎস, তুমি পথহারা হও নাই। পার্শ্বে ঐ যে আলোকবর্ত্তিকা রহিয়াছেন তিনিই তোমাকে পথ দেখাইবেন। হতাশ হইও না, কর্ত্তব্য স্থির কর। গ্রহপীড়ায় কাতর হওয়া পুরুষের লক্ষণ নহে। ভবিষ্যতের সহিত যুদ্ধ করিয়া মানুষকে অসাধ্যসাধন করিতে হয়। তুমি এই শক্তিময়ীর সাহায্যে অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ। বৎস, অধিক কি বলিব, তোমার এই সাধনা কখন্ পূর্ণ হয় তাহা দেখিবার জন্য সুরবালাগণ সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন। বৎস, আক্ষেপ করিও না। গ্রহপীড়া হরণ করিতে বিধাতার সাধ্য নাই। তোমাকে দ্বাদশ বর্ষ এই পীড়া ভোগ করিতেই হইবে, তজ্জন্য আত্মহারা হইও না। প্রতিমুহূর্ত্ত শুভ অবসরের প্রতীক্ষায় যাপন কর।"

এমন সময়ে চন্দ্র উদিত হইল। কৃষ্ণপক্ষীয় নিশাকরের ক্ষীণ কিরণে পথ ঘাট আলোকিত হইল। লক্ষ্মী বলিলেন, "শ্রীবৎস, এখন আলো হইয়াছে, তোমরা তোমাদের অবলম্বিত পথ বেশ দেখিতে পাইতেছ ; এবার আমি চলিলাম, কিন্তু বৎস, সম্মুখে ভীষণ প্রহেলিকা, সাবধান হইও।" এই বলিয়া লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইলেন।

রাজা ও রাণী সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যদেশ দিয়া গমন করিতে করিতে দেখিলেন, সম্মুখে এক ভীষণ নদী তরঙ্গ-বাহু তুলিয়া উদ্দাম-গতিতে ছুটিয়াছে।

পার হইবার কোন উপায় নাই দেখিয়া রাজা ও রাণী বিষণ্ণমনে নদীতীরে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, এক বৃদ্ধ নাবিক একখানি ভগ্ন তরণী বাহিয়া সেই স্থানে উপনীত হইল। রাজা বলিলেন, "ওহে নাবিক, তুমি আমাদিগকে এই নদী পার করিয়া দিতে পার ?"

নাবিক। তুমি এ নদী পার হইতে সাহস কর ?

রাজা। কেন নাবিক, তুমি এরূপ অসম্ভব কথা বলিতেছ ? নদী-পার ত সকলেই হয়। তাহাতে আবার সাহস কি ?

নাবিক। নদীপার সকলেই হয়। কিন্তু অদৃষ্টনদী পার হইতে কি সকলে পারে ? এই বলিয়া সে সহসা গান ধরিল—

"বইছে যে এ ভবের নদী নীল আকাশের তলে—
উঠ্‌ছে এতে রঙ্গ কত ঘূর্ণীপাকের জলে।"

রাজা বলিলেন, "ওহে নাবিক, দেখিতেছি তুমি অতি জ্ঞানবান্। ভ্রান্ত আমরা সকল সময়ে সব কথা বুঝিতে পারি না। তাই হাবুডুবু খাইয়া মরি।"

নাবিক বলিল, "হাবুডুবু খাইতে বসিয়াছ, এখন অনুশোচনা কেন ? যদি নদীপারের ইচ্ছা থাকে তবে অবিলম্বে আইস।"

রাজা ও রাণী বিষণ্ণমনে নদীতীরে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন,
এক বৃদ্ধ নাবিক একখানি ভগ্নতরণী বাহিয়া সেই স্থানে
উপনীত হইল।

New Artistic Press, Calcutta

রাজা সেই রত্নের পুঁটলী লইয়া চিন্তার সহিত অগ্রসর হইলেন।

নাবিক বলিল, "আমার এই ভাঙ্গা নৌকা. অতি কষ্টে দুইজন লোক পার করিতে পারি। ও পুঁটলীটা তোমরা সঙ্গে লইয়া গেলে আমার নৌকা ডুবিয়া যাইবে!"

রাজা বলিলেন, "ওহে নাবিক, এক কাজ কর। তুমি এই পুঁটলীটাই অগ্রে পার করিয়া রাখিয়া আইস। তাহার পর আমাদিগকে লইয়া যাইবে।"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল, "তাহাই হউক।"

রাজা সেই রত্নের পুঁটলীটা বৃদ্ধের হাতে তুলিয়া দিলেন। বৃদ্ধ মনের সুখে গান গাহিতে গাহিতে চলিল—

"বিধির লেখা মোছে না, সে জলের তিলক নয়—
শনির দৃষ্টি বার বছর বুড়ো নাবিক কয়!"

সহসা রাজা দেখিলেন, কোথায়-বা নদী, কোথায়-বা নাবিক, কোথায়-বা নৌকা আর কোথায়-বা রত্নপুঁটলী। চক্ষের পলকে সব মিলাইয়া গেল! রাজা শুনিতে পাইলেন ;—

"বিধির লেখা মোছে না, সে জলের তিলক নয়—
শনির দৃষ্টি বার বছর বুড়ো নাবিক কয়!"

তখন রাজা বলিলেন, "চিন্তা, নিশ্চয়ই সেই বৃদ্ধ নাবিক শনি! মায়া বিস্তার করিয়া আমার সযত্নসংগৃহীত রত্নজাল হরণ করিল! আর, তাহার জন্য দুঃখ কেন? আমি অদৃষ্টকে উপহাস করিতে বসিয়াছিলাম। কিন্তু উপহাসে ত বীরত্ব নাই—বীরত্ব সাধনায়।"

রাণী বলিলেন, "ধনরত্ন বিপদ্ দূর করে, প্রথমে এই ভাবনাটাই ঠিক হয় নাই। যাক্ বেশ হইয়াছে; নিরুপায় হইলেই হৃদয়ে বল বাড়ে, সাহস হয়। রাজন্, এখন কোথায় যাইবে?"

রাজা বলিলেন, "কোথায় যাব দেবি, চল ঐ যে অদূরে শ্যামল বনভূমি দেখিতেছি, ঐ দিকে গমন করি।"

রাণী বলিলেন, "চল মহারাজ, বনের মত প্রাণারাম আর কিছু নাই। তাহা কোমলে মধুরে কেমন প্রীতিকর, ভাবে রসে কেমন প্রাণারাম, সৌন্দর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে কেমন বিরাট্। চল নাথ, ঐ বনেই প্রবেশ করি।"

১০

রাজা ও রাণী কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সেই বনভূমি নানাজাতীয় ফলবৃক্ষে পূর্ণ। ক্ষুধিত শ্রীবৎস বনফল সংগ্রহ করিয়া এক সরিত্তীরে উপস্থিত হইলেন এবং সেই বনফল ভক্ষণ ও নদীর নির্ম্মল জল পান করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। রাণী চিন্তাও স্বামীর আদেশে কিছু বনফল ভোজন ও বারি পান করিলেন। এইরূপ তাঁহারা অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও শান্তচিত্ত হইয়া নানাপ্রকার কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। রাণী বলিলেন, "মহারাজ, ভগবানের দান অনন্ত, অদৃষ্টের বিচার তাঁহার নিকট নহে। সেই বিশ্বরাজ জীবের জন্য তাঁহার করুণার অনন্ত উৎস খুলিয়া রাখিয়াছেন। তিনি তাঁহার সৃষ্ট বনফল, নদীনীর, মারুতহিল্লোল, সুনীল আকাশের নির্ম্মলতা, কুসুম-সৌরভ, পক্ষিকাকলি, সকল জীবের সমভাবে উপভোগ্য করিয়াছেন। তবে যে জীব সকল সময়ে তাহা ভোগ করিয়া নিজের গ্লানি দূর করিতে পারে না সে তার অদৃষ্ট, সে অদৃষ্টের বিধাতা তিনি নহেন—আর একজন। রাজন্, ধিক্ আমাদিগকে, জগৎপিতার মঙ্গলময় কার্য্যে দোষারোপ করিয়া আমরা পাপের ভার বৃদ্ধি করি।"

রাজা। রাণি, তুমি অতি জ্ঞানবতী। এ-বিষয়ে তোমাকে আমি অধিক কি বুঝাইব। এই মায়াকলুষিত নরলোকে মানুষ

মায়ার বন্ধনে সর্ব্বদাই যন্ত্রণাকুল। এই জন্যই তাহারা অনেক সময়ে জগদীশ্বরের নিন্দা করে। কর্ম্মফলেই অদৃষ্টের সৃষ্টি। আর সেই অদৃষ্টের বিধাতা, ভূমা অনন্তের অংশ মাত্র।

রাণী। মহারাজ, তোমার কথায় আমার সমস্ত বিষয়ে বেশ জ্ঞান হইয়াছে। নাথ, অল্পবুদ্ধি নারী আমি। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে ভগবানের গূঢ় রহস্য বুঝাইয়া দাও।

রাজা। অয়ি মহিমাশালিনি, আমি তোমাকে কি বুঝাইব? তোমার হৃদয় যে অনন্ত জ্ঞানের আকাশস্পর্শী প্রাসাদ—আর আমার হৃদয় শুধু পার্থিব নীতিশাস্ত্রের ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীর। দেবি, তোমার সাহচর্য্যেই আমার হৃদয়ের বিকাশ হইয়াছে, আমি তোমার মত পত্নী লাভ করিয়া ধন্য—তৃপ্ত।

এইরূপ নানা কথাবার্ত্তায় অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইলে উভয়ে সেস্থান ত্যাগ করিয়া বনভূমির একাংশে এক কাঠুরিয়াপল্লীতে উপস্থিত হইলেন। বন্য কাঠুরিয়াগণ সেই দেবকল্প রাজা ও প্রত্যক্ষ মাতৃরূপিণী রাণীকে দেখিয়া বিনয়নম্রমস্তকে অভিবাদন করিল এবং সকলে বিশ্বস্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক রাজারাণীকে তথায় থাকিবার জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিল।

রাজা কাঠুরিয়াপল্লীতে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অদৃষ্ট-বিড়ম্বনায় সেই বনভূমি তাঁহার রাজ্য—আর সেই সরলোদার কাঠুরিয়াগণ তাঁহার সভাসদ্। এই বনভূমিতে আসিয়া শ্রীবৎসের কোন কষ্ট নাই। কিন্তু দারুণ অদৃষ্ট এখানেও বাদ সাধিল। এই দুঃখের বনবাসে এতটুকু সুখও শনির সহ্য হইল না।

একদিন এক কাঠুরিয়া নিকটস্থ পল্বল হইতে একটি শকুল-মৎস্য ধরিয়া আনিয়া রাজাকে উপহার দিল।

রাণী বলিলেন, "রাজন্, শুনিয়াছি দগ্ধ শকুল মৎস্য আহার করিলে শনির দৃষ্টি অপগত হয়। আজ তোমাকে এই মাছ পোড়াইয়া দি। তুমি তাহা ভক্ষণ কর।"

রাণী সেই শকুল মৎস্য পোড়াইয়া দেখিলেন, দগ্ধ মৎস্যে অনেক ছাই লাগিয়াছে। এজন্য তাহা প্রক্ষালনার্থ নিকটস্থ জলাশয়ে গমন করিলেন। দগ্ধ মৎস্য জলে ধৌত করিতেছেন সহসা তাহা সজীব হইয়া কৌতূহলাবিষ্ট রাণীর হস্ত হইতে পলাইল। রাণী ভাবিলেন, এ কি প্রহেলিকা! ক্ষুধিত স্বামীর অবিশ্বাস ও রোষাভাষ কল্পনা করিয়া রাণী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, সমস্তই শনির চাতুরী। যাহা হউক সত্যের পথে মানুষের বিপদ ঘটে না।

রাণী চিন্তাকুল হইয়া উদাসপ্রাণে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া ভগ্নস্বরে সমস্ত নিবেদন করিলে রাজা বলিলেন, "রাণি, এজন্য দুঃখ কেন? এ সমস্তই হতভাগ্যের প্রতি নিষ্ঠুর দেবতার বিদ্রূপের হাসি! নচেৎ কোথায় দগ্ধ মৎস্য সজীব হইয়াছে, আর তরঙ্গরঙ্গভীষণ খরপ্রবাহিণী স্রোতস্বিনীকেই বা নাবিক ও তরণীসহ অন্তর্হিত হইতে কে কবে দেখিয়াছে? যাহা হউক চিন্তিত হইও না। যদি তুমি আমার হৃদয় বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে বিষাদ পরিত্যাগ কর।"

স্বামীর অবিশ্বাসের কল্পনায় সতীর হৃদয় পুড়িতেছিল। স্বামীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাণী পুলকিত হইয়া ক্ষুধিত স্বামীর ভোজনের জন্য কিছু বনফল আনিয়া দিলেন। রাজারাণী একস্থানে বসিয়া নানাবিধ কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে এক বৃদ্ধ কাঠুরিয়া সে স্থানে উপনীত হইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, "কেন মহাশয়, এত কষ্ট পাইতেছ? চল আমাদের সহিত কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া আসিবে। তাহাতে তোমাদের আর কোন কষ্টই থাকিবে না।"

রাজা, রাণীকে বলিলেন, "এ পরামর্শ মন্দ নহে।" রাজা কাষ্ঠের ভার মাথায় করিয়া বাজারে বিক্রয় করিবেন শুনিয়া রাণীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। রাণী কোন কথা কহিতে পারিলেন না। রাজা বলিলেন, "দেবি, বুঝিয়াছি আমি তোমার মনের ভাব। কিন্তু রাণি, মানুষ ত এই পৃথিবীতে ধনৈশ্বর্য্য লইয়া আইসে নাই, যাইবার সময়েও তাহা লইয়া যাইতে পারিবে না। পৃথিবীর যত কিছু ঐশ্বর্য্য সকলই অন্তিম সময়ে তাহার পার্শ্বে পড়িয়া থাকিবে। সে এই পৃথিবীতে আগমনের পবিত্র দিবসে প্রেমময়ের নিকট হইতে যে প্রীতি লইয়া আসিয়াছিল, কর্ম্মভূমিতে কার্য্যসূত্রে সেই প্রীতির হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া তাহাই লইয়া যাইবে মাত্র। দেবি, কেন তবে এত অভিমান, এত সঙ্কোচ? জগৎপিতা আমার এই শ্রমসহিষ্ণু শরীর ও মন দিয়াছেন, এখানে পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ দোষের নয়, বরং তাহাতেই মহত্ত্ব।"

রাণী অশ্রুজল মার্জ্জনা করিয়া বলিলেন, "রাজন্, আমি সব জানি এবং বুঝি। তথাপি মহারাজ, মন বোঝে না! হৃদয় আকুল করিয়া শোকের প্রবাহ উঠিতেছে। ক্ষমা কর মহারাজ, বরং অনশনে মরিব তথাপি তোমাকে এতাদৃশ উঞ্ছবৃত্তি করিতে হইবে না।"

রাজা বলিলেন, "রাণি, উতলা হইও না। ইহাতে আমার কোন কষ্ট হইবে না। আমি তোমাকে পাইয়া শক্তিলাভ করিয়াছি। হৃদয়ে প্রচুর বল উপচিত হইয়াছে। দেবি, তোমার আয়তির অক্ষয় কবচ আমাকে সর্ব্বত্র জয়যুক্ত করিবে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

রাজা রাণীকে বুঝাইয়া বৃদ্ধ কাঠুরিয়ার সহিত বনে গমন করিয়া দেখিলেন, বনমধ্যে বহু চন্দনবৃক্ষ রহিয়াছে। রাজা সামান্য চন্দন কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া বাজারে লইয়া যান এবং সহচর কাঠুরিয়াগণ অপেক্ষা অধিক মূল্য প্রাপ্ত হন। এইরূপে কিছু দিনের মধ্যেই রাজার কিছু ধনাগম হইল।

একদিন রাণী বলিলেন, "মহারাজ, তুমি কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া যে অর্থ লাভ করিয়াছ তাহা হইতে প্রয়োজনীয় ব্যয় ব্যতীত আরও কিছু উদ্বৃত্ত হইয়াছে। তোমার আদেশ পাইলে এই অর্থের দ্বারা এই সকল কাঠুরিয়া ও কাঠুরিয়া-পত্নীগণকে একদিন ভোজন করাই।" রাণীর কথা শুনিয়া রাজা সহর্ষে সম্মতি দান করিলেন।

রাণী, রাজাকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য বলিলেন। রাজা তাহার আয়োজন করিয়া কাঠুরিয়াপল্লীর সমস্ত নরনারীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। কাঠুরিয়াগণের আনন্দের সীমা নাই। এতদিন তাহারা রাণীকে শুধু মা বলিয়া তৃপ্তি লাভ করিত, আজ তাহারা মাতৃদত্ত প্রসাদ লাভ করিবে ভাবিয়া অত্যন্ত পুলকিতচিত্তে রাজার কুটীরে আসিয়া নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

রাণী চিন্তা নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিলেন। যথাসময়ে নিমন্ত্রিত কাঠুরিয়া পুরুষ, স্ত্রী, বালক, বালিকা সকলেই ভোজন করিতে বসিল। রাজা নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন—রাণী চিন্তা যেন মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণারূপে অন্ন পরিবেষণ করিতেছেন।

রাজা ও রাণী সেই বিজন বনভূমির মধ্যে এক সুখের সংসার পাতিয়া বসিয়াছেন। তাঁহাদের আর কোন কষ্ট নাই। সেই সরলস্বভাব কাঠুরিয়াগণের সাহচর্য্যে রাজার জীবন বেশ সুখেই কাটিতে লাগিল। কিন্তু রাজারাণীর এই সুখ শনি দেবতার সহ্য হইল না।

১১

রাজারাণী যেখানে থাকিতেন তাহার নিকটেই এক স্বল্পতোয়া নদী ছিল। বাণিজ্যোপলক্ষে সেই নদী দিয়া অনেক সওদাগরের নৌকা যাতায়াত করিত। এক দিন এক সওদাগর সেই নদী দিয়া যাইতেছিল, সহসা তাহার নৌকা এক চরে সংলগ্ন হইয়া গেল। সওদাগর অনেক চেষ্টা করিল। নৌকার দাঁড়ি মাঝি জলে নামিয়া

নৌকা ভাসাইবার অনেক প্রয়াস পাইল, কিছুতেই নৌকা ভাসিল না। এইরূপে একদিন, তুই দিন, তিন দিন—ক্রমে বহু দিন অতীত হইল। সওদাগর ভাবিতে লাগিল 'কিরূপে এই নৌকা ভাসিবে, কিরূপে সে এই বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিবে।'

একদিন এক অশীতিপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাম কক্ষে একখানি পুঁথি ও দক্ষিণ হস্তে একটি বংশদণ্ড গ্রহণ করিয়া সেই সওদাগরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "ওহে সওদাগর, আমি জ্যোতিষিক, তোমার নৌকা কিরূপে ভাসিবে আমি তাহা গণনা করিয়া বলিয়া দিতে পারি।" সওদাগর পরম পুলকিত হইয়া বলিল, "ঠাকুর, যদি কৃপা করিয়া আমার নৌকা ভাসিবার উপায় বলিয়া দাও তাহা হইলে আমি তোমাকে প্রচুর অর্থ দিব।"

বৃদ্ধ জ্যোতিষিক বলিল, "দেখ বাপু সওদাগর, নিকটেই এক কাঠুরিয়াপল্লী আছে, সেই পল্লীতে এক সতী আছেন, তিনি এই নৌকা স্পর্শ করিলেই নৌকা ভাসিবে। নচেৎ তোমার এ নৌকা কিছুতেই আর ভাসিবে না।"

সওদাগর শুনিয়া পুলকিত হইয়া জ্যোতিষিককে বহু অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করিল।

সওদাগর ভাবিল, কাঠুরিয়া-পল্লীতে অনেক স্ত্রীই আছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কে এই সতী, ইহার নির্দ্ধারণ ত বড় গুরুতর কথা। ইহা ভাবিয়া সে সেই দিনই সমস্ত কাঠুরিয়াপল্লীর স্ত্রীগণকে নিমন্ত্রণ করিতে এক লোক পাঠাইল।

ইতঃপূর্ব্বে একদিন তাহারা রাণীর নিমন্ত্রণে রাজোচিত খাদ্য ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিল, আজ আবার সওদাগরের নৌকায় নিমন্ত্রণ পাইয়া পরম আহ্লাদে সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া দলে দলে সওদাগরের নৌকায় উপস্থিত হইল। কিছুতেই নৌকা ভাসিল না। সওদাগর চিন্তিত হইয়া যে ব্যক্তি নিমন্ত্রণ করিবার জন্য কাঠুরিয়া-

পল্লীতে গমন করিয়াছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি কাঠুরিয়াপল্লীর প্রত্যেক রমণীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলে?" সে সবিনয়ে নিবেদন করিল, "হাঁ মহাশয়, আমি সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। কেবল একটি রমণী নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "বৎস, আমার স্বামী এখন বাজারে কাষ্ঠবিক্রয়ার্থ গমন করিয়াছেন, তাঁহার অনুমতি বিনা কি প্রকারে তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি? মহাশয়, শুধু সেই একটি রমণী আসেন নাই।"

সওদাগর ভাবিল সেই রমণীই তবে সতী। তাঁহারই করস্পর্শে আমার নৌকা ভাসিবে—এই মনে করিয়া সে তৎক্ষণাৎ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া সেই অনুচরের সহিত শ্রীবৎসের কুটীর সমীপে উপস্থিত হইল। চিন্তা অতিথিদ্বয়ের সৎকারার্থ কুশাসন, অর্ঘ্য ও উদক দান করিলেন। সওদাগর সেই মহিমময়ী সতীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিল, "দেবি, আমি অতি বিপন্ন। আমার নৌকা এই নদীর চরে লাগিয়া গিয়াছে। আমি পক্ষাধিক কাল এখানে অপরিসীম কষ্ট পাইতেছি। অদ্য এক দৈবজ্ঞ বলিয়া গিয়াছেন, যদি আপনি সেই নৌকা একবার স্পর্শ করেন তবেই নৌকা ভাসিবে। নচেৎ নৌকা আর ভাসিবে না। মা, একবার গিয়া আমার নৌকাখানি স্পর্শ করুন।"

রাণী বলিলেন, "আপনার কথানুসারে আমার এখনই তথায় গিয়া আপনার বিপদ দূর করা উচিত, কিন্তু মহাশয়, স্বামীর অনুমতি বিনা কিরূপে তথায় যাইতে পারি?"

সওদাগর বলিল, "জননি, আমরা এতগুলি প্রাণী এতদিন কষ্ট পাইতেছি, ইহা শুনিয়াও কি আপনার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না?"

চিন্তা আর কথা কহিতে পারিলেন না। মাতৃসম্বোধন পাইয়া তাঁহার সমস্ত আশঙ্কা দূর হইয়া গেল। ভাবিলেন, এ যে আমার

সন্তানের বিপদ ! আমাকে যাইতেই হইবে। ধন্য রমণীর প্রাণ ! স্নেহে, আদরে, মমতায়, রমণীর হৃদয়ে যে ত্রিবেণীসঙ্গম। প্রীতিই যে রমণীর প্রাণ ! রমণী যে মাতৃত্বেই সার্থক ও ধন্য। তাই আজ সেই বনভূমিতে চিন্তা স্বামীর অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া সন্তানের বিপদ দূর করিতে চলিলেন। দারুণ দুরদৃষ্ট তাঁহার গতির পশ্চাতে উপহাস করিতে লাগিল। মাতৃত্বগর্ব্বস্ফুরিতপ্রাণা চিন্তাদেবী সে উপহাসের হাসি শুনিতে পাইলেন না।

১২

চিন্তা নদীতে অবতরণ করিয়া স্নান করিলেন। ভগবান সবিতৃ-দেবকে করজোড়ে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "হে জগদীশ, আমি জ্যোতিষিক কর্ত্তৃক সওদাগরের বিপদ দূর করিবার জন্য যে আদিষ্ট হইয়াছি, সে ত তোমারই আহ্বান লীলাময় !" এই ভাবিয়া ভগবানের মধুর নাম উচ্চারণ করিতে করিতে চিন্তা সেই নৌকা স্পর্শ করিলেন। অমনি নৌকা ভাসিয়া উঠিল। সওদাগরের মুখ প্রসন্ন হইল। সে ভাবিল, দৈবজ্ঞের কথা সত্য। ক্ষণপরে তাহার কি দুর্বুদ্ধি উপস্থিত হইল। মনে করিল, যদি আবার নৌকা কোন চরে লাগিয়া যায় তাহা হইলে নৌকা ভাসান বিষম দায় হইবে। এই ভাবিয়া সে সহসা সেই সতীর হস্ত ধারণ করিয়া নৌকায় টানিয়া তুলিল।

রাণী সিংহগর্জ্জনে বলিয়া উঠিলেন, "কেরে নরপিশাচ, তুই আমাকে বন্দিনী করিলি ? তুই না আমাকে মাতৃসম্বোধন করিয়া তোর আপদ দূরীকরণের জন্য এখানে আনিয়াছিলি ? রে হতভাগ্য নরপশু, এই কি তোর ধর্ম্মজ্ঞান ? ভগবান্ আমার দ্বারা তোর এতাদৃশ উপকার করাইলেন, আর তুই ঘৃণ্য কুক্কুর এইরূপ ব্যবহারে তাহার প্রত্যুপকার করিতেছিস্। ভগবান সবিতৃদেব, তুমি সবই দেখিতেছ; এই পাপিষ্ঠ, ধূর্ত্ততার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি সওদাগরকে তুমি বজ্রানলে দগ্ধ

কর। পৃথিবীতে অন্যায়ের পরাজয় হউক, সত্যের কিরণ বিকীর্ণ হউক।”

কিছুতেই সেই ধূর্ত্ত সওদাগর প্রসন্ন হইল না। চিন্তা অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। কিছুতেই পাপিষ্ঠের হৃদয় গলিল না। তখন নদীতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিলেন। সওদাগরের আদেশে রাণীর হস্ত-পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল।

চিন্তা দেখিলেন উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই। তখন তিনি নদীতীরস্থ রুদ্যমানা কাঠুরিয়াপত্নীগণকে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া দিলেন, “সখীগণ, আমার স্বামীকে বলিও, হতভাগ্য সওদাগর আমাকে বন্দিনী করিয়া আমার হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি যেন সত্বর আমার উদ্ধার করেন।” নৌকা তীরবেগে ছুটিতে লাগিল। তিনি আর নদীতীরস্থ কাঠুরিয়া-পত্নীগণকে দেখিতে না পাইয়া নৌকার সেই কাষ্ঠময় আচ্ছাদনে মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন।

প্রকৃতির স্বাভাবিকী সান্ত্বনায় হৃদয় একটু আশ্বস্ত হইলে চিন্তা ভাবিলেন, রূপই ত স্ত্রীলোকের কাল। এই রূপের মোহে হতভাগ্য পুরুষজাতি বহ্নিমুগ্ধ পতঙ্গের মত দগ্ধীভূত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। এই দুর্ভাগ্য বণিকও সেই মোহে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে। হে লোকব্যথাহারী ভগবান সবিতৃদেব, যদি আমি একমনে পতিদেবতার পুণ্যচরণ ধ্যান করিয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি দয়া করিয়া আমাকে কুরূপা কর—আমাকে গলিত কুষ্ঠরোগ দাও। একদিন রূপ চাহিয়াছিলাম, আমার নরদেবতা স্বামীর হৃদয়রঞ্জন করিতে, আজ আবার রূপের বিনাশ চাহিতেছি, রমণীর রমণীত্ব রক্ষা করিতে। হে লজ্জানিবারণ, নারীর মর্য্যাদা রক্ষা কর—আমাকে কুষ্ঠরোগ দাও।

সেই দিনই চিন্তার দেহে কুষ্ঠরোগ দেখা দিল। তাঁহার দেহ বিগলিত হইতে লাগিল। গাত্রনিঃসৃত দুর্গন্ধে নৌকার তাবৎ লোক

অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত সওদাগর কাহারও কথা শুনিল না। সতীর নেত্রাগ্নি তাহার বক্ষঃপঞ্জর পোড়াইতে লাগিল।

১৩

এদিকে শ্রীবৎস কুটীরে আসিয়া দেখেন, চিন্তা নাই। তিনি চারিদিকে চিন্তা, চিন্তা করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। চিন্তা ভিন্ন তাঁহার মুখে আর কোনও কথা নাই। একবার মনে করিলেন, বোধ হয় চিন্তা প্রতিবেশিনী কাঠুরিয়া-পত্নীদের বাড়ীতে গিযাছেন, এখনি আসিবেন। হৃদয়কে বুঝাইতে চেষ্টা করেন, হৃদয় কিছুতেই বোঝে না—চক্ষে অশ্রুধারা বহিয়া তাঁহাকে কিছুই দেখিতে দেয় না।

রাজা চিন্তার বিরহে আকুল হইয়া পরিতাপ করিতেছেন, এমন সময়ে কয়েকটি কাঠুরিয়া-পত্নী তথায় উপস্থিত হইয়া সওদাগর কর্ত্তৃক চিন্তাহরণ ব্যাপার নিবেদন করিল। চিন্তা অপহৃতা হইয়াছেন, শুনিয়া শ্রীবৎস অস্থির হইয়া উঠিলেন। কাঠুরিয়াসকল ও কাঠুরিয়া-পত্নীগণ তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তিনি সান্ত্বনা পাইলেন না। তিনি কাঠুরিয়া-পত্নীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুষ্ট সওদাগর চিন্তাকে হরণ করিয়া নদীর কোন্ দিকে গেল?" তাহারা বলিল, "সওদাগর স্রোতের অভিমুখে গিয়াছে।" রাজা নদীতীরস্থ পথ দিয়া তীরবেগে গমন করিতে লাগিলেন। শ্রীবৎসেব সম্মুখে দৃষ্টি নাই। কেবল উচ্চৈঃস্বরে "চিন্তা" "চিন্তা" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে চলিয়াছেন। সেই নির্জ্জন দেশে জনমানবের সাক্ষাৎ নাই। রাজা ডাকেন চিন্তা—চিন্তা, প্রতিধ্বনি বলে, চিন্তা—চিন্তা। রাজা উন্মত্তের মত নদীতীরস্থ পথ দিয়া দৌড়িতেছেন। কিন্তু কিছুতেই সওদাগরের নৌকার সন্ধান পাইলেন না। সেই গরুত্মতী তরী যেন

অদৃষ্ট-বিড়ম্বিত শ্রীবৎসকে উপহাস করিয়া স্রোতের অভিমুখে দূরে—বহুদূরে চলিয়া যাইতে লাগিল।

এইরূপে শ্রীবৎস কত দিন, কত রাত্রি চলিলেন। সওদাগরের নৌকার অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া একদিন নদীতীরস্থ এক বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া ভাবিতেছেন, প্রিয়ার জন্য এত প্রাণপাতী পরিশ্রম করিলাম, কিছুতেই প্রিয়ার আমার অনুসন্ধান করিতে পারিলাম না। প্রিয়া-বিরহিতা হইয়া আমার এ ঘৃণ্য প্রাণে প্রয়োজন কি? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। সহসা লক্ষ্মীদেবীর আশ্বাসবাণী তাঁহার মনে পড়িল। তিনি ভাবিলেন, লক্ষ্মীদেবী ত বলিয়াছেন, দ্বাদশ বর্ষ শনির দৃষ্টি নিবন্ধন আমার অদৃষ্টে নানা নির্যাতন আছে। সওদাগরকর্ত্তৃক আমার চিন্তাহরণ ব্যাপার, সে-ও কি তবে সেই দুষ্ট-গ্রহদৃষ্টিজনিত পীড়া? নিশ্চয়ই তাই? তাহা হইলে জীবনে হতাশ হইয়া আত্মহত্যা করিয়া অধর্ম্ম সঞ্চয় করিব না। অদূরে ঐ যে এক মনোহর আশ্রম দেখা যাইতেছে, উহাতে প্রবেশ করি।

রাজা শ্রীবৎস আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাহার মনোহর দৃশ্যে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। দেখিলেন, আশ্রমের চতুর্দ্দিক নানা-জাতীয় বন্যবৃক্ষে শোভিত হইয়া রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অলিগুঞ্জন-মুখরিত, পুষ্পলতা-বেষ্টিত দেবদারু বৃক্ষ সকল অরণ্যানীর শ্যামল-শোভা অতিক্রম করিয়া মস্তক তুলিয়া রহিয়াছে। সেই আশ্রমের মধ্যে কমল, কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি জলজ কুসুমশোভিত সরোবর শোভা পাইতেছে। রাজা শ্রীবৎস প্রকৃতির সেই লীলানিকেতনের মোহন দৃশ্যে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। ষড়্‌ঋতু যেন সেই আশ্রমটিকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে। বিধাতা যেন তাঁহার নিপুণ তুলিকায় একটি মোহন দৃশ্য আঁকিয়া প্রকৃতির বক্ষে রাখিয়া দিয়াছেন। এ আশ্রমে রোগ নাই, শোক নাই, জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই, পাপ নাই, তাপ নাই—কেবল অনাবিল শান্তি। উচ্চনীচ

ভেদাভেদ নাই, হিংসা নাই, দ্বেষ নাই সর্ব্বত্র পরম শান্তি বিরাজিত। সিংহ ও মৃগ, ব্যাঘ্র ও ছাগ, সর্প ও নকুল এবং অপরাপর খাদ্যখাদক-ভাবাপন্ন জন্তুগণ পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া কত রঙ্গে খেলা করিতেছে। মহারাজ শ্রীবৎস এই পবিত্র আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ক্লেশের হস্ত হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। তাঁহার সন্তপ্ত প্রাণ শীতল হইল, বিষাদকাতর মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

শ্রীবৎস অবগত হইলেন, ইহা সুরভি-আশ্রম। এই স্থান সুর-বালা-নিষেবিতা তুষারশুভ্রা কামধেনুর বিচরণ-ভূমি। রাজা পুলকিত প্রাণে সুরভির দর্শনে চলিলেন। অদূরে সুরভিকে দেখিয়া সবিনয়ে প্রণিপাত করতঃ নিবেদন করিলেন, "মা, ত্রিদশজননি, সন্তানের প্রাণের ব্যথা হরণ কর। তোমার ঐ ক্ষীরধারা পান করিয়া দেবতারা ধন্য হইয়াছেন। মা, অকৃতী হতভাগ্য আমি যে অশান্তির দহনে দগ্ধীভূত হইতেছি।"

রাজার কাতরতা দেখিয়া সুরভি প্রসন্না হইয়া বলিলেন, "শ্রীবৎস, চিন্তা পরিত্যাগ কর। তুমি তোমার জীবনাধিকা চিন্তাকে শীঘ্রই পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। বৎস, বিলাপ করিও না, অচিরেই তোমার সুখসূর্য্য উদিত হইবে। এই যে আশ্রম দেখিতেছ, ইহাতে শনির অধিকার নাই। তুমি এখানে মনের সুখে বাস কর। গ্রহভোগ্য বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে তুমি এই আশ্রম ত্যাগ করিয়া চিন্তার অনুসন্ধান করিবে। সেই সতীকুলকমলিনী অদ্ভুত উপায়ে আত্মরক্ষা করিয়া আছেন। ভগবান্ সূর্য্যদেবের অনুগ্রহে সতীর সতীধর্ম্ম সমধিক শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। বৎস, ভাবনা ত্যাগ কর। আমি তোমার কাতরতায় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।"

রাজা শ্রীবৎস সুস্থ মনে সুরভি-আশ্রমে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কামধেনুস্তননিঃসৃত দুগ্ধধারায় আশ্রমের একাংশ সিক্ত হইয়া অপূর্ব্বসুন্দর হইয়াছে। রাজা সেই স্বর্ণরেণুযুক্ত

সুরভিক্ষীরনিষিক্ত মৃত্তিকা লইয়া অনেকগুলি স্বর্ণময় ইষ্টক গঠন করিলেন। রাজা নিপুণ শিল্পে সেই ইষ্টকগুলিকে এক অপূর্ব্ব কৌশলে মিলিত করিয়া রাখিলেন।

১৪

একদিন রাজা আশ্রমসন্নিহিত নদীতীরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন এক সওদাগরের নৌকা তীরে সংলগ্ন হইল। রাজা সওদাগরের নিকট গিয়া বলিলেন, "দেখ সওদাগর, আমি কতকগুলি স্বর্ণময় ইষ্টক প্রস্তুত করিয়াছি। আমার ইচ্ছা, তাহা তোমার নৌকায় তুলিয়া লইয়া বিক্রয় করিয়া আসি।" সওদাগর রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইল।

রাজা সেই সমস্ত ইষ্টক আনিয়া সওদাগরের নৌকা পূর্ণ করিলেন। শ্রীবৎস সুরভির অনুমতি লইয়া সওদাগরের নৌকায় আরোহণ করিয়া বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিলেন। রজনীতে অর্থগৃধ্নু সওদাগর সেই স্বর্ণময় ইষ্টকের লোভে হস্তপদ বাঁধিয়া শ্রীবৎসকে নদীর জলে নিক্ষেপ করিল। রাজা শ্রীবৎস 'চিন্তা, চিন্তা, আমার জীবনাকাশের পূর্ণশশী চিন্তা, কোথায় আছ, আমার অন্তিম দশা দেখিতে পাইলে না,' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নদীনীরে ভাসিতে লাগিলেন। চিন্তা সেই স্বর অনুভব করিয়া বুঝিলেন, এ ত আমার জীবিতনাথের স্বর! সহসা এ স্বর কোথা হইতে আসিল! দেখিলেন, একটি হস্তপদবদ্ধ মনুষ্য জলে ভাসিতেছে। রাণী তাহা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া এক উপাধান জলে নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীবৎস সেই উপাধানে দেহ রক্ষা করিয়া ভাসিতে লাগিলেন। সওদাগরের নৌকা অনুকূল পবনে স্রোতের অভিমুখে তীরবেগে চলিয়া গেল। সতীর গণ্ডবাহী অশ্রুসলিল সেই তরণীর ভার বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

শ্রীবৎস সেই উপাধানে ভর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে এক শুষ্কপ্রায়

হৃতশ্রী উপবনের পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইলেন। তাঁহার হস্তপদ আবদ্ধ, সুতরাং উঠিতে বা বসিতে পারেন না। সেই অবস্থায় উপবনের পার্শ্বে পতিত হইয়া প্রতিক্ষণেই মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা দেখিলেন, সহসা শুষ্ক উপবনে বসন্তশ্রী দেখা দিল, কুসুম-বৃক্ষ সকল নানাজাতীয় কুসুমে পরিশোভিত হইয়া উঠিল, মধুপানমত্ত ভ্রমরকুল কলগুঞ্জনে কুসুমরাণীর প্রণয়সঙ্গীত গাহিতে লাগিল। বসন্তের কোকিল সুরতরঙ্গে উপবন ভরিয়া ফেলিল।

মালিনী প্রভাতে তাহার বসন্ত-অভিশপ্ত কুসুমকাননে আসিয়া সেই উপবন ফুলে-ফুলে ফুলময় হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া পরম পুলকিত চিত্তে ভাবিতে লাগিল, 'এত চেষ্টায় যাহাকে সাজাইতে পারি নাই, আজ কোন্ দেবতার আশীর্ব্বাদে ইহার এই নবীন মাধুরী হইয়াছে!' কৌতূহলের আবেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল, উপবনবৃতিপার্শ্বে এক পরম সুকুমার যুবা পুরুষ হস্তপদবদ্ধ হইয়া নিপতিত রহিয়াছে। মালিনী ভাবিল, কে এ ভাগ্যবান্? অভিশপ্ত দেবতার রুদ্ধ রোষের মত কে এ কুমারকান্তি নবীন যুবা! অথবা ইনি সাক্ষাৎ বসন্তশ্রী কিম্বা মন্মথ! নিশ্চয়ই এই মহাপুরুষের আগমনে আমার শুষ্ক উপবনের এইরূপ পুলক-অভ্যর্থনা।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মালাকারপত্নী সেই অজ্ঞাতনামা পুরুষের নিকটে উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে বলিল, "কে গা তুমি, হস্তপদবদ্ধ হইয়া এরূপে এখানে নিপতিত রহিয়াছ?" রাজা বলিলেন, "হতভাগা বণিক্ আমি, দস্যুকর্ত্তৃক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম। পরে ভাসিতে ভাসিতে এই উপবন-প্রান্তে সংলগ্ন হইয়া আছি! বন্ধনযন্ত্রণায় আমার প্রাণ বাহির হইতেছে, তুমি যে হও দয়া করিয়া আমার বন্ধন মুক্ত কর।"

মালিনী অবিলম্বে রাজার বন্ধন মুক্ত করিয়া রাজাকে গৃহে লইয়া গেল। রাজা মাল্যকারগৃহে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

মালিনীর উপবনটিতে বসন্তের বাতাস লাগিয়াছে, উদ্যানের ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। সে নানাজাতীয় কুসুম সংগ্রহ করিয়া সেই রাজ্যের রাজকন্যার পূজার ফুল যোগাইয়া থাকে।

একদিন শ্রীবৎস মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই রাজ্যের ও রাজার নাম কি?"

মালাকারজায়া বলিল, "এই রাজ্যের নাম সৌতিপুর—সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য বাহুদেব এখন এই রাজ্যের রাজা।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি প্রতিদিন এত ফুল লইয়া কি কর?"

মালিনী বলিল, "রাজকন্যা ভদ্রার শিবপূজার জন্য আমি রাজবাড়ীতে ফুল ও মালা দিয়া থাকি।"

শ্রীবৎস বলিলেন, "আমি তোমাকে অন্য একটি মালা গাঁথিয়া দি।" মালিনী সহর্ষে তাঁহাকে ফুলের সাজি, সূক্ষ্ম কৌষের সূত্র প্রভৃতি উপকরণ দিয়া গৃহান্তরে গমন করিল। রাজা নবীন ছাঁদে মালা গাঁথিয়া পুষ্পপাত্রে কুসুমের অক্ষরে লিখিয়া দিলেন—

সরোবরে কমলিনী আকাশে তপন।
অচিন্ত্য মধুর এই প্রেমের মিলন॥

রাজকুমারী ভদ্রা আজ কুসুমের বিচিত্র বিন্যাস ও মালার নবীন গঠন দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা মালিনি, আজ কে এরূপ পুষ্পবিন্যাস করিয়াছে, আর কেই বা এইরূপ নৈপুণ্যের সহিত মালা গাঁথিয়াছে?" মালিনী হর্ষরাগে মুখখানি পুলকিত করিয়া বলিল, "কেন রাজকুমারি, হইয়াছে কি? আমার প্রাণে কি সখ নাই? আজ সকাল বেলায় মনটা বেশ সুস্থ ও সরল ছিল, তাই বসিয়া বসিয়া এই মালা ছড়াটা গাঁথিয়াছি। কেন, ভাল হয় নাই?"

রাজকুমারী বলিলেন, "না মালিনি, এ তোমার রচনা নহে। এ কোন্ নিপুণ শিল্পীর রচনা।"

মালিনী সেদিন একটু রহস্যের হাসি হাসিয়া সত্বরে বাড়ীতে আসিয়া শ্রীবৎসকে রাজকুমারীর কথা বলিল।

১৫

সৌতিপুরের রাজকন্যা ভদ্রার স্বয়ম্বর। নানা দিগ্‌দেশ হইতে রাজকুমারগণ আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। এক দিকে স্বয়ম্বরের ঐশ্বর্য্য, অপরদিকে ভদ্রাকামী রাজকুমারগণের সমৃদ্ধি, উভয়ে মিশিয়া বাহুদেবের রাজধানী অধিকতর শ্রীসম্পন্না হইয়া উঠিল। চারিদিকেই আনন্দের উচ্ছ্বাস।

মহারাজ শ্রীবৎস স্বয়ম্বরসভার সমৃদ্ধি ও জনতা দর্শনার্থী হইয়া রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি আপনার দীনবেশ স্মরণ করতঃ আর সেদিকে অগ্রসর না হইয়া স্বয়ম্বরসভার বহির্দ্দেশস্থ এক কদম্বতরুতলে উপবেশন করিয়া রহিলেন।

রাজকুমারী ভদ্রা স্বয়ম্বরসভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সমবেত রাজকুমারগণ, অতিমূল্যবান্ পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া বসিয়া আছেন। রাজকুমারী স্বয়ম্বরসভায় সমুপস্থিত রাজন্যগণকে সমুচিত অভিবাদনান্তে সবিনয়ে বলিলেন, "আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি আমার অভীষ্টদেবের কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করিতে পারি।"

এমন সময়ে সহসা আকাশবাণী হইল—

"কদম্ব তরুর তলে তোমার ঈশ্বর।
যার লাগি কৈলে তপ দ্বাদশ বৎসর॥"

সেই দেবকণ্ঠসমুদ্ভূত বাণী অপর কেহ শুনিতে পাইল না। কেবল রাজকুমারীর কর্ণে তাহা প্রবিষ্ট হইল। তখন রাজকুমারী পরম পুলকিতচিত্তে অনুরাগের হাসিতে হস্তধৃত কুসুমমালাখানি অধিকতর রঞ্জিত করিয়া স্বয়ম্বর সভার বহির্দ্দেশস্থ কদম্বতরুর দিকে অগ্রসর হইলেন। সমবেত রাজকুমারগণ সোৎসুক নেত্রে সেই দিকে

চাহিয়া রহিলেন। রাজকুমারী কদম্বতরুতলে গিয়া দেখিলেন, মেঘাবৃত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় এক নবীন যুবাপুরুষ দীনবেশে বসিয়া রহিয়াছেন! রাজকুমারী যথাবিধি অভিবাদনান্তে সেই চিন্তাপরায়ণ শ্রীবৎসের গলে বরমাল্য প্রদান করিলেন।

সমবেত রাজকুমারগণ রাজকুমারীর এই কার্য্যে বহু নিন্দা করিতে করিতে নিজ নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজা বাহুদেব তনয়ার ঈদৃশ ভর্ত্তৃনির্ব্বাচনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বর ও কন্যাকে রাজপুরী হইতে বহির্গত করিয়া দিলেন। বাহুদেবমহিষীর করুণায় তাঁহারা রাজবাটীর বাহিরে এক সামান্য গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

১৬

একদিন শ্রীবৎস গণনা করিয়া দেখিলেন, শনির দৃষ্টি দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইয়াছে। তখন তিনি শনির উদ্দেশে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, "ভগবন্ শনৈশ্চর, আর কেন? যন্ত্রণার ত এক শেষ হইয়াছে। অতঃপর আমার চিন্তাকে ফিরাইয়া দাও।" রাজার এই প্রার্থনায় শনি দেবতার দয়া হইল।

রাজকুমারী ভদ্রার সাহচর্য্যেও শ্রীবৎসের মনে সুখ নাই। ভদ্রার সেই অনুপম রূপমাধুরী, সেই বাসন্তীলতার মোহন দৃশ্য, সেই নবযৌবনার অঙ্গলালিত্য রাজাকে তৃপ্তি দিতে পারিতেছিল না। রাজকুমারী ভদ্রা একদিন রাজা শ্রীবৎসকে বলিলেন, "নাথ, কেন তুমি এত বিষণ্ণ, আমি কি তোমার প্রেমপূজার অধিকারিণী নহি? কেন তুমি সর্ব্বদা চিন্তাপরায়ণ থাকিয়া এই তদ্‌গতপ্রাণা বালিকার প্রাণে এতাদৃশ কষ্ট দিতেছ?"

রাজা ভদ্রার এই উক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, "দেখ ভদ্রা, দারিদ্র্য-দোষে সমস্ত গুণ নষ্ট হয়—আমারও তাহাই হইয়াছে। এখন তোমাকে একটি কাজ করিতে হইবে। দেখিতেছ অর্থাভাবে

কত কষ্ট পাইতেছি। তোমার পিতাকে বলিয়া আমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের একটা উপায় কর।”

ভদ্রা রাজধানীতে গমন করিয়া স্নেহময়ী জননীর নিকট সমস্ত বিবৃত করিলেন। রাণীর অনুরোধে রাজা শ্রীবৎসকে শুল্ক আদায়কারী কর্ম্মচারিপদে নিযুক্ত করিলেন।

রাজা শ্রীবৎস ক্ষীরোদনদীতীরে বসিয়া থাকেন। যে সকল নৌকা সেই নদী দিয়া গমনাগমন করে, তাহাদের শুল্ক আদায় করেন।

একদিন পূর্ব্বোক্ত সওদাগরের নৌকা আসিয়া সেই স্থানে উপনীত হইল। সেই স্বর্ণময় ইষ্টকগুলি সেইরূপেই তরণীতে সজ্জীকৃত রহিয়াছে দেখিয়া রাজা সহচর ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন, “নৌকা হইতে ঐ স্বর্ণময় ইষ্টকগুলি নামাইয়া রাখ।”

প্রভুর আদেশ পাইয়া ভৃত্যগণ অবিলম্বে সেই স্বর্ণময় ইষ্টকগুলি নামাইয়া রাখিল। এদিকে সওদাগর শুল্ক আদায়কারী কর্ম্মচারীর এই ব্যবহারে রাজার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল।

রাজা শ্রীবৎস বাহুদেব-রাজসভায় গমন করিয়া যথাবিধি অভিবাদনান্তে বলিলেন, “মহারাজ, এ সকল স্বর্ণময় ইষ্টক আমার। আমি এই সওদাগরের নৌকায় এই ইষ্টকগুলি লইয়া বাণিজ্যার্থ আসিতেছিলাম। হতভাগ্য নরপিশাচ এই বহুমূল্য ইষ্টকগুলির লোভে আমার হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আমাকে নদীজলে নিক্ষেপ করে। কোনরূপে জীবন পাইয়া আপনার রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছি। মহারাজ ইষ্টকগুলির নির্ম্মাণে অপূর্ব্ব রহস্য আছে। আর কোন প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। যদি উহা ঐ সওদাগরের হয় তাহা হইলে সওদাগর ঐ সকল ইষ্টকের রহস্য উদ্‌ঘাটন করুক।”

সওদাগর রহস্য উদ্‌ঘাটনে অসমর্থ হইল। রাজা শ্রীবৎস সেই সুরভিক্ষীরনিষিক্ত দ্বিধাবিভক্ত স্বর্ণময় ইষ্টকগুলির অপূর্ব্ব রহস্য রাজ-

সভায় সমবেত জনগণের সমক্ষে প্রদর্শন করিলেন। তখন রাজা বিস্মিত হইয়া সওদাগরকে তিরস্কার করতঃ বিদূরিত করিলেন।

রাজার এইরূপ বিস্ময় দেখিয়া শ্রীবৎস সবিনয়ে বলিলেন, "মহারাজ, অযোগ্য কখনও যোগ্যের সহিত মিলিত হইতে পারে না", ইহা বিধাতার আদেশ। আমি প্রাগ্‌দেশপতি গ্রহপীড়িত শ্রীবৎস।"

শুনিয়া রাজা একেবারে বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং তাদৃশ অসদ্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শ্রীবৎস বলিলেন, "রাজন্, এখন দয়া করিয়া আর একটি কাজ করুন, আমার মহিষী চিন্তা ঐ দুষ্ট সওদাগরের নৌকায় বন্দিনী আছেন। অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে অবিলম্বে রাজপুরীতে আনিবার উপায়বিধান করুন।"

তৎক্ষণাৎ সহস্র অনুচরসহ রাজা সেই নদীতীরে উপস্থিত হইয়া অবরুদ্ধ তরণীতে আরোহণ করিলেন। দেখিলেন হস্তপদ-শৃঙ্খলাবদ্ধ এক গলিত কুষ্ঠরোগিণী সেই তরণীর এক প্রান্তে বসিয়া রহিয়াছেন। বন্দিনীর চক্ষে জলধারা, তাঁহার সেই চিন্তাক্লিষ্ট দেহলতা ক্ষণে ক্ষণে বিষাদে কাঁপিয়া উঠিতেছে।

রাজা বলিলেন, "মা, ওঠ। তোমার দুঃখনিশার অবসান হইয়াছে। তুমি অবিলম্বে মহারাজ শ্রীবৎসের সহিত মিলিতা হইবে।"

রাণী চিন্তা শ্রীবৎসের নাম শুনিয়া অতিশয় পুলকিত হইয়া বলিলেন, "কোথায় মহারাজ! যদি এত দুঃখ ভোগ করিয়াও মহারাজের চরণ দর্শন করিতে পারি, তাহা হইলেও আমি ধন্যা হইব।"

রাজা বাহুদেব পূর্ব্বেই শিবিকার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু রাণী চিন্তা বলিলেন, "না বাবা, আমি শিবিকায় উঠিব না। স্বামী পরম গুরু, মহাতীর্থ-সন্নিধানে পদব্রজেই যাইতে হয়।"

অবিলম্বে চিন্তাদেবী রাজা শ্রীবৎসের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। শ্রীবৎস তাঁহাকে চিনিতেই পারিতেছিলেন

না। ভাবিলেন আমার চিন্তার সেই ভুবনমোহিনী রূপ কোথায় গেল। অনেক চিন্তার পর বলিলেন, "চিন্তা, তোমার এই রূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তির কারণ কি ?

চিন্তা বলিলেন, "মহারাজ রূপই স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করে। তাই আমি দুরাত্মার পাপদৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য সবিতৃদেবের নিকট এই গলিত কুষ্ঠ রোগ প্রার্থনা করিয়া লইয়াছি। মহারাজ, আমার সাধনা পূর্ণ হইয়াছে। হতভাগিনী আমি আপনার পুণ্য চরণ স্পর্শ করিয়া ধন্য হইলাম।"

তখন চিন্তা স্বামীর পদরেণু অঙ্গে মাখিয়া যুগ্মকরে সবিতৃদেবকে বলিলেন, "হে ভগবান. আতঙ্কিতার আতঙ্ক দূর হইয়াছে। আমার পূর্ব্বরূপ প্রত্যর্পণ করুন।" দেখিতে দেখিতে চিন্তার রূপ আবার পূর্ব্বের মত মনোজ্ঞ হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে শনিদেবতা হাসিতে হাসিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। আজ আর তাঁহার উগ্রমূর্ত্তি নাই। তিনি শুভঙ্কর বরদ-মূর্ত্তিতে সেস্থানে আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ শ্রীবৎস, মহিষী চিন্তাদেবি, ধন্য তোমরা। এত দুঃখ নির্য্যাতন ভোগ করিয়াও কর্ত্তব্য বিস্মৃত হও নাই। তোমাদের এই মধুর অবদান উত্তরকালে মানবসমাজে চিরানুকরণীয় হইয়া থাকিবে। মহারাজ, আশীর্ব্বাদ করি, লক্ষ্মী তোমার আলয়ে চিরপ্রতিষ্ঠিতা থাকুন—ধর্ম্মে মতি অচলা হোক। মহারাজ, আর একটি কথা, কর্ম্মফল হইতেই অদৃষ্টের সৃষ্টি। তোমরা দ্বাদশ বৎসর যে দুঃখ ভোগ করিয়াছ সেই দুঃখ-দানের দেবতা আমি। আমিও কর্ম্মফলে ঘৃণ্য কার্য্যে বিধাতৃনিযুক্ত। আশা করি, তোমরা আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবে না। মা চিন্তাদেবি, গ্রহবশে কষ্ট পাইয়াছ বলিয়া কিছু মনে করিও না।" চিন্তাদেবী সবিনয়ে বলিলেন, "দেব, স্বর্ণকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহার পরীক্ষা করিতে হয়। তাহাকে কি স্বর্ণের উপর অবিচার করা বলে ?"

এই অসম্ভব অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা দেখিয়া সকলে চিত্রার্পিতপ্রায় নিশ্চল হইয়া ভাবিতেছেন, এমন সময়ে রাজা ও রাণী সমস্বরে—

"নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসুনুং মহাগ্রহং।
ছায়ায়াগর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরং॥"

বলিয়া গললগ্নীকৃতবাসে প্রণিপাত করিলেন।

শনৈশ্চর রাজারাণীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাজা বাহুদেব পুলকিত চিত্তে চিন্তাকে মনোহর বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া ভদ্রাকে তথায় আনিবার জন্য পরিচারিকা পাঠাইলেন।

অবিলম্বে ভদ্রা আসিয়া সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। ভদ্রা চিন্তার নিকট গিয়া প্রণিপাত করিয়া করজোড়ে বলিলেন, "দিদি, দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন।" চিন্তা পরমসমাদরে ভদ্রাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। রাজা শ্রীবৎসের সৌভাগ্যগগনে দুটি চাঁদ হাসিয়া উঠিল।

এমন সময়ে লক্ষ্মী সহসা তথায় আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন, "শ্রীবৎস, অবিলম্বে তুমি তোমার রাজ্যে গমন কর। তোমার সেই অমরাবতীসদৃশ্য রাজ্য পুনর্ব্বার তেমনি হইয়াছে, প্রজাকুল তোমার অভাবে বিষণ্ণভাবে কালযাপন করিতেছে। আর বিলম্ব করিও না।"

শ্রীবৎস বাহুদেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া চিন্তা ও ভদ্রা সমভিব্যাহারে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। প্রজাগণের হতাশাকাতর চক্ষে হর্ষবারি দেখা দিল। একদিন তাহারা অশ্রুজলে রাজাকে বিদায় দিয়াছিল—আজ পুনরায় প্রেমাশ্রুবর্ষণে রাজরাণীর অভিনন্দন করিল।

সম্পূর্ণ